গুড আর্থ

পার্ল এস বাক্

চিরায়ত গ্রন্থমালা

আলোকিত মানুষ চাই

গুড আর্থ

পার্ল এস বাক্

অনুবাদ

আবদুল হাফিজ

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ২৫৩

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
মাঘ ১৪১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬

দ্বিতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
মাঘ ১৪১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১

দ্বিতীয় সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ
মাঘ ১৪১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
সুমি প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
৯, নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0252-x

GOOD EARTH : Bengali Translated by Abdul Hafiz.
Published by Bishwo Shahitto Kendro, 14 Kazi Nazrul Islam Avenue, Dhaka 1000 Bangladesh.
Cover Design : Dhrouba Esh, First Edition : February 2006. 3rd Print : February 2011.
Price : Tk. 240 Only.

ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহত্তম লেখকদের মধ্যে সব সময় উচ্চারিত হয় পার্ল এস বাক্-এর নাম। সংবেদনশীলতা, মানবিকতা ও আন্তর্জাতিকতার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ করা যায় তাঁর রচনাগুলোতে। আমাদের আলোচ্য *গুড আর্থ* উপন্যাসটি ছাড়াও তাঁর রচিত *দি মাদার, ফাদার অ্যান্ড সান, প্যাভিলিয়ন অব উইমেন, ড্রাগন সিড, হাউজ ডিভাইডেড, পোর্ট্রেট অব ম্যারেজ, হিডেন ফ্লাওয়ার, ইস্ট উইন্ড ওয়েস্ট উইন্ড* প্রভৃতি গ্রন্থ আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মননশীল পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছে। সমকালের গণ্ডি পেরিয়ে যেসব সৃষ্টিকর্ম পরবর্তীকালের পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হয়, সেগুলোকেই আমরা ক্লাসিক বা চিরায়ত অভিধায় আখ্যায়িত করে থাকি। পৃথিবীর সবদেশে, সবকালে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী লেখক বিরাজ করেন। কিন্তু খুব অল্পসংখ্যক লেখকের রচনাই সমকালের চৌহদ্দি পেরিয়ে ভাবীকালের লেখক ও পাঠকের কাছে আদরণীয় ও শিক্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়। পার্ল এস বাক্ সেই স্বল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান এবং বিরল প্রতিভার অধিকারী লেখকদের একজন যাঁর *গুড আর্থ* উপন্যাসটি চিরায়ত গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে।

১৮৯৬ সালের ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে পার্ল এস বাক্-এর জন্ম। মৃত্যু ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায়। কিন্তু জন্মের পরপরই তাঁর মিশনারি পিতা-মাতা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান চীনের সিংকিয়াং শহরে। সেখানেই ছিলেন সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত। তাঁর চারপাশের সবাই কথা বলত চীনাভাষায়। ফলে পার্ল এস বাক্ ইংরেজির আগেই চীনাভাষায় কথা বলতে শিখে ফেলেন। তাঁর এই চীনাভাষা শিক্ষা এবং জীবনের প্রথম সতেরো বছর চীনে কাটানোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে তাঁর রচনাকর্মে। প্রাচ্যের জীবন এবং পরবর্তী সময়ে পাশ্চাত্যের জীবন—এই দুইটি ভিন্নবৈচিত্র্যের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি তাঁর রচনায় এনে দিয়েছে দুই সংস্কৃতির সমন্বয় এবং দ্বন্দ্বের সম্মিলিত স্রোতোধারা। তার পরিচয় পাওয়া যায় *ইস্ট উইন্ড ওয়েস্ট উইন্ড* গ্রন্থে। প্রাচ্য সম্পর্কে পশ্চিমাদের পাহাড়সমান অজ্ঞতা এবং অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধার যথাযথ ও শৈল্পিক উত্তর তিনি দিয়েছেন এই গ্রন্থে।

গুড আর্থ উপন্যাসে বিপ্লবপূর্ব চীনের কৃষিজীবী প্রান্তিক মানুষের যে চিত্র পার্ল এস বাক্ তুলে ধরেছেন, তা সমসাময়িক আর কোনো লেখকের সৃষ্টিকর্মে উঠে আসেনি। এই মন্তব্য শুধু বিদেশি নয়, চীনাভাষার লেখকদের জন্যও প্রযোজ্য। এই উপন্যাসে

কৃষিভিত্তিক, সামন্ততান্ত্রিক যে চীনের জনজীবনের আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে সমসাময়িক চীনের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, জীবনযাপন প্রণালী, সামাজিক মূল্যবোধ, বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। মহৎ সাহিত্যের বিশিষ্টতা এখানেই। এ কারণেই সমাজতাত্ত্বিক-দার্শনিকরা বলে থাকেন যে, কোনো দেশ-জাতি সম্পর্কে বছরের পর বছর ধরে গবেষণা চালিয়ে গেলেও সেই গভীর সত্য উন্মোচন করা কঠিন, সে সত্যটি হচ্ছে উপরোক্ত সমাজবিবর্তনের মূল শক্তি। অথচ একটি মহৎ উপন্যাস থেকে খুব সহজেই সেই সত্যটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

গুড আর্থ উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ওয়াঙ লাঙ নামক যুবকের বিয়ের দিনের বিবরণ দিয়ে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রও ওয়াঙ লাঙ। সরল গ্রাম্য যুবক। চীনের যে-কোনো শহর বা আধুনিকতার যে-কোনো নগরকেন্দ্র থেকে অনেক দূরের গ্রামে তার বসবাস। তার সঙ্গে তার থাকে বৃদ্ধ পিতা। নেহাত দরিদ্র তারা। এত দরিদ্র যে সকালে কাশিকাতর পিতার সামনে গরম পানিভর্তি বাটি মেলে ধরার সময় তাতে এক চিমটি চায়ের পাতা মিশিয়ে দেবার সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। তাদের বাড়ির সবগুলো ঘর মাটির তৈরি। নিজেদের ক্ষেতের চৌকো মাটির ইট। নিজেদের ক্ষেতের উৎপন্ন গমের খড়ে ছাওয়া তাদের চালা। তাদের এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে থাকে পানির তীব্র অভাব। পুরো শরীর ধুয়ে স্নান করা সেই সময় অনেক বড় বিলাসিতা। তাই নিজের বিয়ের দিনেও সেই রকম বিলাসিতা করতে ভয় পায় ওয়াঙ।

ওয়াঙ-এর বিয়ের আনুষ্ঠানিকতাও খুব সামান্য। আসলে সে তো ভদ্র বা গেরস্থ ঘর থেকে কোনো মেয়েকে বউ হিসেবে পাচ্ছে না। এখন বিয়ে ব্যাপারটা খুবই ব্যয়বহুল আর গেরস্থ ঘরের মেয়েরা দামি কাপড়চোপড়ের কড়া দাবি পূরণ না-করা পর্যন্ত বিয়েতে রাজি হয় না। তাই ওয়াঙ-এর মতো গরিবদের কপালে বউ হিসেবে জোটে দাসী-বাঁদি। ওয়াঙ যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, সেই মেয়েটি হচ্ছে 'হোয়াঙ মঞ্জিল' নামক জমিদার-বাড়ির আশৈশব বাঁদি। তার নাম ওলান। হোয়াঙ মঞ্জিলের বাঁদীদের কোন দৃষ্টিতে দেখা হত বা তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা হত তা বোঝা যায় ওলান সম্পর্কে ওয়াঙকে বলা বেগম সাহেবার কথা থেকে। এই বেগম সাহেবা বসে থাকেন হলঘরের মধ্যে একটি উঁচু বেদিতে। মুক্তোশুভ্র সাটিনের পোশাকে আবৃত তার ক্ষুদ্র সুন্দর তনু। বলিরেখাবহুল মুখ। বানরের চোখের মতো তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র কালো রেখাগুলোতে কোটরাগত চোখ। এক হাতে তীব্র নেশা-উৎপাদক চণ্ডুর পাইপের একটা প্রান্ত। ওলানকে ওয়াঙ-এর হাতে তুলে দেয়ার সময় বেগম সাহেবা বলে—'দশ বছর বয়সে এ মেয়েটা আমাদের বাড়িতে আসে, এখন তার বয়েস বিশ। এক দুর্ভিক্ষের বছর ওকে আমি কিনেছিলাম। সেবার ওর দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মা-বাবা উত্তরাঞ্চল থেকে এসেছিল এখানে আহারের সন্ধানে। পেটের দায়ে মেয়েটাকে তারা বিক্রি করে দেয় আমার কাছে। দুর্ভিক্ষ শেষে তারা স্বদেশে

চলে যায়। তাদের আর কোনো খোঁজখবর নেই। মেয়েটা স্বাস্থ্যবতী; দৈহিক শক্তি যথেষ্ট। সে তোর সংসারের কাজ আর ক্ষেত-খামারের কাজ খুব করতে পারবে। চেহারা অবশ্য তার তত ভালো নয়; তবে এজন্য তোর কোনো অসুবিধে হবে না; সুন্দরী বউয়ের তোর প্রয়োজনও নেই। কেবল আয়েশি পুরুষদেরই চিত্তবিনোদনের জন্য সুন্দরী নারীর প্রয়োজন। নেহাত সাদাসিধে মেয়ে। চালাকি সে জানে না। তবে যা হুকুম দিবি, তা ঠিক মতনই পালন করবে। মেজাজও তার ভালো—বেশ ঠাণ্ডা। যতটুকু আমি জানি, তার কৌমার্য অক্ষুণ্ন আছে—সে অস্পৃষ্ট। আমার ছেলে বা নাতিদের মন ভোলাবার মতন রূপসী সে নয়; যদি কিছু অঘটন ঘটে থাকে তা মহলের চাকর-বাকরদের সাথে। তবে এতগুলো সুন্দরী বাঁদি মহলে থাকতে আমার মনে হয় না কোনো চাকর তার ওপর নজর দিয়েছে। সাহেবদের এঁটো সুন্দরী বাঁদিরাই চাকর-বাকরদের ভোগে লাগে। এবার তুই ওকে নিয়ে গিয়ে ওর সদ্ব্যবহার কর্। মেয়েটা চালচলনে ভারী আর একটু বোকাটে হলেও আসলে ভালো। পরকালে পুণ্য সঞ্চয়ের কামনা না থাকলে ওকে আমি হাতছাড়া করতাম না। অবশ্য সুপাত্র পেলে আর বাড়ির সাহেবদের বিলাস-ভোগে না লাগলে, বাঁদিদের বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দেওয়াই আমার নীতি।'

বউ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে পশ্চিমের মাঠে গ্রামমন্দিরে ক্ষেত্রদেবতা এবং দেবীর মূর্তির সামনে দুটো ধূপকাঠি জ্বেলে দেওয়া আর রাতে বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয়কে খেতে ডাকা (সেই রান্নাও করতে হয়েছে নববধূকে) —এই দিয়েই বিয়ের সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা শেষ। পরদিন সকালেই ওয়াঙ ক্ষেতে চলে যায় কাজ করতে। প্রতিদিনই যায়। নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করে, বলদের কাঁধে জোয়াল চাপায়, পশ্চিম মাঠের খেতে পেঁয়াজ-রসুন বুনে দেয়।

তবে প্রাক-বিবাহ জীবনের সঙ্গে ওয়াঙ-এর বিবাহিত জীবনের তফাতও অনেকখানি। এখন সে মাথার উপর সূর্য উঠতেই বাড়ি গিয়ে তৈরি- খাবার পায়। ঘরের মেঝেটা ঝকঝকে-তকতকে থাকে। কাঠকয়লার ভাবনা তাকে আর ভাবতে হয় না। ফলে ওয়াঙ ফসলের জমিতে বাড়তি শ্রম দিতে পারে। স্ত্রী ওলানও তাকে সাহায্য করে। ফসল ভালো হয়। তাদের হাতে ফসল বিক্রির টাকা আসে। ওয়াঙ সেই বাড়তি টাকায় একটুকরো নতুন জমি কিনতে পারে। আর বছর শুরুতেই ওলানের কোলে সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে আসে একটি ছেলেশিশু।

ওয়াঙ লাঙ প্রকৃতই কৃষক। জমির প্রতি আসক্তি তার প্রবল। জমিকেই তার মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এবং জমিই সকল সম্পদের আকর। তার মতে 'মাটি মানুষের রক্ত-মাংসের শামিল।' তাই সে হাতে বাড়তি টাকা জমামাত্র জমি কিনতে থাকে। সে সংযমী অধ্যবসায়ী হিসেবি যুবক। যৌবনসুলভ বদঅভ্যাসগুলো থেকে মুক্ত। ফলে তার অপচয় কম। আবার পরিবারের সকলের প্রতি তার তীক্ষ্ণ সংবেদী দৃষ্টি। কারও চাহিদাই সে অপূর্ণ রাখতে চায় না। ফলে পরিবারে একটি সুস্থ শান্তির আবহ বিরাজ করে। এইরকম পরিবেশ মানুষের কর্মদ্যোগ বাড়িয়ে

দেয়। ওয়াঙ-এর ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। তার পারিবারিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাড়তে থাকে জমির পরিমাণ। সেই সঙ্গে ওয়াঙ-এর পরিবারের সদস্যসংখ্যা। তৎকালীন চীনাসমাজে সন্তানসংখ্যাও সমৃদ্ধির স্মারক হিসাবে বিবেচিত। সুতরাং এদিক থেকেও ওয়াঙ সৌভাগ্যবান। সে তিনপুত্র এবং দুই কন্যার জনক।

তবে এর মধ্যেও একবার নিদারুণ সংকটে পতিত হয় ওয়াঙ-পরিবার। অজন্মা, পঙ্গপাল এবং অকাল বন্যা পথে বসিয়ে দেয় পুরো পরিবারকে। জীবন বাঁচাতে তারা দক্ষিণের শহরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে পথের ধারে ঝুপড়ি বেঁধে থাকতে হয় তাদের। ওয়াঙ রিকশা চালায়, তার স্ত্রী ওলান অন্যের বাড়িতে ঝি-এর কাজ নেয়, ওয়াঙ-এর বৃদ্ধ পিতা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। একপর্যায়ে শিশুকন্যাকে বিক্রির চিন্তা পর্যন্ত এসেছিল ওয়াঙ-এর মনে। কিন্তু নিজের দুর্বিষহ দাসীজীবনের কথা মনে পড়ায় ওলান কিছুতেই রাজি হয় না কন্যা-বিক্রয়ে। তবে এই শহরে এসেই ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের প্রকট চিত্র দেখতে পায় সে। লেখকের ভাষায়: 'এখানকার বাজারে আহার্যের অপচয়, রাজপথের দুইধারে রেশমি বস্ত্রের বিপণিতে লাল, কালো, জরদ রঙের রেশমি ধ্বজায় পণ্যসম্ভারের ঘোষণা; সাটিন, মখমল, রেশমি পোশাক পরিহিত ধনীসম্প্রদায়ের আনাগোনা। তাদের দেহ কোমল পেলব; আলস্যে সুন্দর আর সুরভিত তাদের হস্তদ্বয়। এই রাজকীয় নগরের যে-অংশে ওয়াঙ লাঙরা থাকে, সেখানে সর্বনাশী ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্যের অভাব; কঙ্কাল-দেহের নগ্নতা ঢাকার জন্য বস্ত্রের অনটন।'

অবশেষে তারা পাড়ি দিতে পারে দুর্বিষহ দিনগুলো। ফিরে আসে নিজেদের গ্রামে। এরপর ওয়াঙ লাঙ ধাপে ধাপে সম্পন্ন কৃষক থেকে পরিণত হয় ধনী ভূস্বামীতে। তার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে তার জীবনযাপন পদ্ধতি ও মূল্যবোধ। ইতিমধ্যে তাদের এলাকার হোয়াঙ মঞ্জিলের জমিদার-পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং সেগুলো কিনে নেয় ওয়াঙ লাঙ। তারপর সে বিলাসীজীবনের স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। সে সুন্দরী রক্ষিতা নিয়ে আসে, তার পেছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করে। ছেলে-মেয়েদের বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত করে তোলে। ফলে কেউ আর মাটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। তাই ওয়াঙ শেষজীবনে চরম হতাশায় নিপতিত হয়।

গুড আর্থ উপন্যাসের অসাধারণ চরিত্র ওলান। ওয়াঙ-এর স্ত্রী। তৎকালীন চীনাসমাজের সাধারণ নারীজীবনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে ওলানের মধ্যে দিয়ে। দশ বছরের দাসীজীবনের পর সে এসেছে ওয়াঙ-এর ঘরনী হয়ে। রূপহীনা নারী। তার মুখাবয়ব চৌকা—মুখখানা সারল্যে ভরা। নাকটা ছোট আর থ্যাবড়া, নাসারন্ধ্র আর মুখের হা'র বিস্তৃতি অপরিমিত। অনায়ত কালো চোখের দৃষ্টিতে অব্যক্ত বেদনার অভিব্যক্তি। স্পল্পভাষিণী। ওয়াঙ-এর জন্য তার জীবন নিবেদিত। বাড়ির সব কাজ তো সে করেই আবার ক্ষেতের কাজেও হাত লাগায় স্বামীর সঙ্গে। এমনই স্বাবলম্বী স্বভাবের নারী সে, সন্তান প্রসবকালেও অন্য কোনো দাই বা রমণীর সাহায্য

নিতে অস্বীকৃতি জানায়। আবার পরদিন সকালে উঠেই সে রোজকার মতো সংসারের কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। আপাতদৃষ্টিতে খুব বাধ্যানুগত স্ত্রী সে। কিন্তু মাঝে মাঝেই স্বকীয়তার বিচ্ছুরণ ঘটে তার চরিত্রে। যেখানে সে ক্রীতদাসী হিসেবে দশবছর কাটিয়েছে সেই জমিদারবাড়িতে যাওয়ার কথা তুলতেই সে দৃপ্তকণ্ঠে বলে: 'সে বাড়িতে যদি কোনোদিন আমাকে যেতেই হয়, আমি যাব সন্তান কোলে নিয়ে। লাল কোট আর ফুল আঁকা পায়জামা পরবে আমার খোকন। তার মাথায় পরিয়ে দেব বুদ্ধমূর্তি আঁকা সোনালি টুপি আর পায়ে পরিয়ে দেব বাঘমুখো জুতো। আমার পরিধানে থাকবে সাটিনের কালো জামা আর পায়ে থাকবে নতুন জুতো। সে-বাড়িতে গিয়ে আমি ঘুরে বেড়াব।'

আবার ওয়াঙ যখন বাড়িতে পদ্ম নামক উপপত্নীকে নিয়ে আসে, সঙ্গে আনে তার সহচরী কোকিলাকে, তখন ওলান কোনো ঝগড়াঝাঁটি করেনি, কিন্তু নীরব উপেক্ষায় জানিয়ে দিয়েছে যে ওদেরকে সে নিজের সমকক্ষ বলে কখনোই মনে করে না। দুরারোগ্য অসুখে সে যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন কোকিলাকে ডেকে সে বলে: 'তুমি বুড়ো জমিদারের মহলে বাস করতে পারো, তার আদর-সোহাগ পেতে পারো। কারণ রূপসী বলে তোমাকে ধরা হত। কিন্তু আমি আমার স্বামীর কাছে স্ত্রীত্বের সম্মান পেয়েছি, আমি আমার স্বামীর সন্তান গর্ভে ধরে মাতৃত্বের সম্মান পেয়েছি। আর তুমি দাসীই রয়ে গেলে, তোমার দাসিত্ব আর ঘুচল না।'

ওয়াঙ লাঙ-এর বৃদ্ধবয়সে চীন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে। সামন্ততান্ত্রিক কৃষিসমাজ থেকে ধীরে ধীরে পদার্পণ করছে বৈশ্যতন্ত্রের যুগে। ওয়াঙ-এর পুত্ররা ব্যবসাতে অর্থলগ্নি করাকে অধিকতর লাভজনক মনে করছে। তারা জমি বিক্রি করে সেই অর্থ ব্যবসাতে খাটাতে চায়। কিন্তু ওয়াঙ তাদের মতামত মেনে নিতে রাজি নয়। তার কাছে তখনও মাটিই একমাত্র জীবনদায়িনী। মাটিই একমাত্র বাঁচার পথ, একমাত্র ভরসা। মাটি অক্ষয় অব্যয়।

পিতার বারংবার অনুনয়ে পুত্ররা তার কথা মেনে নেবার ভঙ্গি করে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু কথা বলতে বলতে বুড়োর মাথার উপর দিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে নীরব হাসি আর চোখ ঠারাঠারি চলে।

এভাবেই একটি পরিবারের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে পার্ল এস বাক্ তুলে ধরেন চীনাসমাজের বিবর্তনের সঠিক চিত্রটিও। *গুড আর্থ* হয়ে ওঠে চীনের পরিবার, ব্যক্তি ও সমাজবিবর্তনের উজ্জ্বল দলিল।

জাকির তালুকদার

পঞ্চম সংস্করণ প্রসঙ্গে

কথাসাহিত্যের অঙ্গনে পার্ল এস. বাক্-এর খ্যাতি বিশ্বজুড়ে। তাঁর একাধিক উপন্যাস মহৎকীর্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 'গুড আর্থ' তাঁর সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। চৈনিক পটভূমিতে এর কাহিনী আবর্তিত হলেও বিশ্বমানবের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা এই বইতে লেখিকার নিপুণ হাতের তুলিতে এমনভাবে চিত্রিত ও অন্তর্ভেদী হয়ে উঠেছে যা সার্বজনীন। বইটি প্রকাশের পরপরই নানান ভাষায় বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে মহত্তম উপন্যাস হিসেবে আদৃত হয়েছে। বাংলাদেশেও বাক্ অতিপরিচিত নাম।

ফ্রাংকলিন বুকস্ প্রোগ্রাম্স্-এর অধীনে অনুবাদ সম্পন্ন হলে ১৯৬০ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে চারটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। অনুবাদটি দীর্ঘদিন থেকে বাজারে ছিল না।

ভাষা-সমস্যার কারণে আমাদের দেশের অধিকাংশ সাহিত্যরসিক বিশ্বসাহিত্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হন। বিশেষ করে, আজকের তরুণ প্রজন্মের কাছে পৃথিবীর মহত্ত্বম সাহিত্যকীর্তিগুলো অপরিচিত থেকে যাচ্ছে। এই বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রকাশক তাঁর সামাজিক দায়িত্বের একটি পরিচয় রেখেছেন বলে মনে করি। তার সেই আগ্রহ পাঠকসমাজের কাছে স্বীকৃতি পেলে এই বৃদ্ধবয়সে অপার আনন্দ লাভ করব।

২৬শে মার্চ ১৯৯১

আবদুল হাফিজ
'অনামিকা'
ঢাকা

পার্ল এস বাক্ পরিচিতি

বিশ্বসাহিত্যের দিগন্তে পার্ল এস. বাক্ নামটি জ্যোতিষ্কের মতোই উজ্জ্বল। তাঁর বিচিত্রতম ও বিস্ময়কর অবদানে কথাসাহিত্যের অঙ্গন আজ নতুন সৃষ্টিবৈচিত্র্যে সমৃদ্ধতর হয়েছে। মহত্তর মানব দৃষ্টিভঙ্গি আর তাঁর সংবেদনশীল শিল্পীমনের প্রসারতা দিয়ে তিনি তাঁর উপন্যাস এবং গল্পে সমাজজীবন ও মানবমনের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, বিশ্বসাহিত্যে তা সত্যিই অনন্যসাধারণ। আর এজন্যই আজ বিশ্বের সকল দেশের সাহিত্যপ্রিয় মানুষ তাঁকে বরণ করেছে মহান জীবনশিল্পীরূপে।

১৮৯৬ সালের ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়ার হিলস-বোরোতে পার্ল এস্. বাকের জন্ম হয়। তাঁর মা-বাবা দুজনেই ছিলেন মিশনারি। বাক্-এর শৈশবকালেই তাঁরা চীনে যান ধর্মপ্রচারের কাজে। সঙ্গে তাঁরা ছোট বাক্‌কেও নিয়ে যান। চীনের খরস্রোতা ইয়াংসির তীরে মনোরম সিংকিয়াং শহরে বাকের স্বপ্নময় আর রোমাঞ্চভরা শৈশব-দিনগুলো কাটে। ফলে ইয়াংসির পলিমাটিবিধৌত এই বিশাল আর বিচিত্র দেশের জীবন আর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বাক্-এর কল্পনাপ্রবণ শিশুমনের ওপর গভীর রেখাপাত করে। শৈশবের এই দিনগুলোতে বাক্ তাঁর পিতার কাছে শুনতেন হৃদয়গ্রাহী এবং আকর্ষণীয় নানা গল্প। এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই থাকত পর্যটনের মনোরম কাহিনী। তাঁর মা সাহিত্য আর সংগীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁরই নিকট-সান্নিধ্যে থেকে বাক্ পরিচিত হন সংগীতের রসময় জগতের সাথে। এমনি করে ছোট বাক্-এর মন সেই শৈশবেই কথা আর সুরের এক গভীর শিল্পময় ব্যঞ্জনায় অনুরণিত হয়ে ওঠে।

বাকের শৈশব-জীবনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাঁর ওপর চীনের প্রাচ্য সমাজ-পরিবেশের অবিমিশ্র প্রভাব। এ-প্রভাবের ছোঁয়া অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর মনে-প্রাণে—তাঁর সমগ্র সত্তায়। কারণ, জীবনের এই প্রথম যাত্রারম্ভে বাক্-এর কল্পনা এবং ভাবনার জগৎ গড়ে ওঠে চীনাভাষার মাধ্যমেই। ইংরেজিতে কথা বলার আগেই তিনি চীনাভাষায় কথা বলতে শেখেন। এ-সময়টিতেই তাঁর অনুভূতি এবং কল্পনার রাজ্যে আনন্দ আর প্রেরণার সোনার কাঠি নিয়ে আসে একটি আবেগময়ী চীনা নার্স। সে বাক্‌কে শোনাত চীনের সোনালি অতীতের বিচিত্র সব উপাখ্যান আর রূপকথা। বাকের সাহিত্য-সাধনার পথে এই গল্প-বলা চীনা-মেয়ের অবদান অনেকখানি। প্রকৃতপক্ষে বাক্-এর কাছে চীনের কলমুখর জীবনকথা আর লোককাহিনীর ঐশ্বর্যের তোরণ খুলে দিয়ে সে-ই তাঁর সৃজনীপ্রতিভাকে জাগ্রত করেছে।

ইয়াংসির তীরে শৈশব ও কৈশোরের সতেরো বছর কাটানোর পর উচ্চশিক্ষার জন্য বাক্ তাঁর মাতৃভূমি আমেরিকায় যান। এখানে 'র‍্যান্ড-লফ মেকলে মহিলা কলেজ' থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভের পর তিনি আবার চীনে ফিরে আসেন। জন এস্. বাক্ নামক একজন মিশনারির সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এঁর নামই আজ এই মহীয়সী কথাশিল্পীর নামের সাথে অক্ষয় হয়ে আছে।

সিংকিয়াং-এর চীনা পরিবেশে থেকে আশপাশের সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে বাক্-এর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। চীনের সনাতন ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, প্রচলিত জীবনধারা আর হাসি-কান্না ব্যথা-বেদনায় ভরা ঘাত-প্রতিঘাতময় পারিবারিক জীবনের সাথেও তাঁর নিবিড় পরিচয় হয়। স্বভাবসুলভ অনুভূতি ও সহৃদয়তা নিয়ে তিনি চৈনিক সমাজের এই জীবনপ্রবাহকে প্রত্যক্ষ করেন আর শিল্পীমনের গভীর ব্যঞ্জনায় অভিজ্ঞতা ও কল্পনার স্পর্শ মিশিয়ে এক বিস্ময়কর নৈপুণ্যের সাথে তাকে বাঙ্ময় করে তোলেন।

জীবনের সাথে পরিচয়ের এই নিবিড়তা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর সংবেদনশীলতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণের জন্যই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে 'গুড আর্থ'-এর মতো এক অনুপম ও বিস্ময়কর জীবন-আলেখ্যের রূপ দান। এই একটিমাত্র বই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কথাসাহিত্যের অঙ্গনে কী আলোড়নই-না সৃষ্টি করেছে। চারদিক থেকে ব্যাগ্রাকুল জিজ্ঞাসা এসেছে : কে এই অসাধারণ জীবনশিল্পী? আর সেদিনই বিশ্বসাহিত্যের পরিমণ্ডলে পার্ল এস. বাক্ নামটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশ্বের গুণীসমাজ এ জ্যোতিষ্কের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন এবং যথাসময়ে 'নোবেল পুরস্কার' দিয়ে তাঁকে মর্যাদার শীর্ষ আসনে বরণ করেছেন। বাক্ পেলেন জীবনশিল্পী হিসেবে চিরকালের মতো প্রতিষ্ঠা আর তাঁর সৃষ্টি পেল কালজয়ী অবদানের মহিমা।

বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারকে তিনি আর যেসব অতুলনীয় অবদানে সমৃদ্ধ করেছেন তার মধ্যে 'দি মাদার' 'ফাদার এ্যান্ড সান' 'হাউস ডিভাইডেড' 'প্যাভিলিয়ন অব উইমেন' 'ড্রাগন সিড', 'পোট্রেট অব ম্যারেজ', 'হিডেন ফাওয়ার', 'ইস্ট উইন্ড ওয়েস্ট উইন্ড' প্রভৃতি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

শেষ বয়সে বাক্ তাঁর দ্বিতীয় স্বামী জে. ওয়াল্‌সের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় বাস করতেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এই মহান কথাশিল্পীর দেহাবসান ঘটে।

এক

আজ ওয়াঙ লাঙ-এর বিয়ের দিন। সকালবেলা মশারির ভেতরে আবছা অন্ধকারে চোখ মেলে তার মনে হয়, আজকের সকালটা যেন একটা নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে—অন্য দিনের সকালের মতো নয়। এই নতুনত্বের কারণটা সে উপলব্ধি করতে পারে না। বাড়িটা নীরব নিঝুম, শুধু শোনা যায় তার বুড়ো বাপের নিস্তেজ আর দম-আটকানা কাশির শব্দ। বাপের ঘরটা তার ঘরের ঠিক মুখোমুখি। রোজ সকালে তার বাপের কাশির শব্দটাই সবার আগে শোনা যায়। সকালবেলা ওয়াঙ লাঙ শুয়ে শুয়ে সেই শব্দ শোনে। বাপের ঘরের দরজা খোলার পর কাশির শব্দটা এগিয়ে আসছে শুনলে তবে সে বিছানা ছেড়ে ওঠে।

কিন্তু আজ ওয়াঙ প্রতীক্ষা করে না। সে চট করে উঠে মশারিটা সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে পড়ে। চোখে পড়ে রক্তিম উজ্জ্বল উষার উদয়; শুভ দিবসের সুন্দর আবির্ভাব। দেয়ালে-ছেঁড়া কাগজে-সাঁটা অপরিসর ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তামাটে আকাশের কিছুটা চোখে পড়ে। ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো বাতাসে ইতস্তত দোল খায়। সে এগিয়ে গিয়ে ঘুলঘুলির কাগজগুলো একটানে ছিঁড়ে ফেলে। "বসন্তকাল এসে গেছে, এ আবরণ এখন নিষ্প্রয়োজন", ওয়াঙ অনুচ্চকণ্ঠে বলে।

বাড়িটা আজ পরিষ্কার ঝকঝকে দেখাক, তার এই গোপন কামনাটুকু সে আজ উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করতে পারে না; মন তার শরমে সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। ঘুলঘুলি দিয়ে কোনোরকমে একা হাত গলানো চলে, হাতটা গলিয়ে সে বাইরের বাতাস অনুভব করে, পুবালি বাতাস—স্নিগ্ধ ফুরফুরে বৃষ্টিভরা। শুভ লক্ষণ বটে! শুষ্ক, নীরস মাঠে ফসল ফলানোর জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন। বাতাস এমনি বইতে থাকলে আজ না হোক, দিনকয়েকের মধ্যে বৃষ্টি হবে। শুকনো মাঠ শস্য-শ্যামল হয়ে উঠবে। আনন্দের কথা। সে কালও তার বাপকে বলছিল, সূর্য-তাপ এমনি প্রখর থাকলে গমের ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাবে। প্রকৃতির এ পরিবর্তন আজ যেন তাকে স্বর্গের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। এবার তাহলে দেখা যাচ্ছে ফসল ভালোই হবে।

ওয়াঙ ছুটে মাঝের ঘরে গিয়ে চট করে নীল রঙের পাজামাটা পরে রান্নাঘরে যায়। তার ঘরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রান্নাঘরটা। আবছা-আলোতে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে একটা বলদ মাথা বের করে ডাকে। শোবার ঘরের মতন

রান্নাঘরখানাও মেটে ইটের তৈরি—নিজেদের ক্ষেতের মাটির চৌকো ইট; নিজেদের ক্ষেতের উৎপন্ন গমের খড়ে ছাওয়া চাল। তার দাদু যৌবনকালে তাদের ক্ষেতের মাটি দিয়ে একটা উনুন তৈরি করেছিল। বহু বছরের রান্নায় পুড়ে পুড়ে সেই উনুন পাথরের মতন শক্ত আর কালো হয়ে গেছে। উনুনের থ্রপর একটা প্রকাণ্ড গোলাকার লোহার কড়াই চাপানো রয়েছে।

সেই কড়াইটা পানি দিয়ে অর্ধেক ভরে পাশের একটা জালা থেকে কিছুটা কুমড়ো এনে তাতে ডুবিয়ে দেয় খুব সাবধানে, যাতে পানিটা পড়ে গিয়ে অপচয় না হয়। পানি এখানে খুব দামি জিনিস। তারপর কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে হঠাৎ জালার সবটা পানি কড়াইয়ে ঢেলে দেয়। আজ সে সারাদেহে পানি ঢেলে অবগাহন করবে—সারাদেহকে স্নাত শুচি করবে। সেই মায়ের কোলে কাটানো শৈশবের পর কেউ তার দেহের পানে তাকায়নি। আজ একজন তাকাবে; তাই সে চায় দেহটাকে ধুয়ে-মুছে নির্মল করতে।

উনুনের পিছনে জমানো খড়কুটো থেকে একমুঠো শুকনো খড়কুটো এনে সে পরিপাটি করে উনুনে ঠেলে দেয়। অপচয় সে করে না কিছুরই। এবার সে চকমকি আর লোহা ঠুকে আগুনের ফিনকি জ্বালিয়ে খড়কুটোতে লাগিয়ে দেয়। উনুনটা জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে।

আজ সকালেই তার উনুন-ধরানো শেষ। আজ ছ'বছর তার মা মারা গেছে; এই দীর্ঘ ছ'বছরের প্রতিটি ভোরে সে এমনি করে উনুন ধরিয়ে আসছে; প্রতিটি ভোরে সে পানি গরম করে বাটিতে ঢেলে বুড়ো বাপকে দিয়েছে। বাপ হয়তো তখন বিছানায় বসে কাশছে বা ঘরের মেঝেতে পা নামিয়ে জুতো খুঁজছে; এই ছ'বছরের প্রতিটি সকাল বুড়ো বাপ গরম পানির জন্য প্রতীক্ষা করেছে, গরম পানি খেলে কাশিটার কিছুটা উপশম হবে বলে। এখন থেকে বাপ-বেটা আরাম-আয়েসের সুযোগ পাবে। আজ বাড়িতে একটি মেয়ে আসছে—তার বউ। ওয়াঙ লাঙকে আর শীত-গ্রীষ্মের প্রতিটি সকাল উনুন ধরানোর ঝক্কি পোয়াতে হবে না; সকালবেলায় জাগতেও হবে না। আজ থেকে সে-ও বিছানায় শুয়ে গরম পানির জন্য প্রতীক্ষা করতে পারবে—তার জন্যও এক বাটি গরম পানি আসবে। আর ফসল ভালো হলে, এ পানিতে চাইকি চায়ের পাতাও ভাসতে পারে। এমন সৌভাগ্য অবশ্য কদাচিৎ হয়।

দৈনন্দিন কাজের চাপে বউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে, উনুন ধরাবে তার সন্তানেরা। বহু সন্তানের মা হবে তার ভাবী বধূ। ওয়াঙ-এর ঔরসে জন্ম নেবে সে-সন্তানের দল। খোকাখুকির দল বাড়িময় ছুটোছুটি করবে; তাদের কলকাকলীতে বাড়িটা মুখর হয়ে থাকবে। এই রঙিন-মধুর কল্পনায় বিভোর হয়ে ওয়াঙ উনুনের কথা ভুলে যায়। তার মায়ের মৃত্যুর পর থেকে বাড়িটা তো ফাঁকাই পড়ে আছে। তিন-তিনটে ঘর বাপ-বেটার জন্য বেশিই বৈকি! প্রকাণ্ড পরিবার নিয়ে তাদের বহু আত্মীয়-স্বজন এ বাড়িতে জেঁকে বসতে চেয়েছে, তারা তাদের ঠেকিয়ে আসছে। বিশেষ করে

তার চাচা তো নাছোড়বান্দা হয়ে লেগেই আছে। এক দঙ্গল কাচ্চাবাচ্চাওয়ালা চাচা তাদের কি কম তোষামোদ করেছে আশ্রয়ের জন্য!

"তোমাদের দুটি প্রাণীর এত জায়গা লাগে কিসে? বাপ-বেটায় কি এক জায়গায় ঘুমানো চলে না? জোয়ান বেটার দেহের উষ্ণতায় বরং বাপের বুড়ো হাড় গরম থাকবে; কাশিটার উপশম হবে।"

কিন্তু তার বুড়ো বাপের মন গলেনি। সে জওয়াব দিয়ে এসেছে, "আমি আমার নাতির জন্য এ শয্যা আগলে আছি, নাতিই এ বয়সে আমার জীর্ণ হাড় চাঙা করবে।"

এবার নাতিরা আসছে—একটার পর একটা—অনেক আসছে। তাদের জন্য বিছানা পাততে হবে দেয়াল ঘেঁষে; মাঝের শূন্য ঘরে। নাতিদের বিছানায় সারাটা বাড়ি ভরে উঠবে। ওয়াঙ এই রঙিন কল্পনার জাল বুনতে থাকে। ইতিমধ্যে উনুন নিবে কড়াই'র পানি ঠাণ্ডা হতে চলেছে। বাপ কঙ্কালসার দেহে জামাটা জড়িয়ে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায়। কাশতে কাশতে থুতু ফেলে ধুঁকতে ধুঁকতে বলে, "আজ এখনও গরম পানি হল না, মানে কী? আমি যে কেশে ম'লাম।"

তার দিকে চাইতেই ওয়াঙ-এর সম্বিৎ ফিরে আসে, সে লজ্জা পায়।

"কাঠ-খড়িগুলো ভিজে", উনুনের আড়ালে বসে সে বিড়বিড় করে "ভিজে বাতাসে—"

বুড়ো অনবরত কাশতে থাকে; পানি গরম না-হওয়া পর্যন্ত কাশির বেগ আর থামে না। ওয়াঙ খানিকটা পানি একটা বাটিতে ঢেলে একমুহূর্ত ইতস্তত করে একটা চকচকে বৈয়াম থেকে গোটাকয় শুকনো কোঁকড়ানো পাতা বাটিতে ছিটিয়ে দেয়। চোখদুটো লোভে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শাসনের সুরে অভিযোগ করে :

"এই বড়মানুষিটা কেন শুনি! চা খাওয়া মানে তো রুপো গেলা!"

"আজই তো খরচ করার দিন।" ওয়াঙ লাঙ ঈষৎ হেসে জওয়াব দেয়।

বুড়ো তার জীর্ণ গ্রন্থিল আঙুলগুলো দিয়ে ওয়াঙ-এর হাত থেকে খপ্ করে বাটিটা ছিনিয়ে বিড়বিড় করতে করতে ভাসমান কোঁকড়ানো চায়ের পাতাগুলোর ক্রমবিস্তার পর্যবেক্ষণ করে। এই মহামূল্য পানীয় চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করতে তার মায়া লাগে। এ অপব্যয় যেন সে সহ্য করতে পারছে না।

"ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে!" ওয়াঙ বাপকে বলে।

"তাইতো, তাইতো"—অপ্রতিভ বাপ জওয়াব দিয়ে এক চুমুকে সবটুকু গরম চা শেষ করে ফেলে; মাতৃস্তন্য পানরত শিশুর ন্যায় বুড়োর চোখমুখ মহাতৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু ওয়াঙ যে বেপরোয়ার মতন কড়াইর সব পানি কাঠের গামলায় ঢেলে দেয়, তা বুড়োর চোখ এড়ায় না। ছেলের পানে নিষ্পলক চোখে চেয়ে কঠোর কণ্ঠে বলে ওঠে—"এত পানি ক্ষেতে ঢাললে যে ক্ষেতে ফসল ফলানো যেত!"

ওয়াঙ নীরবে কড়াইর পানি নিঃশেষ করে ঢেলে দেয়।

"কি! মুখে যে রা নেই?" বুড়ো ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

"এ বছর আমি একদিনও সারাগায়ে পানি ঢেলে গোসল করিনি।" ওয়াঙ অনুচ্চকণ্ঠে জওয়াব দেয়।

এক অচেনা নারী দেখবে বলেই যে তার এত আয়োজন, লজ্জায় সে একথা বাপকে বলতে পারে না। গামলাটা নিয়ে সে দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলে যায়। পাল্লাগুলো আলগা হয়ে চৌকাঠে ঝুলছে বলে ঘরের দরজাটা ভালো করে নিশ্ছিদ্র হয়ে বন্ধ হয় না। বুড়ো ধীরে ধীরে এসে ঘরের দরজার ফাঁকে মুখ রেখে আবার চেঁচায় :

"সকালবেলায় চা, আর এমনি করে পানির অপচয়। এসবের পরিণাম কিন্তু মোটেই ভালো নয়। মেয়েমানুষ বাড়িতে পা দিয়েই এসব দেখলে হয়েছে আর কী, ফতুর করে ছেড়ে দেবে।"

ওয়াঙও চেঁচিয়ে জওয়াব দেয়, "এ তো রোজই হয় না। একদিনেরই তো ব্যাপার। তা ছাড়া পানিটাও নষ্ট হচ্ছে না। গোসল হয়ে গেলে, আমি পানিটা ক্ষেতে ঢেলে দেব।"

এবার বুড়ো চুপ করে। ওয়াঙ লাঙ কাপড় ছাড়ে। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে গলে আসা সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে ঘরের মধ্যে চৌকোণো হয়ে পড়ে, ঘরটা আলোকিত করে দেয়। এই আলোর আভায় ওয়াঙ গরম পানিতে একটা তোয়ালে নিঙড়িয়ে তা দিয়ে তার কালো ছিপছিপে গা'টা খুব ভালো করে ঘষে। এতক্ষণ আবহাওয়াটা গরম বোধ করলেও গায়ে পানি ঢালতেই তার শীতশীত করে। মাজাঘষা হয়ে গেলে তার মার্জিত দেহ থেকে একটা স্নিগ্ধমধুর বাষ্প উড়তে থাকে।

গোসল শেষে সে তার মায়ের বাক্স থেকে একপ্রস্থ সূতির পোশাক বের করে পরে নেয়। শীতের জামাটা না পরলে আজ হয়তো শীত করবে। কিন্তু শুচি-শুভ্র দেহে আজ আর ছেঁড়া ময়লা জামাটা পরতে তার মন চায় না। বউ প্রথম পদার্পণেই তার গায়ে এই ছেঁড়া-ময়লা জামাটা দেখবে, সে তা চায় না। পরে অবশ্য তাকেই এসব ছেঁড়া-ময়লা কাপড় ধুতে আর সেলাই-ফোঁড়াই করতে হবে। তাই বলে আজই সে তার দৈন্য তার নবাগতা বধূকে দেখাতে রাজি নয়। নীল পাজামা আর কোট পরে তার উপর সে লম্বা চাপকানটা চাপিয়ে দেয়। এ চাপকানটা সে কোনো উৎসবের দিনে—বছরে মোট দশ-বারো দিন পরে। পোশাক পরা হয়ে গেলে সে ক্ষিপ্রহস্তে মাথার বেণিটি খুলে, একটা ছোট্ট নড়বড়ে টেবিলের দেরাজ থেকে একটা চিরুনি নিয়ে মাথা আঁচড়াতে থাকে।

তার বাপ আবার এগিয়ে এসে দরজার ফাঁকে মুখ রেখে চেঁচিয়ে ওঠে : "আমি কি আজ না-খেয়েই থাকব? খিদেয় যে পিত্তি জ্বলে গেল?" কণ্ঠে তার অভিযোগের সুর, "এ বয়েসে সময়মতো পেটে কিছু না পড়লে, হাড়গোড় যে ঠাণ্ডা হয়ে থাকে!"

"এই তো আসছি।" ওয়াঙ রেশমি কালো ফিতে দিয়ে মাথার বেণিটা বেশ পরিপাটি করে বাঁধতে বাঁধতে সাড়া দেয়।

চাপকানটা গা থেকে খুলে ফেলে—বেণিটা মাথায় জড়িয়ে বালতিটা নিয়ে সে বেরিয়ে আসে, বাপকে নাস্তা দেওয়ার কথা সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। একটু গরম পানিতে সামান্য আটা দিয়ে ঘেঁটে মণ্ড তৈরি করে সে বাপকে দেবে। তার আর খাওয়া হচ্ছে না। বালতিটা নিয়ে টলতে টলতে দোরগোড়ায় এসে বালতির পানিটা সেখানে ঢেলে দেয়। তখন তার মনে পড়ে, কড়াইর সব পানি সে খরচ করে ফেলেছে। পানি গরম করতে তাকে আবার উনুন ধরাতে হবে। ভাবতেই বাপের প্রতি মন তার বিরূপ হয়ে ওঠে; মেজাজও তিরিক্ষি হয়ে যায়।

"বুড়ো খাওয়া ছাড়া আর কিছুই জানে না; কোনোকিছু ভাবেও না।" উনুনের মুখের কাছে গিয়ে সে বকবক করে। অবশ্য বাপকে শুনিয়ে নয়। এই বুড়োর জন্য তার খানা তৈরি আজই শেষ। আঙিনার কুয়া থেকে এক বালতি পানি তুলে এনে সামান্য পানি কড়াইয়ে দেয়। পানিটুকু ফুটে উঠতেই মণ্ডটা তৈরি করে সে বাপের কাছে নিয়ে যায়।

"এ বেলা এই মণ্ডটুকু খেয়ে নাও, আজ রাতে আমরা ভাত খাব।"

"ক'টাই তো মাত্র চাল আছে!" খাবার টেবিলে গ্যাট হয়ে বসে বুড়ো মন্তব্য করে আর কাঠি দিয়ে হলদে ঘন ঘন মণ্ডটা নাড়ে।

"একটু কমই না-হয় খেলাম।" ওয়াঙ জওয়াব দেয়; কিন্তু ওয়াঙের কথা বাপের কান পর্যন্ত পৌঁছে না, সে তখন সশব্দে মণ্ডের বাটিতে চুমুক দিয়েছে।

ওয়াঙ ঘরে ফিরে গিয়ে চাপকানটা গায়ে চাপিয়ে বেণিটা পিঠে ঝুলিয়ে দেয়। এবার তার কামানো ভ্রু আর গালে হাত বুলোয়। "আজ একবার নতুন করে কামিয়ে নিলে হয় না?" সূর্য তো এখনও উঠিউঠি করছে। তাকে তো নাপিতপাড়া দিয়েই তার ভাবী বধূকে আনতে জমিদারবাড়ি যেতে হবে। বেশ কামিয়ে নিতে পারবে। তার ভাবী বধূ তো তার প্রতীক্ষায় বসেই আছে। দেখা যাক, পয়সায় কুলোয় কি না।

কোমর থেকে একটা তেল-চিটচিটে ছাইরঙের কাপড়ের থলি বের করে পয়সা গুনে দেখে—ছ'টা রুপোর ডলার আর একমুঠো তামার রেজকি রয়েছে। কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে রাতে খাবার দাওয়াত করেছে,একথা সে বাপকে এখনও বলেনি! নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আছে তার চাচা, চাচার ছেলে আর তার প্রতিবেশী জনতিনেক কিষাণবন্ধু। সে ঠিক করেছে, শহর থেকে কিছু গোশ্‌ত, ছোট্ট একটা মাছ আর কিছু বাদাম নিয়ে আসবে। গোটাকয়েক বাঁশের কোঁড় আনলেও মন্দ হয় না। জমিতে বাঁধাকপি হয়েছে, কিছু গাওয়া গোশ্‌ত এনে কপির সাথে মিলিয়ে রান্না করলে খেতে বেশ লাগবে। তবে বিনের তেল আর সয়াবিনের চাটনি কিনে পয়সা বাঁচলে গাওয়া গোশ্‌ত কেনার কথা ভেবে দেখবে। কামাতে গেলে, গাওয়া গোশ্‌ত হয়তো কেনা হবে না। চুল তার ছাঁটতেই হবে; গোশ্‌ত কেনা হোক আর না হোক—সে হঠাৎ একেবারে মনস্থির করে ফেলে।

বাপকে কিছু না বলেই সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। দিকচক্রবাল রাঙিয়ে পূর্বাচলে সূর্য উঠেছে। শিশিরসিক্ত গম আর যবের কচিপাতাগুলো সূর্যের সোনালি-কিরণে চকচক করছে। এ দৃশ্য ওয়াঙ লাঙ-এর কিষাণ-মনে ক্ষণিক দোলা দেয়। নিচু হয়ে কচি ডগাগুলো সে নেড়েচেড়ে দেখে। শাঁসহীন গমের শিষগুলো বুকে তৃষ্ণা নিয়ে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করছে। সে ব্যাকুলচিত্তে বাতাসের গন্ধ শুঁকে আকুল আগ্রহে আকাশের পানে তাকায়। বৃষ্টি-ভারাক্রান্ত কালো মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। একটা ধূপকাঠি কিনে সে ক্ষেত্র-দেবীর-মন্দির বেদিতে জ্বালিয়ে দেবে—এমনি দিনে পূজা না-দেওয়া অন্যায়।

আঁকাবাঁকা সরু মেঠো পথ বেয়ে সে এগিয়ে যায়। অদূরে শহর-প্রাচীর তার চোখে পড়ে। শহর-ফটক পেরিয়ে পথের পরেই সেই জমিদারবাড়ি। সে বাড়িতে তার ভাবী বধূ আশৈশব বাঁদি। 'হোয়াঙ মঞ্জিল' নামে এই বাড়িটি বিখ্যাত। অনেকে তাকে বলেছে, "বড়লোকের বাড়ির বাঁদি বিয়ে করার চেয়ে চিরজীবন আইবুড়ো থাকা অনেক ভালো।" সে যখন তার বাপকে বলল, "আমি কি আজীবন আইবুড়োই থাকব?" তখন তার বাপ বলেছিল, "এই দুর্দিনে বিয়ে ব্যাপারটা যা ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে আর গেরস্তের মেয়েরা দামি কাপড়-গয়নার যে কড়া দাবি করে বসছে, তাতে গরিবের কপালে দাসী-বাঁদি ছাড়া আর কীই-বা জুটবে?"

ছেলের কথায় বাপের অবিশ্যি টনক নড়ল, বাপ উদ্যোগী হয়ে মেয়ের খোঁজে হোয়াঙ-মঞ্জিলে গিয়ে জানতে পারল যে, সে-বাড়িতে অল্পবয়সী কোনো বিবাহযোগ্য বাঁদি নেই—আর যে আছে সে-ও সুন্দরী নয়।

খুব সুন্দরী না হোক, তাতে ওয়াঙের বড় একটা আসে যায় না। তবে সুন্দরী স্ত্রী পাওয়া গেলে মন্দ হত না। সবাই তাকে বাহবা দিত। তার বাপ তার বিদ্রোহব্যঞ্জক মুখ দেখে ধমক দিল।

"সুন্দরী বউ দিয়ে আমাদের কী হবে শুনি? আমাদের এমনি একজন মেয়েমানুষের দরকার, যে ঘর-সংসার দেখবে, ক্ষেতখামারে কাজ করবে আর বছর-বছর যার ছেলে হবে। না, পটের বিবি দিয়ে আমাদের চলবে না। সবসময় সেজেগুজে থাকবে; বাবুয়ানার চিন্তা করবে। আমরা চাষাভূষা মানুষ; আমাদের এতে পোষাবে না। আর বড়লোকের বাড়ির সুন্দরী বাঁদিরা কি কুমারী থাকতে পারে? তারা তো বড়লোকের এঁটো, বড়লোকদের জোয়ান বেটারা প্রাণভরে ভোগ করে, চুষে ছিবড়ে করে দেয়, অসতী কৌমার্যহারা সুন্দরীর চেয়ে অসুন্দরী সতী কুমারী বহুগুণে শ্রেয়। আর তুই কি ভাবিস, তোর মতন চাষাড়ে হাতের স্পর্শ, বড়লোকের মোলায়েম হাতের স্পর্শের মতন প্রীতিপ্রদ মনে করবে তারা? তোর এই ঝোড়ো কাকের মতন চেহারা আর রোদে-পোড়া মুখ তাদের কাছে গৌরকান্তি প্রেমিকদের মতন মনোরম লাগবে?"

ওয়াঙ লাঙ বাপের কথার সত্যতা উপলব্ধি করে; কিন্তু বাপের প্রস্তাবে সম্মতি দেবার আগে মনের কামনার সাথে তাকে সংগ্রাম করতে হয়। সে রুক্ষ-কণ্ঠে

জওয়াব দিল, "মুখে বসন্তের দাগ কিংবা ঠোঁট কাটা হলে কিন্তু আমি কিছুতেই বিয়ে করব না, আগেই বলে রাখছি।"

"দেখি কেমনটি পাওয়া যায়।" বলে বাপ এ প্রসঙ্গ শেষ করে দিল।

মেয়েটার মুখে দাগ নেই, ঠোঁটও তার অক্ষত আছে। তার ভাবী বধূ সম্বন্ধে ওয়াঙ এর চেয়ে বেশিকিছু জানতে পারেনি। তার বাপ আর সে মিলে তার ভাবী বধূর জন্য সোনার পানিতে রঙ-করা একজোড়া রুপোর আংটি আর একজোড়া কানের দুল কিনে আনল। বাগদান-সম্পাদনের সাক্ষ্যরূপে এগুলো নিয়ে তার বাপ মেয়ের মনিবকে দিয়ে এল। আজ সে নিজে গিয়ে তার বাগদত্তাকে নিয়ে আসবে।

সকালের আবছা আলোতে ওয়াঙ শহরের ফটকে প্রবেশ করে। ভিস্তিরা তখন ঘুরে ঘুরে পানি ছিটোচ্ছে, তাই ফটকের নিচটা স্নিগ্ধ। গ্রীষ্মের প্রখর তাপেও এ জায়গাটা ঠাণ্ডা। তরমুজওয়ালারা বিক্রির জন্য তরমুজ কেটে কেটে রেখে দিয়েছে। লোকের ভিড় নেই, শুধু দেয়ালের পাশে কাঁচা পিচফলের ঝুড়ি রেখে ফলওয়ালারা হাঁকছে :

"এই যে, নতুন পিচফল বেরিয়েছে—বসন্তকালের প্রথম পিচ, এই ফল খেয়ে শীতের জমানো সব বিষ-জ্বালা থেকে পেটকে বাঁচান।"

ওয়াঙ লাঙ আপনমনে ভাবে, "বউ যদি এ ফল ভালোবাসে, ফেরার পথে ওর জন্য একমুঠো নিয়ে যাব।"

ফটক পেরিয়ে সে ডানদিকে মোড় নেয়। একটু এগিয়ে গিয়েই নাপিতদের আড্ডা। এত সকালে সে আড্ডায় লোকের ভিড় নেই। আছে কেবল জনকয়েক চাষি। ক্ষেতের তরকারি নিয়ে রাতের বেলায় এসেছে। সকালবেলায় বিক্রি করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে ক্ষেতখামারে কাজ করবে। তারা তাদের ঝুড়ির উপর কুঁকড়ে শুয়ে রাতটা কাটিয়েছে। তরিতরকারি বিক্রি হয়ে গেছে। ওয়াঙ লাঙ তাদের এড়িয়ে চলে। আজ কোনো পরিচিত লোক তাকে ঠাট্টা-মশকরা করে সে তা চায় না। রাস্তার পাশে সারবন্দি হয়ে নাপিতের দল তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে বসেছে। ওয়াঙ এগিয়ে সর্বশেষ দোকানটায় গিয়ে একটা টুলে বসে নাপিতকে ইঙ্গিত করে। নাপিত চট করে গরম পানির কেৎলি থেকে একটা ছোট তামার বাটিতে অল্প একটু পানি ঢেলে দেয়।

"সব মুড়িয়ে দেব?" নাপিত ব্যবসায়ীর সুরে প্রশ্ন করে।

"মাথা আর মুখ।" ওয়াঙ জওয়াব দেয়।

'কান আর নাক পরিষ্কার করব না?" নাপিত আবার শুধায়।

"কত লাগবে?" ওয়াঙ সাবধানে জানতে চায়।

"চার পেনি।" নাপিত জওয়াব দিয়ে একটুকরো ছেঁড়া কাপড় গরম পানিতে ডোবায়।

"দু পেনি দেব।" ওয়াঙ দর-কষাকষি করে।

"তাতেও হবে, তবে একটা কান আর একটা নাক। অর্ধেক পয়সায় অর্ধেক কাজ। তা কোন্‌দিকের নাক-কান ধরব?" মুখের উপর জুতসই জওয়াবটা দিয়ে নাপিত তার পার্শ্বে উপবিষ্ট নাপিতের পানে চেয়ে চোখ টিপে হাসে। শ্রোতাও হো হো করে হেসে ওঠে। কাকে লক্ষ্য করে এ হাসি-বিদ্রূপ চলছে, ওয়াঙ তা উপলব্ধি করে। অজ্ঞাত কারণে এই শহুরেদের কাছে তার মনে হীনমন্যতাবোধ জাগে। যদিও সে মনেপ্রাণে জানে এরা নাপিত; নিকৃষ্ট মানুষ। অনন্যোপায় হয়ে সে জওয়াব দেয়, "তোমার যা ইচ্ছে তাই করো—"

নাপিতের হাতে সে নিজেকে সঁপে দেয়; নাপিত মাথায় সাবান ঘষে কামাতে থাকে। আসলে নাপিত লোকটা নেহাত মন্দ নয়। সে বিনি পয়সায় ওয়াঙের কাঁধ আর পিঠ বেশ মোলায়েম হাতে টিপে দেয়; ওয়াঙ আরাম অনুভব করে। মাথার সামনেটা কামাতে কামাতে সে মন্তব্য করে, "বেণিটা কেটে ফেললে বেশ দেখাত কিন্তু; বেণি কেটে ফেলাই আধুনিক ফ্যাশান।"

তার মাথার তালুর চারদিকে বেণিটা ঘিরে নাপিতের কাঁচি ইতস্তত ঘুরতে দেখে ওয়াঙ শঙ্কিত হয়ে ওঠে, সে আর্তনাদ করে ওঠে :

"না, না, বাবার অনুমতি না নিয়ে বেণি কাটতে পারব না।" নাপিত হাসে; বেণিটা বাঁচিয়ে চারদিক মুড়িয়ে দেয়।

কামানো শেষ হলে ওয়াঙ নাপিতের শিরা-ফোলা ভিজা হাতে পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দেয়। এত পয়সা বাজে খরচ হয়ে গেল ভেবে সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু চলতে চলতে কামানো মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতেই মন তার আবার চাঙা হয়ে ওঠে, স্নিগ্ধ হাওয়ায় তার মনে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগে, "যাক, একদিন বৈ তো নয়!"

ওয়াঙ এবার বাজারে গিয়ে এক সের গরুর গোশ্‌ত কিনে ফেলে। কসাই পদ্মপাতায় মুড়ে দেবার সময় সে ভালো করে লক্ষ করে; পাছে কসাই তাকে ঠকিয়ে না দেয়। ওয়াঙ ইতস্তত করে তিন ছটাক খাশির গোশ্‌তও কিনে ফেলে। সবকিছু কেনা হয়ে গেলে—মায় খানিকটা সয়াবিনের চাটনি—সে মোমবাতিওয়ালার দোকানে গিয়ে একজোড়া ধূপকাঠি কেনে। এবার সে লজ্জাজড়িত ধীর-মন্থর পদক্ষেপে হোয়াঙ-মঞ্জিলের দিকে রওয়ানা হয়।

হোয়াঙ-মহলের ফটকে পৌঁছে বুক তার ভয়ে কাঁপতে থাকে। একলা সে এল কেমন করে? সঙ্গে কাউকে নিয়ে আসা উচিত ছিল। তার বাপ চাচা বা তার নিকটতম প্রতিবেশী চিঙকে। সে আগে কোনোদিন এতবড় মহলে ঢোকেনি, কাঁধে বিয়ের বাজার নিয়ে সে কেমন করে বাড়িতে ঢুকে বলবে, "আমি বউ নিতে এসেছি?" লোকেই-বা কী মনে করবে?

বিরাট ফটকের সামনে সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। লোহার কপাটওয়ালা কালো রঙের ফটকটা একেবারে বন্ধ। ফটকের দুই ধারে প্রহরারত দুটো প্রস্তরের সিংহমূর্তি। কেউ কোথাও নেই। সে ফিরে আসে। এ ফটকে প্রবেশ তার পক্ষে অসম্ভব।

সহসা তার দেহটা অবশ হয়ে আসে। কোথাও গিয়ে বরং আগে দুটো খেয়ে নিক। পেটে আজ তার কিছু পড়েনি—খাবার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। সে পথের ধারে একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয় যায়; দুটো পেনি টেবিলের উপর রেখে খেতে বসে। কালো উর্দি পরা একটা নোংরা ছোকরা কাছে আসতেই সে তাকে খাবার আনতে হুকুম দেয়। খাবার আনা হলে সে বুভুক্ষুর মতো গোগ্রাসে গিলতে থাকে; দোকানের ছোকরা তখন পেনি দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে।

"আর কিছু লাগবে?" ছোকরা উদাস নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে। ওয়াঙ মাথার ইশারায় অসম্মতি জানিয়ে চারদিকে তাকায়। এখানে-ওখানে জনকয়েক লোক বসে খাচ্ছে। সবাই তার অপরিচিত, সবাই দরিদ্র। দরিদ্রদের জন্যই এ রেস্তোরাঁটা। ঐশ্বর্য আর পরিচ্ছন্নতায় সে তাদের মধ্যে বিশিষ্ট। একজন ভিখিরি চলতে চলতে কাতরস্বরে তার সামনে হাত পাতে।

"হুজুর! দয়া করে আমাকে কিছু দিন, আমি ভুখা আছি।"

ওয়াঙ লাঙের কাছে আজপর্যন্ত কোনো ভিখিরি হাত পাতেনি; হুজুর বলেও তাকে আজপর্যন্ত কেউ সম্বোধন করেনি, তাই সে কৃতার্থচিত্তে ভিখিরির ভিক্ষাপাত্রে দুটো তাম্রমুদ্রা ছুড়ে দেয়, কেউ দেখার আগে ভিখিরি চট করে সে দুটো পেনি লুকিয়ে ফেলে।

ওয়াঙ বসে থাকে; এদিকে বেলাও বাড়তে থাকে। রেস্তোরাঁর ছোকরা অধৈর্য কণ্ঠে বলে ওঠে. "আর কিছু না-খেয়ে বসে থাকলে টুল-টেবিলের ভাড়া দিতে হবে।"

ছোকরার ধৃষ্টতায় ওয়াঙ চটে ওঠে। সে হয়তো 'ধ্যাৎ' বলে উঠেই পড়ত; কিন্তু হোয়াঙ-মঞ্জিলে গিয়ে বউ-খোঁজার ভাবনায় তার সারা গা থেকে ঝরঝর করে ঘাম পড়তে থাকে। ক্ষেতখামারে কাজ করার বেলায় তার এমনি ঘাম হয়। অগত্যা বসেই থাকতে হয়, আর এক পেয়ালা চায়ের হুকুম দিতে হয়।

"এক পেয়ালা চা নিয়ে এসো।" সে দুর্বলকণ্ঠে ছোকরাকে হুকুম দেয়। ছোকরা চট করে চা নিয়ে এসে দাম চায়।

ওয়াঙ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এবার ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করতেই হল।

"এ যে রাহাজানি।" সে আপনমনে বিড়বিড় করে। এমনি সময় তার এক পরিচিত প্রতিবেশীকে রেস্তোঁরায় ঢুকতে দেখে, তাড়াতাড়ি চায়ের দামটা টেবিলের উপর রেখে এক চুমুকে চা পান শেষ করে পাশের দুয়ার দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

"কাজটা আমার সমাধা করতেই হবে।" ওয়াঙ বেপরোয়া হয়ে হোয়াঙ-মঞ্জিলের পানে পা বাড়ায়।

বেলা যথেষ্ট হয়েছে। ফটকও ইতিমধ্যে খুলে গেছে, দরোয়ান প্রাতরাশ শেষ করে অলসভাবে তার দোরগোড়ায় বসে খড়্‌কে দিয়ে দাঁত খুঁটছে। দেখতে দরোয়ান লম্বা-চওড়া; বাঁ গালে একটা আঁচিল, তাতে তিনটে অকর্তিত দীর্ঘ চুল। ওয়াঙ লাঙের কাঁধে ঝুড়ি দেখে তাকে ফেরিওয়ালা ভেবে সে হাঁক ছাড়ে :

"কী চাই?"

ভ্যাগাচ্যাকা খেয়ে ওয়াঙ থতমত করে বলে, "আমি ওয়াঙ লাঙ—চাষি।"

"তুমি ওয়াঙ লাঙ, চাষি, তাতে হল কী?" দরোয়ান ঝাঁঝালো কণ্ঠে প্রশ্ন করে। মনিবের ধনী ইয়ার-দোস্ত ছাড়া কারো সাথে ভদ্রতা করা তার স্বভাব নয়।

"আমি এসেছি—আমি এসেছি—" ওয়াঙ ঘাবড়ে যায়।

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি।" দরোয়ান আঁচিলের চুলে পাক দিতে দিতে মুরব্বিয়ানার সুরে বলে।

"এ বাড়িতে একটা মেয়ে আছে।"—অসহায় ওয়াঙ লাঙের কণ্ঠস্বর ফিসফিসানিতে এসে দাঁড়ায়; রোদে ইতিমধ্যে তার গা বেয়ে ঘাম ঝরছে, তার কথা শুনে দরোয়ান অট্টহাসি হেসে ওঠে।

"তা হলে তুমিই আমাদের বর? বউ নিতে এসেছ! কাঁধে এই ঝুড়ি দেখে তোমাকে বর বলে যে চেনাই যায় না। তা বেশ।" দরোয়ান হাসতে হাসতে গর্জে ওঠে।

কুণ্ঠিত ওয়াঙ কাতরকণ্ঠে জানায় যে, এ ঝুড়িতে সামান্য পরিমাণ গোশ্‌ত আছে। দরোয়ান তাকে মহলের ভিতর নিয়ে যাবে এই ভরসায় ওয়াঙ প্রতীক্ষা করে, কিন্তু দরোয়ান অনড়। তা দেখে সে বিব্রতকণ্ঠে বলে, "তা হলে কি আমি একাই মহলে ঢুকব?"

দরোয়ান তার কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক মিশিয়ে বলে, "তা হলেই হয়েছে। মাথা তোমার আজ থাকবে না। মনিব তোমাকে খুনই করে ফেলবে।" তারপর ওয়াঙকে হাবাগোবা দেখে সুর নামিয়ে বলে, "রুপোর চাকতি ফ্যালো, ভেতরে ঢোকার উপায় করে দিচ্ছি।"

ওয়াঙ বুঝতে পারে দরোয়ান ঘুস চাইছে। সে মিনতির সুরে বলে, "আমি চাষা মানুষ—বড্ড গরিব।"

"তোমার ট্যাঁকে কী আছে দেখাও।" দরোয়ান আদেশের সুরে হাঁক দেয়।

ওয়াঙ লাঙকে কোমর থেকে সত্যি একটা কাপড়ের থলি বের করতে দেখে দরোয়ান দাঁত বের করে হাসে। ওয়াঙ থলি থেকে তার পুঁজি বের করে। একটা রৌপ্য আর চৌদ্দটা তাম্রমুদ্রা মাত্র অবশিষ্ট আছে।

"রৌপ্যমুদ্রাটা আমার চাই।" দরোয়ান নিরুত্তাপ কণ্ঠে ওয়াঙকে জানায়। কোনো প্রতিবাদ করার আগেই ছোঁ মেরে রৌপ্যমুদ্রাটা হাতে নিয়ে সে ওয়াঙকে তার অনুসরণ করতে হুকুম দেয়।

মহলে প্রবেশের পথে দরোয়ান হাঁক দেয়—"বর এসেছে। বর।"

দরোয়ানের প্রতি মন তার বিষিয়ে উঠেছে। তার হাঁকডাকও তার ভালো লাগছে না, কিন্তু প্রতিবাদ সে করতে পারে না। সে এখানে অসহায়। তাই ঝুড়িটা কাঁধে নিয়ে সে নীরবে দরোয়ানের অনুসরণ করে।

এমন প্রকাণ্ড বাড়িতে সে আগে কোনোদিন প্রবেশ করেনি। স্বপ্নমুগ্ধ চিত্তে সে দরোয়ানের অনুসরণ করে। যেতে যেতে যে-দৃশ্যগুলো দেখল, তার একটাও তার

মনে রইল না। তার কানে আসে সম্মুখে দরোয়ানের হাঁক আর চারিদিকে নারী-পুরুষের হাসি-কলরোল। প্রায় শ-খানেক মহল পার হয়ে দরোয়ান থামে। ওয়াঙকে একটা ঘরের ভিতর ঠেলে দিয়ে অপেক্ষা করতে বলে সে একলা অন্দরমহলে যায়। একটু পরে ফিরে এসে ওয়াঙকে বলে, "তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বড় বেগম হুকুম দিয়েছেন।"

ওয়াঙ লাঙ পা বাড়াতেই দরোয়ান বিরক্তির সুরে ধমক দেয়, "আরে বুরবাক। কাঁধে ঝুড়ি নিয়ে খানদানি বেগমের সামনে যাওয়া যায় না। এ বোঝা কাঁধে নিয়ে তাঁকে সালাম করবে কেমন করে?"

"হ্যাঁ, তাই তো—" বলে অপ্রতিভ ওয়াঙ দরোয়ানের কথায় সায় দেয়। কিন্তু পাছে কিছু চুরি হয়ে যায়, এই ভয়ে সাহস করে ঝুড়িটা নামিয়ে রাখতেও তার মন চায় না। তার এটা কিছুতে মনে হয় না যে, সকলেই তার মতন এমনি আহার্য-সম্পদের প্রতি লালায়িত নয়। দরোয়ান ক্রোধে গরগর করে ওঠে।

"এ খানদানি বাড়িতে এমন গোশ্‌ত কুকুরের খাদ্য।" এই বলে সে ঝুড়িটা জোর করে নামিয়ে একটা দরজার পিছনে ছুড়ে দিয়ে ওয়াঙকে সামনে ঠেলে দেয়।

দীর্ঘ কারুকার্যখচিত স্তম্ভওয়ালা একটা সংকীর্ণ বারান্দা পেরিয়ে তারা একটা হলঘরে প্রবেশ করে, এমন বিরাট আর মনোরম ঘর সে জীবনে দেখেনি। তাদের খুপড়ির মতন বিশটা খুপড়ি এ ঘরে ধরে রাখা চলে। মাথার উপর কারুকার্যখচিত আর চিত্রাঙ্কিত কড়ি-বর্গা দেখতে দেখতে সে হুমড়ি খায়। দরোয়ান তাকে টেনে না ধরলে সে পড়ে গড়াগড়ি যেত।

বিপর্যস্ত ওয়াঙ কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকায়। হলঘরের মাঝখানে একটা উঁচু বেদিতে একজন বর্ষীয়সী মহিলা উপবিষ্ট। মুক্তোশুভ্র সাটিনের পোশাকে তাঁর ক্ষুদ্র সুন্দর তনু আবৃত, তার পাশে একটা নিচু ছোট টেবিলের উপর একটা চণ্ডুর পাইপ জ্বলছে। বলিরেখাবহুল তাঁর মুখ! বানরের চোখের মতন তীক্ষ্ণ কালো রেখাবলয়িত কোটরগত চোখে মহিলা ওয়াঙের পানে তাকায়। তাঁর একহাতে চণ্ডুর পাইপের একটা প্রান্ত। কোমল-মসৃণ পীত ত্বকে আবৃত হাতখানা সোনার গিল্টি-করা প্রতিমার হাতের মতন। ওয়াঙ জানু পেতে মেঝেতে মাথা ঠুকে তাঁকে সালাম করে।

মহিলা গুরুগম্ভীর কণ্ঠে দরোয়ানকে হুকুম দেন, "উঠিয়ে দে ওকে। হয়েছে, খুব হয়েছে। ও কি সেই বাঁদিটার জন্য এসেছে?"

"জি, বেগম সাহেবা!" দরোয়ান জওয়াব দেয়।

"ও চুপ করে আছে কেন?"

"লোকটা বোকা কি না, তাই।" আঁচিলের চুলে পাক দিতে দিতে সে বলে। একথা শুনে ওয়াঙের চৈতন্যোদয় হয়। সে দরোয়ানের পানে কটমট করে চেয়ে বিনয়নম্র সুরে বলে, "আমি চাষাভূষা মানুষ, বেগম সাহেবা! আপনাদের মতন

মহামান্যদের দরবারে কেমন করে কী বলতে হয়, তা আমার জানা নেই। বেআদবি মাফ করবেন।"

বর্ষীয়সী মহিলা পূর্ণ গাম্ভীর্যে তার পানে স্থিরদৃষ্টি মেলে কী যেন বলতে গিয়ে সহসা চণ্ডুর নলটা চেপে ধরেন। নলটা চেপে ধরেই বিস্মৃতির অতল তলে তিনি ডুবে গেলেন; ওয়াঙের অস্তিত্ব আর উপস্থিতি তাঁর মন থেকে মুছে গেল। ঝুঁকে পড়ে নলটায় তীব্র টান কষতেই তাঁর চৈতন্য লুপ্ত হয়ে যায়; চোখের দৃষ্টি তাঁর ঘোলাটে হয়ে ওঠে। বিমূঢ় ওয়াঙ লাঙ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। অল্পক্ষণ পরে মহিলার উদাস-ঘোলাটে দৃষ্টি ওয়াঙের উপর পড়তেই তিনি রুক্ষ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন :

"এ লোকটা এখানে কেন? কী চায়?" যেন কয়েক মুহূর্ত আগে তার সব স্মৃতি তাঁর মন থেকে মুছে গেছে। দরোয়ান নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে।

"আমি সেই মেয়েটার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, বেগম সাহেবা"—বিস্ময়াভিভূত ওয়াঙ জওয়াব দেয়।

"মেয়ে? কোন্ মেয়ে?" মহিলা বলতে শুরু করেন। এমন সময় পাশের বাঁদিটা তাঁর কানে ফিসফিসিয়ে কী বলতেই চকিতে তাঁর লুপ্ত চৈতন্য ফিরে আসে। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ভুলেই গেছলাম। এসব তুচ্ছ কথা মনেও থাকে না ছাই! তুমি ওলান নাম্নী বাঁদিটার জন্য এসেছ তো? এখন মনে পড়েছে। এক চাষার সাথে তাকে বিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছিলাম। তুমি কি সেই চাষা?"

"জি হ্যাঁ, আমিই!" ওয়াঙ লাঙ জওয়াব দেয়।

"ওলানকে চট করে ডেকে নিয়ে আয়।" তিনি পাশের বাঁদিকে হুকুম দেন। তিনি যেন তাড়াতাড়ি এ ঝামেলা চুকিয়ে দিয়ে চণ্ডুসেবনে মন দিতে পারলেই বেঁচে যান।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁদিটা নীলরঙের জামা আর পাজামা-পরা চওড়া-মুখ দীর্ঘাঙ্গিনী একটা মেয়েকে হাত ধরে নিয়ে ঢোকে। মেয়েটার পানে একবার তাকিয়ে ওয়াঙ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। তার বুক স্পন্দিত হয়ে ওঠে। এই তাহলে তার ভাবী বধূ—চিরসঙ্গিনী!

"এদিকে আয়।" বেগম তাচ্ছিল্যের সুরে ওলানকে কাছে ডাকে। "এ লোকটা তোকে নিতে এসেছে—এই তোর বর।"

ওলান বেগমের সামনে দুহাত জোড় করে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে।

"তৈরি আছিস?"

ওলান প্রতিধ্বনির মতন চাপা ধীর শান্ত কণ্ঠে জওয়াব দেয়, "জি, হ্যাঁ।"

ওয়াঙ লাঙ তার ভাবী বধূর কণ্ঠস্বর এই প্রথম শোনে। তার পানে ফিরে তাকায়। কণ্ঠস্বর মন্দ নয়—মধুক্ষরাও নয় আবার রুক্ষও নয়। মেয়েটার মাথার চুল পরিচ্ছন্ন আর সুবিন্যস্ত; পরিধানের পোশাকও পরিষ্কার, মেয়েটার পা বাঁধা নয় দেখে মুহূর্তের জন্য ওয়াঙ নৈরাশ্যে দমে যায়; তবে এই নৈরাশ্য তার মনে দানা বাঁধার অবসর পায় না। বেগম সাহেবা দরোয়ানকে বলেন :

"ওলানের বাক্সটা ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তাদের বিদায় করে দাও।" ওয়াঙ লাঙকে ডেকে বলে, "ওলানের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমি যা বলছি শোনো।" বেগম সাহেবা তাদের বিদায়বাণী শোনায়। ওয়াঙকে লক্ষ করে বলে, "দশ বছর বয়সে এ মেয়েটা আমাদের বাড়িতে আসে, এখন তার বয়েস বিশ। এক দুর্ভিক্ষের বছর আমি ওকে কিনেছিলাম। সেবার ওর দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত মা-বাপ উত্তরাঞ্চল থেকে এসেছিল এখানে আহারের সন্ধানে। পেটের দায়ে মেয়েটাকে বিক্রি করে দেয় আমার কাছে। দুর্ভিক্ষ শেষে তারা স্বদেশে চলে যায়। তাদের আর কোনো খোঁজখবর নেই। মেয়েটা স্বাস্থ্যবতী; দৈহিক শক্তি যথেষ্ট, সে তোর সংসারের কাজ আর ক্ষেতখামারের কাজ খুব করতে পারবে। চেহারা অবশ্য তার তত ভালো নয়; তবে এজন্য তোর কোনো অসুবিধে হবে না; সুন্দরী বউয়ের তোর প্রয়োজনও নেই। কেবল আয়েশি পুরুষদেরই চিত্তবিনোদনের জন্য সুন্দরী নারীর প্রয়োজন। নেহাত সাদাসিধে মেয়ে। চালাকি সে জানে না। তবে যা হুকুম দিবি, তা ঠিক মতনই পালন করবে। মেজাজও তার ভালো—বেশ ঠাণ্ডা। যতটুকু আমি জানি, তার কৌমার্য অক্ষত আছে— সে অস্পৃষ্ট। আমার ছেলে বা নাতিদের মন-ভোলাবার মতন রূপসী সে নয়; যদি কিছু অঘটন ঘটে থাকে তা মহলের চাকর-বাকরদের সাথে। তবে এতগুলো সুন্দরী বাঁদি মহলে থাকতে আমার মনে হয় না কোনো চাকর তার উপর নজর দিয়েছে। সাহেবদের এঁটো সুন্দরী বাঁদিরাই চাকরবাকরদের ভোগে লাগে। এবার তুই ওকে নিয়ে গিয়ে ওর সদ্ব্যবহার কর্। মেয়েটা চালচলনে ভারী আর একটু বোকাটে হলেও আসলে ভালো। পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের কামনা না থাকলে ওকে আমি হাতছাড়া করতাম না। অবশ্য সুপাত্র পেলে আর বাড়ির সাহেবদের বিলাস-ভোগে না লাগলে, বাঁদিদের বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দেওয়াই আমার নীতি।"

তারপর ওলানকে উদ্দেশ করে বেগম সাহেবা বলেন, "এর কথা মেনে চলবি, একে বহু পুত্রসন্তান সওগাত দিবি। তোর প্রথম পুত্রসন্তান আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাবি।"

"আচ্ছা।" বলে ওলান বিনয়-নম্র কণ্ঠে সম্মতি জানায়।

এ পরিস্থিতিতে তার কোনো কথা বলা প্রয়োজন কি না, তাই ভেবে ওয়াঙ লাঙ বিব্রত হয়ে ওঠে।

"এবার তোরা যা! যা বলছি!" বেগম শাসনের সুরে বলে ওঠে। ওয়াঙ লাঙ নতমস্তকে তাঁকে সালাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তার বউ আর দরোয়ান তাকে অনুসরণ করে। ওয়াঙ লাঙ তার ঝুড়ি আর বউয়ের বাক্সটা নিয়ে এগিয়ে যায়। তাদের অলক্ষে দরোয়ান সটকে পড়ে।

ওয়াঙ লাঙ বউয়ের পানে ফিরে তাকায়। এই তাদের শুভদৃষ্টি। মুখচন্দ্রিকা! ওলানের মুখাবয়ব চৌকো—মুখখানা সারল্যে ভরা। নাকটা ছোট আর থাবড়া;

নাসারন্ধ্র আর মুখের হাঁ'র বিস্তৃতি অপরিমিত। অনায়ত কালো চোখের দৃষ্টিতে অব্যক্ত বেদনার অভিব্যক্তি, মেয়েটা স্বল্পভাষিণী, ভাবাবেগবিহীন। সে নির্বিকারচিত্তে ওয়াঙের চাহনি সহ্য করে যায়, এ চাহনি তার মনে পুলক শিহরণ তোলে না—অঙ্গে চাঞ্চল্য জাগায় না। ওয়াঙ তাকে পর্যবেক্ষণ করে। এ নারীর দেহে সৌন্দর্য নেই; মুখে পেলবতার ছোঁওয়া নেই। সহনশীল আর ঔদাস্যে ভরা অতি মামুলি একখানা মুখ। তবে ওয়াঙের আনন্দ, তার বউয়ের মুখে বসন্তের ক্ষতচিহ্ন নেই, ঠোঁটদুটোও তার অক্ষত অবিকৃত। তার কানে ওয়াঙের দেওয়া দুলজোড়া দুলছে, আঙুলে তারই দেওয়া আঙটি। গোপন আনন্দে চিত্তভরে ওয়াঙ বউয়ের ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়। সে আজ তার বউ; তার জীবনসঙ্গিনী পেয়েছে। সুখ-সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি তার মনে পুলক-শিহরণ জাগায়।

"এই রইল ঝুড়ি আর বাক্স।" গম্ভীর কর্তৃত্বের সুরে সে বউকে বলে। ওলান নিঃশব্দে নুয়ে বাক্সটার একধার ধরে কাঁধে তুলে উঠতে চেষ্টা করে। অতিরিক্ত ভারে তার পা টলতে থাকে। ওয়াঙ তা লক্ষ করে বলে ওঠে, "বাক্সটা আমিই নিচ্ছি; ঝুড়িটা বরং তুমি নাও।"

সে বাক্সটা পিঠে উঠিয়ে নেয়। দামি পোশাকটা বুঝি তার নষ্ট হয়ে যায়। ওলান নীরবে ঝুড়ির হাতলটা হাতে নেয়। পিঠে এমনি বোঝা নিয়ে এ বাড়ির শত মহল পার হওয়ার কথা ভাবতেই কুণ্ঠায় মন তার কুঁকড়ে ওঠে।

"সদর দেউড়ি দিয়ে না বেরিয়ে অন্য কোনো দেউড়ি দিয়ে বেরোতে পারলে—" সে বিড়বিড় করে। কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে ওলানের বিলম্ব হয়। একটু ভেবে সে স্বামীকে ইশারা করে। একটা নুয়ে-পড়া পাইনগাছের তলা দিয়ে ঝাড়-ঝোপ আর কাদা-ভরা অব্যবহৃত পথে সে স্বামীকে নিয়ে অন্দরমহলের দেউড়ি দিয়ে সদর-রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

সে দু-একবার ওলানের পানে পিছন ফিরে তাকায়। ওলান থ্যাবড়া পা ফেলে থপ থপ করে চলছে যেন অনাদিকাল থেকে সে-পথ দিয়ে এমনি করে চলে আসছে। ভাবব্যঞ্জনাহীন তার মুখ। শহর-ফটকের কাছে এসে ওয়াঙ থমকে দাঁড়ায়। এক হাতে বাক্সটা ধরে, অন্য হাতে কোমর হাতড়াতে থাকে। কোমরে বাঁধা থলিটা থেকে দুটো পেনি বের করে ছয়টা কাঁচা পিচফল কিনে নেয়।

"এগুলো তুমি খেয়ে নাও।"—সে বউকে নীরস কর্তৃত্বের সুরে হুকুম দেয়।

লোভী শিশুর মতন ওলান ফলগুলো খপ করে ওয়াঙের হাত থেকে নিয়ে আপন হাতের মুঠোয় রাখে। গমক্ষেতের আল ভেঙে যেতে যেতে ওয়াঙ পিছনপানে তাকিয়ে লক্ষ করে, ওলান ফলগুলো ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। স্বামী তাকে লক্ষ করছে দেখে ফলগুলো হাতের মধ্যে লুকিয়ে চিবানো বন্ধ করে দেয়।

এমনি করে তারা পশ্চিমের মাঠে পৌঁছে। সেখানে মাটির বুকে মন্দির অবস্থিত। ছোট মন্দির—মানুষের কাঁধের সমান উঁচু; ধূসর ইটের দেয়াল আর টাইলের ছাদ। ওয়াঙের দাদা শহর থেকে গরুর গাড়ি বোঝাই করে ইট এনে এ মন্দির তৈরি

করেছিল। সে বহুযুগের কথা। দেয়ালের পলেস্তরা-করা বাইরেটায় এককালে কোনো গেঁয়ো শিল্পী পাহাড় আর বেণুবনের ছবি এঁকেছিল। কিন্তু যুগ যুগ ধরে এর ওপর দিয়ে চলেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর বৃষ্টিধারার নির্মম অত্যাচার। বর্তমানে চিত্রশিল্প আবছা-রেখায় পর্যবসিত হয়েছে।

মন্দিরের অভ্যন্তরে নির্বিকারচিত্ত, ধ্যান-গম্ভীর দুটো ক্ষুদ্রকায় মৃন্ময়মূর্তি। ক্ষেত্র-দেবতা আর তার দেবীর মূর্তি। এ জমির মাটি দিয়েই এই দেবদেবীর অঙ্গ তৈরি; লাল কাগজ তাদের অঙ্গবসন, দেবতার ক্ষীণ সোনালি গোঁফজোড়া তৈরি হয়েছে সত্যিকার চুল দিয়ে। প্রতি নববর্ষে ওয়াঙের বাপ বাজার থেকে লাল কাগজ কিনে যুগলের দেহাবরণ তৈরি করত, তাদের ভক্তিভরে সুন্দর করে সাজাত। আর প্রতিবছর বৃষ্টিধারা আর তুষারপাতে তাদের অঙ্গাবরণ নষ্ট হত।

এখন দুই যুগলের পরিহিত বসন টাটকা—আনকোরা; কারণ এখন বছরের প্রারম্ভ মাত্র। দেবদেবীর সুন্দর ঝকঝকে মূর্তি দেখে ওয়াঙ গর্ব অনুভব করে। বউয়ের হাত থেকে ঝুড়িটা নামিয়ে সে সন্তর্পণে ধূপকাঠি খুঁজে বের করে। কাঠিগুলো ভেঙে যায়নি তো? ওয়াঙ চিন্তাক্লিষ্ট মনে ভাবে, তাহলে ভয়ানক অমঙ্গল হবে তো। যাক, কাঠিগুলো ঠিকই আছে। দেবীর মাধ্যমে জমাট ভস্মস্তূপে সে তার ধূপকাঠিগুলো গুঁজে দেয়। এ অঞ্চলের সবাই এ মন্দিরে পূজা করে, তাই এর ভস্মস্তূপ। ধূপকাঠিগুলো পুঁতে সে ওগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দেবদেবীর সামনে এসে সবিনয়ে দাঁড়ায়। ওলান জ্বলন্ত ধূপকাঠির পানে নিবেদিতচিত্তে চেয়ে থাকে; ধূপকাঠি পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ধূপকাঠির মাথায় ছাই জমতেই ওলান তর্জনীর ডগার মৃদু আঘাতে সে ছাইটা মাটিতে ফেলে দেয়। হঠাৎ তার মনে হয়, সে অপরাধ করে ফেলেছে। শঙ্কিতচিত্তে সে স্বামীর পানে মূকদৃষ্টিতে তাকায়। ওয়াঙের বেশ লাগে ওলানের আঙুলের ডগার আঘাতে ছাই ফেলাটা। এ যেন তার সত্যোপলব্ধির প্রকাশ। ও যেন জানিয়ে দিচ্ছে, এই ধূপকাঠির অধিকারী ওয়াঙ একা নয়—তারা উভয়েই। তারা দুজন মূর্তিযুগলের সামনে পাশাপাশি দাঁড়ায়। এই তাদের বিয়ের পরম মুহূর্ত—শুভলগ্ন। ধূপকাঠি জ্বলে জ্বলে ভস্মে নিঃশেষ হয়ে যায়। সন্ধ্যা নেমে আসছে ভেবে ওয়াঙ বাড়িমুখো রওনা হয়। ওলান তার অনুসরণ করে।

বাড়ির দুয়ারে বসে বুড়ো বাপ আরামে সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু উপভোগ করছে। ওয়াঙ বউ নিয়ে আসছে দেখেও সে অনড় অচঞ্চল বসে থাকে। বউয়ের আগমনে ঔৎসুক্য-চাঞ্চল্য প্রকাশ যেন তার আত্মসম্মানে ঘা দেবে। সে বউকে না-দেখার ভান করে আকাশের পানে তাকায়; ছেলেকে ডেকে বলে :

"নতুন চাঁদের বাঁ-দিকে যে মেঘখণ্ড রয়েছে—সে মেঘখণ্ড জলভরা। বৃষ্টি হবে—আগামীকাল, যে-কোনো সময়।" বউয়ের হাত থেকে ওয়াঙ লাঙকে ঝুড়িটা নামাতে দেখে, বুড়ো এবার চিৎকার করে ওঠে, "সব পয়সা উড়িয়ে এসেছিস তো?"

টেবিলের ওপর ঝুড়িটা রেখে ওয়াঙ অনুচ্চকণ্ঠে সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়, "আজ রাতে জনকয়েক লোককে দাওয়াত করেছি।" তারপর কী ভেবে ঝুড়িটা তার শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে ঝুড়ির পানে মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকে। বুড়ো ইতিমধ্যে দোরগোড়ায় এসে চেঁচিয়ে ওঠে :

"এ বাড়িতে পয়সার মায়া-মমতা নেই, পয়সা তো নয়, যেন খোলামকুচি।"

কিন্তু ছেলের এই পয়সা-খরচ আর মেহমান-দাওয়াতে বুড়ো আসলে খুশিই হয়। কিন্তু আনন্দ অপ্রকাশ্য; কারণ তার ধারণা, নতুন বউয়ের সামনে এমনি অভিযোগ আর শাসন না করলে বউ অপব্যয় করে ঘর-সংসার ফুঁকে দেবে। শোবার ঘর থেকে ওয়াঙ ঝুড়িটা আবার রান্নাঘরে নিয়ে যায়। বউও তার পিছনে পিছনে যায়। ওয়াঙ একটি একটি করে সবগুলো উনুনের পাশে রেখে দিয়ে বউকে বলে, "এই রইল গরুর গোশ্‌ত, খাশির গোশ্‌ত আর মাছ। সাতজনের আন্দাজ। রাঁধতে পারবে তো?"

ওলান সহজ কণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"হোয়াঙ-মঞ্জিলে তো আমি এই কাজই করেছি। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় গোশ্‌ত রান্না হয়। এ তো মামুলি রান্না।"

ওয়াঙ মাথা দুলিয়ে বেরিয়ে যায়। মেহমানদের আগমন পর্যন্ত সে আর বাবুর্চিখানায় ঢোকে না। মেহমানদের মধ্যে রয়েছে তার ধূর্ত রসিক হাভাতে চাচা, তার বেহায়া নিষ্কর্মা ছেলেটা আর জনকয়েক সভ্যতাবোধহীন মুখচোরা চাষি প্রতিবেশী। দুজন চাষি তার পরম বন্ধু। তাদের সাথে সে বদলিতে চাষাবাদ করে; একে অন্যকে প্রয়োজনের সময় বীজ দেয় : একে অন্যের জন্য গতরে খাটে। আর একজন আছে তার প্রতিবেশী চিঙ—শান্ত গোবেচারা। অপ্রয়োজনে মুখ দিয়ে তার রা বেরোয় না।

মাঝের ঘরে খাবার জায়গা হয়েছে। মেহমানদের আসন গ্রহণের পর, ওয়াঙ লাঙ বউকে পরিবেশন করতে বলে, তার কথায় বউ জওয়াব দেয় :

"আমি সবকিছু ঘরের বাইরে থেকে তোমার হাতে দিচ্ছি, তুমি পরিবেশন করো। পরপুরুষের সামনে যেতে আমার লজ্জা করে।"

একথা শুনে গর্বানন্দে ওয়াঙের বুক ভরে ওঠে। এ নারী তারই একান্ত। তার সামনেই সে নিঃশঙ্ক, নির্ভয়, অন্যকে সে ভয় পায়; লজ্জা করে। খাবারগুলো বাবুর্চিখানার দুয়ার হতে তার বউয়ের হাত থেকে নিয়ে সে খাবার টেবিল সাজিয়ে মেহমানদের সাদরে আহ্বান জানায় : "এসো চাচা। এসো ভাই তোমরা খেয়ে নাও।"

তার রসিক চাচা বলে, "আমরা তোমার সুন্দরী বউকে দেখব না?"

ওয়াঙ দৃঢ়কণ্ঠে জওয়াব দেয়, "এখনো আমাদের বৈবাহিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ সমাধা হয়নি। অনুষ্ঠান পূর্ণ না হলে, বউ দেখানো বেখাপ্‌পা ঠেকে।"

মেহমানদের দল তৃপ্তিসহকারে আহার সমাধা করে; খাদ্যসামগ্রী আর রান্নার ভূয়সী প্রশংসা করে; ওয়াঙ সবিনয়ে বারবার ক্ষমাভিক্ষা করে : "ও কিছু নয়। নাম-কা-ওয়াস্তে খানা, রান্নাও সুখাদ্য হয়নি।" কিন্তু আয়োজনের প্রাচুর্য আর রান্নার উৎকর্ষে বুক তার অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে ওঠে। তার স্ত্রী গোশ্‌তের সাথে চিনি, সির্কা আর চাটনি মিশিয়ে গোশ্‌তটাকে এমনি সুস্বাদু করেছে যে সে আজপর্যন্ত কোনো বন্ধুর বাড়িতে এমনটি খায়নি।

সে রাত তার বন্ধুরা গল্পগুজবে মশগুল হয়ে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দেয়। ওয়াঙ লাঙের স্ত্রী উনুন আগলে বসে থাকে। শেষ মেহমান বিদায় নিলে ওয়াঙ বাবুর্চিখানায় গিয়ে দেখে তার স্ত্রী বলদের পাশে খড়ের স্তূপের উপর শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। মাথায় খড়কুটো লেগে আছে। ওয়াঙ ঘুম ভাঙাবার জন্য তাকে ডাকতেই ঘুমের ঘোরে সে এমনি করে দু'হাত উঠোয়—যেন কারো আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। ঘুম ভাঙতে সে সদ্য-জাগা-চোখে স্বামীর পানে রহস্যময় নীরব দৃষ্টিতে তাকায়। ওয়াঙের মনে হয়, ওলান একটা অবোধ শিশু। সে তার হাত ধরে শোবার ঘরে নিয়ে যায়, একটা মোমবাতি জ্বেলে টেবিলের উপর রাখে। মোমবাতির স্তিমিত আলোতে একজন অপরিচিত নারীর সামনে নিজেকে নিভৃতে আবিষ্কার করে সে সহসা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। তার মনের মালঞ্চে বারবার গুঞ্জন ওঠে, "এ নারী আমার—একান্ত আমারই ভোগ্যা। এর সাথে লজ্জা-সঙ্কোচ নিষ্প্রয়োজন, নিরর্থক।"

উত্তেজিত ওয়াঙ বেশ পরিবর্তন করে—আর নারী? হামাগুড়ি দিয়ে মশারির ভিতর ঢুকে নীরবে শয্যা রচনা করে। মশারির ভিতর যেতে যেতে ওয়াঙ আদেশের সুরে বলে, "শোয়ার আগে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ো।"

ওয়াঙ শুয়ে পড়ে; লেপটা কাঁধ পর্যন্ত টেনে দিয়ে নিদ্রার ভান করে। কিন্তু চোখ তার অতন্দ্র; দেহে তার ঝড়ের মাতন; প্রতি স্নায়ু আর মাংসপেশিতে ঝড়ের দোলা; তার কামনা-ব্যাকুল অস্তিত্বে—উন্মত্ত প্রতীক্ষা। অনেকক্ষণ পর নিষ্প্রদীপ ঘরে ওলান ধীর-মন্থর গতিতে তার পাশে এসে শয্যা গ্রহণ করে। পুলক-আবেগে ওয়াঙের দেহ কাঁপে, হর্ষোল্লাসে তার দেহগ্রন্থি ছিঁড়ে যায় বুঝি। রাতের বুকে এক ঝলক নীরব হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মত্ত ওয়াঙ নারীদেহটাকে আপন বুকে জড়িয়ে ধরে।

দুই

এই তো জীবন-বিলাস; জীবনের আনন্দ-আহরণ এখানে—রীতিমতন বিলাসী আর আনন্দময় ওয়াঙের বর্তমান জীবন।

পরদিন প্রত্যুষে ওয়াঙ শয্যা ত্যাগ করে না; শুয়ে থেকে ঘুমভাঙা চোখে ওলানের সঞ্চরণশীল দেহের পানে চেয়ে থাকে। এ নারী এখন একান্ত তার; এ

দেহের ওপর তার অধিকার একচ্ছত্র। ওলান শয্যা ত্যাগ করে, ধীর-মন্থর ভঙ্গিতে রাতের শিথিল অবিন্যস্ত পরিধেয়খানা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আঁটসাঁট করে দেহে জড়িয়ে নেয়। কাপড়ের জুতোজোড়ায় পা ঢুকিয়ে কষে বাঁধে। দেয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে প্রভাত-রবির স্নিগ্ধ কিরণরেখা ওলানের মুখের উপর পড়েছে; এই আবছা আলাতে ওয়াঙ তার মুখখানা অস্পষ্ট দেখতে পায়; কিন্তু এ মুখে কোনো পরিবর্তন বা কোনো রঙিন অভিব্যক্তি সে লক্ষ করে না। কী বিচিত্র! এতে ওয়াঙের মনে বিস্ময় জাগে। ওয়াঙ অনুভব করে, গত মধু-নিশি তার নিজের দেহ-মনে বিরাট পরিবর্তন এনেছে—তাকে ওলটপালট করে দিয়ে গেছে। কিন্তু এ নারী! অতি অবলীলাক্রমে শয্যাত্যাগ করেছে; যেন প্রতিটি প্রাতে সে এমনি করে ঘুম থেকে ওঠে, এ যেন তার নিত্য-নৈমিত্তিক গাত্রোত্থান।

ইতিমধ্যে বুড়োর অভিযোগপূর্ণ কাশির শব্দ ধূসর প্রভাতে ভেসে আসে। ওয়াঙ স্ত্রীকে বলে, "আগে বাবাকে একবাটি গরম পানি করে দিয়ে এসো। ফুসফুসের যন্ত্রণাটা থামুক।"

"পানিতে চায়ের পাতা দেব?"—ওলান প্রশ্ন করে। অতি সাধারণ প্রশ্ন; অতি সাধারণ অভিনবত্বহীন কণ্ঠস্বর।

এ সামান্য প্রশ্নে ওয়াঙ বিব্রতবোধ করে। তার বলতে ইচ্ছা হয়, "আলবৎ দেবে; আমাদের কাঙাল পেয়েছ?" হোয়াঙ-মঞ্জিলে অবশ্য গরম পানি চায়ের পাতায় সবুজ হয়ে থাকে, দাস-দাসীরাও সেখানে খালি গরম পানি পান করে না। কিন্তু প্রথমদিনেই গরম পানিতে চায়ের পাতা ঢাললে, তার বাপ চটে লাল হয়ে উঠবে। তাছাড়া বড়মানুষি করার মতো ক্ষমতাও ওদের নেই, তাই সে অবজ্ঞাভরে জওয়াব দেয় :

"চা? না। দিয়ে কাজ নেই, এতে তার কাশি বেড়ে যায়।"

এই বলে সে আরামে-আমেজে শুয়ে থাকে। ওলান উনুন ধরিয়ে পানি গরম করে। ওয়াঙের শয্যাত্যাগ করতে মন চায় না, আরো ঘুমোতে ইচ্ছা করে; অবসরেরও অভাব নেই। কিন্তু তার সকালে-ওঠা অভ্যস্ত অবোধ দেহ এ সুখ-সম্ভোগে সাড়া দেয় না। তাই সে শুয়ে শুয়ে মানসিক আমেজ আর দৈহিক আলস্য-বিলাসের আস্বাদ উপভোগ করে।

নবলব্ধ সঙ্গিনী এই নারীর সাথে তার সম্পর্কের কথা ভাবতে এখনও সে লজ্জা পায়। তাই এ ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষেতখামারের কথাও ভাবে—ভাবে গম চাষের কথা, বৃষ্টির কথা, প্রতিবেশী চীঙের কাছ থেকে গাজরের বীজ এনে বোনার কথা। এই দৈনন্দিন ভাবনার মাঝে মাঝে সে আবার তার অনাস্বাদিতপূর্ব বর্তমান জীবনের নতুন মধুর অনুভূতির জাল বুনে; গত সুখনিশির প্রতিটি রঙিন মুহূর্ত, প্রতিটি স্মৃতি তার ভাবনার সাথে জড়িয়ে যায়। এ এক পরম বিস্ময়! এই নারীকে তার ভালো লাগবে কি না, এ নারী তার শয্যাসঙ্গিনী আর গৃহের গৃহিণী হয়ে সুখী হবে কি না, আগে এই ছিল তার প্রশ্ন। আজ তার মনে হয়, এ প্রশ্ন অর্থহীন। আজ মনে হচ্ছে,

এ নারী হোক না সাধারণ; হোক না তার মুখখানা সাদাসিধে, অসুন্দর; হোক না তার হাত দু'খানা কর্কশ; কিন্তু তার বিরাট মাংসল দেহখানা পেলব কোমল; এই দেহ অস্পৃষ্ট। অন্য কোনো পুরুষের স্পর্শ এ দেহে লাগেনি। একথা ভাবতেই তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। গেল রাতের অন্ধকারে ছড়িয়ে-দেওয়া সেই হাসি। এ নারীর সুন্দর সুডৌল দেহ হোয়াঙ-মঞ্জিলের তরুণদের চোখে পড়েনি; তারা দেখেছে শুধু এক বাঁদির সাদাসিধে সাধারণ মুখ; এর বেশি তারা কিছু দেখেনি। সহসা ওয়াঙের মনে বাসনা জাগে, এ নারী তাকে স্বামীরূপে কামনা করুক; তার কাছে নিবেদিতচিত্তে আত্মসমর্পণ করুক। কিন্তু একথা ভাবতেই আপনমনে সে আবার লজ্জিত হয়ে ওঠে।

ভেজানো দরজাটা খুলে যায়। ধীর শান্ত পদক্ষেপে ওলান একবাটি গরম পানি তার কাছে নিয়ে আসে। সে বিছানায় বসে। পানির উপর চায়ের পাতা ভাসছে। সে একবার ওলানের পানে তাকায়, সমস্ত অপ্রতিভ ওলান ভীরুকণ্ঠে বলে, "তোমার কথামতো বাবার পানিতে চায়ের পাতা দিইনি; তবে তোমার জন্য আমি..."

ওয়াঙ বুঝতে পেরেছে যে, স্ত্রী তাকে ভয় করে, এই উপলব্ধিতে সে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তাই ওলানের কথার মাঝখানেই সে বলে ওঠে, "বেশ করেছ, চা আমার ভালো লাগে—খুব ভালো লাগে।"—এই বলে সে বাটিতে সশব্দে চুমুক দেয়।

ওয়াঙের মনে এক নতুন উল্লাস জাগে—এই নারী তাকে ভালোবাসে। এই তার উল্লাস! কিন্তু এ আনন্দবার্তা নিজের কাছে ঘোষণা করতেও তার লজ্জা।

ওয়াঙের মনে হয়, এ কয়টা মাস সে যেন কিছু করেনি; কেবল তার বউয়ের পানে তাকিয়েই আলস্যে কাটিয়ে দিয়েছে। আসলে কিন্তু তা নয়। তার স্ত্রীর অবস্থিতি তার দৈনন্দিন কাজে কোনো বাধা-বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। সে আপন কাজ করে গেছে। নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করেছে; বলদের কাঁধে জোয়াল চাপিয়েছে, পশ্চিম মাঠের ক্ষেতে রসুন-পেঁয়াজ বুনেছে, কিন্তু এসব তার কাজই মনে হয়নি; কাজে সে শ্রান্তি-ক্লান্তি অনুভব করেনি, তার মনে হয়েছে, এসব কাজ নয়, বিলাস মাত্র। কারণ মাথার উপর সূর্য উঠতেই সে বাড়ি গিয়ে তৈরি-খাবার পেয়েছে; তার স্ত্রী টেবিলে তার খাবার সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু আগে তো এমনি হত না। কাজ থেকে ফিরে গিয়ে তাকে নিজের খাবার নিজেকে তৈরি করত হত।

এখন তার জীবনধারা বদলে গেছে। বাড়িতে খাবার প্রস্তুত থাকে; টেবিলের পাশে বেঞ্চিতে বসে দিব্যি আরামে সে খেতে পায়। ঘরের মেঝেটা এখন চকচকে ঝকঝকে থাকে; কাঠ-কয়লার ভাবনা আর তাকে ভাবতে হয় না। সে ক্ষেতের কাজে চলে গেলে তার বউ হাতে একটা ঘাস-সংগ্রহের যন্ত্র আর একটুকরো রশি নিয়ে বাইরে ঘুরে ঘুরে জ্বালানি খড়কুটো সংগ্রহ করে রশিতে আঁটি বেঁধে দুপুরে ফিরে আসে। কাঠ-খড়ের জন্য আর পয়সা খরচ করতে হয় না ভেবে, খুশি হয়।

অপরাহ্নে তার বউ আবার বেরিয়ে পড়ে হাতে নিড়ানি আর ঝুড়ি নিয়ে, শহরে যাওয়ার পথ দিয়ে ভারবাহী গাধা আর খচ্চরের দল আনাগোনা করে। সে নিড়ানির সাহায্যে রাস্তায় পড়ে-থাকা গোবর কুড়িয়ে এনে সারগাদায় ফেলে রাখে। এ গোবর সময়ে ক্ষেতের সাররূপে ব্যবহৃত হবে। এসব কাজের জন্য তাকে তাগাদা দিতে হয় না। সে আপনা থেকেই এগুলো করে যায়। দিনের শেষে বলদটাকে ঘাস-পানি না-খাইয়ে সে বিশ্রাম করে না।

সংসারে তার বিস্তর কাজ। বউ তার ছেঁড়া-ফাড়া কাপড়গুলো নিয়ে বসে হাতে-কাটা সুতো দিয়ে সেগুলো সেলাই করে। বিছানাপত্র দোরগোড়ায় রোদে দেয়; লেপের ওয়াড়গুলো ধুয়ে বাঁশে শুকোবার জন্য ঝুলিয়ে দেয়। লেপের জমাট-বাঁধা তুলো বের করে, ছারপোকা মারে, জমাট তুলো টেনে-টুনে ঠিক করে লেপটা আবার রোদে ছড়িয়ে দেয়। সে সারাদিন অবিশ্রান্ত কাজ করে যায়। তার সেবা-যত্নে বুড়োর কাশি সেরে যায়। বুড়ো এখন বাড়ির দক্ষিণ প্রাচীরে হেলান দিয়ে মহাতৃপ্তিতে রোদে বসে ঝিমায়।

কিন্তু মেয়েটা স্বল্পভাষিণী। প্রয়োজনের বেশি কথা তার মুখে নেই। ওয়াঙ গোপনে তার ধীর-মন্থর স্ত্রীকে পর্যবেক্ষণ করে। তার চোখে পড়ে এ নারীর উদাস চতুষ্কোণ মুখ, তার ভাবব্যঞ্জনাবিহীন চাহনি। নিশীথের অন্ধকারে সে তার স্ত্রীর দেহের দৃঢ় নিটোল পেলবতা উপলব্ধি করে, কিন্তু দিবালোকে তার এই অপরিচিত দেহের প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি রেখা বসনাবৃত হয়ে থাকে। নিশীথের শয্যাসঙ্গিনী দিবসে রূপান্তর গ্রহণ করে, হয়ে ওঠে নির্বাক, নির্ভরশীল সেবিকা—দিনের আলো রাতের পরিচয়ের ওপর গভীর আবরণ টেনে নেয়। এই রূপান্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করার যুক্তি ওয়াঙ পায় না।

ক্ষেতখামারে কর্মরত ওয়াঙ মাঝে মাঝে তার রহস্যময়ী স্ত্রী সম্বন্ধে গভীর ভাবনায় বিভোর হয়ে যায়। তার স্ত্রী ওই শতমহলা বাড়িতে কী দেখেছে, কী ধরনের জীবনযাপন করেছে—সে কি কোনো ইতিহাস সেখানে রচনা করে এসেছে সেই বিরাট মহলের কোনো অজানা কোঠায়? কোনো অসতর্ক ক্ষণে? কোনো অসম্বৃত চাঞ্চল্যময় মুহূর্তে? এত ভেবেও সে এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কূল-কিনারা পায় না। অবশেষে এ কৌতূহল-ঔৎসুক্যের কথা ভেবে সে আপনমনেই লজ্জিত হয়ে ওঠে। কী হবে এ রহস্য উদ্‌ঘাটনে? কেন এ অকারণ ঔৎসুক্য? রমণী বৈ আর তো কিছুই নয় সে।

যে সুস্থ-সবল নারী এক জমিদারবাড়িতে বাঁদি হয়ে সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসেছে, তার পক্ষে এই ক্ষুদ্র সংসারের সামান্য কাজ যথেষ্ট নয়। সে কাজ চায়! আরও কাজ! একদিন ওয়াঙ গমক্ষেতে নিড়ানি দিতে দিতে শ্রান্তিতে হাঁপিয়ে উঠেছে, এমন সময় চষা-মাটির উপর তার স্ত্রীর ছায়া পড়ল, তার হাতে নিড়ানি।

"সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে কোনো কাজ নেই"—এই সংক্ষিপ্ত অজুহাত দিয়ে সে স্বামীর পাশে ক্ষেত-নিড়ানিতে লেগে যায়।

গ্রীষ্মের সবেমাত্র শুরু। প্রখর সূর্যতাপ পড়ছে তাদের দেহে। পিঠ তাদের পুড়ে যাচ্ছে। ওলানের দেহে ঘামের স্রোত বইছে। ওয়াঙ খালিগায়ে কাজ করছে। ওলানের স্বেদ-সিক্ত নীল জামাটা গায়ের চামড়ার মতন লেপটে গেছে। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে একই তালে নির্বাক কাজ করে যাচ্ছে—দুজনের নীরব একাত্মবোধ, গতি-সঙ্গতি ওয়াঙের ক্লান্তির খেদ মুছে নেয়; কর্মশ্রান্তি মাধুর্যে ভরে ওঠে। ওয়াঙের অনুভূতি অব্যক্ত, অঘোষিত। এ অনুভূতি প্রকাশের ভাষা নেই। তাদের গতির পূর্ণসঙ্গতি আর সহানুভূতিতে তাদের একাত্মীয়তার প্রকাশ। যে মাটির ঢেলা উল্টিয়ে তারা সূর্যোমুখো করে দিচ্ছে, সে মাটির তারা দুজন যৌথ স্বত্বাধিকারী। এই মাটি দিয়ে তাদের বাড়িঘর আর তাদের দেবতার দেহ নির্মিত; এই মাটি তাদের জীবন-জীবিকা। এই মাটির রসে তাদের দেহ সঞ্জীবিত। তাদের নিড়ানির ঘায়ে ঐশ্বর্যময় কালো মাটির ঢেলা আলগোছে দূরে ছিটকে পড়ে; মাঝে মাঝে তারা নিড়ানি দিয়ে ইট বা কাঠের টুকরো খুঁড়ে বের করে দূরে ছুড়ে দেয়। এই ইটকাঠের টুকরোগুলো কিছুই নয়। এদের কোনো দাম নেই। কোনো অতীতে হয়তো এখানে কোনো নরদেহ সমাধিস্থ হয়েছিল। হয়তো এখানে ছিল কারো সুখের সংসার বাড়িঘর। কালের প্রবাহে সে ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ মাটির তলায় বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমান বাড়িঘরও হয়তো একদিন এমনিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের দেহাবশেষও এমনি করে এই মাটির সাথে মিশে যাবে। এই মাটির সাথে প্রত্যেকেরই একদিন বোঝাপড়া হবে।

তারা দুজন নীরবে কাজ করে যায়। একই সঙ্গে একই তালে—অব্যক্ত একাত্মীয়তাবোধের উপলব্ধি বুকে নিয়ে। মাটির বুকে তারা ফসল ফলাবে। তাদের পরিশ্রমে এ মাটি হবে সুফলা শস্য-শ্যামলা।

সূর্যাস্তের পর ওয়াঙ শিরদাঁড়া সোজা করে তার পাশে কর্মরতা ওলানের পানে তাকায়। মুখখানা তার স্বেদ-মৃত্তিকায় বিচিত্র হয়ে উঠেছে। মাটিমাখা দেহখানা মাটির রঙের মতনই ধূসর। স্বেদ-সিক্ত দেহবাস তার দেহলগ্ন। বাকি কাজটুকু শেষ করে সে তার স্বাভাবিক নির্বিকার কণ্ঠে স্বামীকে বলে :

"আমার সন্তান হবে।"

ওয়াঙ বিস্ময়ে হতবাক। কী বলবে সে। ওলান নিচু হয়ে মাটি থেকে একটা ইটের টুকরো উঠিয়ে দূরে ছুড়ে দেয়। তার এ ঘোষণায় কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। এ যেন অতি মামুলি একটা খবর। "তোমার জন্য চা নিয়ে এলাম" বা "এবার খাওয়াটা সেরে ফেলা উচিত"—এ যেন এমনি ধরনের অতি সাধারণ তুচ্ছ কথা মাত্র। কিন্তু ওয়াঙ লাঙের পক্ষে—সে বলতে পারে না—এ খবর কত তাৎপর্যময়। হঠাৎ যেন ওয়াঙের হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। যাক, এবার তাহলে ধরার মাটিতে ফসল ফলাবার পালা তাদের শুরু হল।

সে স্ত্রীর হাত থেকে সহসা নিড়ানিটা নিয়ে আবেগময় কণ্ঠে বলে, "সন্ধে হয়ে গেছে; এবার এসো বাড়ি যাই। বাবাকে এ সংবাদটা দিতে হবে।"

তারা বাড়ির ভিতরে চলে। স্ত্রী স্বামীর অনুসরণ করে। এ-ই স্ত্রীসুলভ আচরণ। ক্ষুধিত বৃদ্ধ দুয়ারে প্রতীক্ষমাণ। ছেলের বউ এসেছে অবধি সে আর বাবুর্চিখানা মাড়ায় না। তাদের দেখে বুড়ো অস্থির হয়ে চিৎকার করে ওঠে, "এই বুড়ো বয়সে অতি-খিদে সহ্য করতে পারি না।"

ওয়াঙ বাপকে ঘরের ভিতর নিয়ে বলে, "তোমার নাতি হবে বাবা।"

সে সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে এ-কথাটা বলতে চায়; যেমন করে সে বলে "আজ পশ্চিম মাঠের ক্ষেতে বীজ বুনে এলাম" কিন্তু পারে না, সে অনুচ্চকণ্ঠে এ খবরটা বাবাকে দেয়; কিন্তু তার মনে হয়, এ খবরটা যেন সে তারস্বরে সবাইকে শুনিয়ে বলে ফেলেছে।

বুড়ো চোখ মিটমিট করে এ সংবাদটার গুরুত্ব উপলব্ধি করে; খকখক করে হেসে ওঠে। ছেলের বউ কাছে আসতেই গলাফাটা হাসি হেসে বলে, "তাহলে ফসল-তোলার মওসুম আসছে!"

গোধুলির ম্লান আলোতে বউয়ের মুখের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না, বউয়ের সহজ কণ্ঠ শোনা যায়। বউ বলে, "আমি এখন খাবার তৈরি করতে যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করো মা।" বলে বুড়ো বউকে রান্নাঘরে অনুসরণ করে। অনাগত নাতির আগমনবার্তার আনন্দে এতক্ষণ সে খাবার-এর কথা ভুলে গিয়েছিল। এবার আহারের কথা মনে হতেই নাতির আগমনের আনন্দ ভুলে যায়।

নির্জন অন্ধকার ঘরে বেঞ্চে উপবিষ্ট ওয়াঙ লাঙ হাতের উপর মাথা ন্যস্ত করে ভাবে : তারই দেহ মন্থন করে, তারই ঔরসে হবে নতুন জীবনের অভ্যুদয়।

তিন

আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে ওয়াঙ বলে, "সংকট-মুহূর্তে—প্রসবের সময়—তোমার সাহায্যের জন্য কোনো একজন স্ত্রীলোক আনলে ভালো হয়।"

তার স্ত্রী মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। রাতের আহারের পর বুড়ো ঘুমিয়ে পড়েছে। ওলান থালা-বাসন পরিষ্কার করছে। ওয়াঙ তারই পাশে বসে আছে। প্রদীপের কম্পমান শিখার আলোর সামনে তারা দুজনই মাত্র জেগে আছে। বিনের তেল-ভরা প্রদীপে জ্বলছে পাকানো তুলোর সলতে।

"কোনো মেয়েমানুষের সাহায্য লাগবে না, এ কেমন কথা?" ওয়াঙ ভীতবিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে। ওলানের প্রকৃতি তার জানা। বাক্যালাপের বদলে সে হাত বা মাথা নাড়ে, নিদেনপক্ষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুএকটা কথা অতি সংক্ষেপে বলে। ওয়াঙ কোনো বিস্তারিত আলোচনা বা উত্তরের আশা না করেই আপন বক্তব্য বলে যায়। "আর বাড়িতে যে দুটো পুরুষমানুষ ছাড়া আর কেউ নেই। ভয়ঙ্কর একটা কিছু

হয়ে দাঁড়াতে পারে না কি? বিপদ-আপদ! মাকে দেখেছি, এ সময় গাঁয়ের কোনো মেয়েমানুষ ডেকে আনত। আমি নিজে তো এ-ব্যাপারে একদম অজ্ঞ। হোয়াঙ-মঞ্জিলে এমন কোনো বুড়ি বাঁদি নেই, যে এ-সময় আসতে পারে?"

"না, সেখানে এমন কেউ নেই।" ওলান দৃঢ় রুক্ষকণ্ঠে জানিয়ে দেয়। সারা মুখে তার কাঠিন্যের ছাপ।

কথা শুনে ওয়াঙ হাতের পাইপটা রেখে দিয়ে বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চেয়ে থাকে। একমুহূর্তে তার স্ত্রীর মুখাবয়বে স্বাভাবিকত্ব ফিরে আসে। সে এমনি সহজে খাবারকাঠিগুলো টেবিলের উপর থেকে কুড়োতে থাকে যেন কিছুই হয়নি। ওয়াঙ আবার যুক্তি দেখিয়ে বলে, "ব্যাপারের গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। এ বাড়িতে আমরা দুজন পুরুষমানুষ মাত্র। সন্তান প্রসবের ব্যাপারে তোমাকে কোনো সাহায্য করতে পারব না। বাপ বুড়ো মানুষ, তোমার আঁতুড়ঘরে তার প্রবেশ হবে নিন্দনীয়। আর আমি তো আজপর্যন্ত একটা গাভীর প্রসবও দেখিনি, এমনি অকেজো আনাড়ি আমি। আমার এই অদক্ষ হাতে বাচ্চা ধরতে গেলে, বাচ্চা হয়তো হাতের চাপে চেপ্টেই যাবে। সর্বনাশ হবে। তাই আমি বলছিলাম, জমিদারবাড়ির বাঁদিরা তো হরদম প্রসব করছে; সেখান থেকে কাউকে আনতে পারলে ল্যাঠা চুকে যেত।"

বউ খাবারকাঠিগুলো টেবিলে সাজাতে সাজাতে একমুহূর্ত স্বামীর পানে অগ্নিদৃষ্টি হেনে বলে, "সে বাড়িতে যদি কোনোদিন আমাকে যেতেই হয়, আমি যাব সন্তান কোলে নিয়ে। লাল কোট আর ফুল-আঁকা পায়জামা পরবে আমার খোকন। তার মাথায় পরিয়ে দেব বুদ্ধমূর্তি-আঁকা সোনালি টুপি আর পায়ে পরিয়ে দেব বাঘমুখো জুতো। আমার পরিধানে থাকবে সাটিনের কালো জামা আর পায়ে থাকবে নতুন জুতো। সে-বাড়িতে গিয়ে আমি ঘুরে বেড়াব। যে বাবুর্চিখানায় আমি আজীবন কাটিয়েছি সেখানে যাব, যে হলঘরে বড়বেগম চণ্ডুর নলে দম কষে বুঁদ হয়ে থাকে, সে হলঘরে যাব। সবাইকে দেখাব আমার ঐশ্বর্য আর আমার সোনার খোকনকে। সবাই দেখবে আমাকে।"

ওলানের মুখে একসাথে এতগুলো কথা ওয়াঙ কোনোদিন শোনেনি। ধীরেসুস্থে অনর্গল সে একথাগুলো বলে যায়। সে ভাবে এই নারী মৌনতার আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখে এই রঙিন পরিকল্পনা করেছে; তারই পাশে কর্মব্যস্ত এই মৌনী নারী তার অলক্ষে আপনমনে কল্পনার রঙিন জাল বুনেছে। কী অদ্ভুত রহস্যময়ী এ নারী। তার ধারণা ছিল, এই সাধারণ স্ত্রীলোকটি তার অনাগত শিশু সম্বন্ধে কিছুই ভাবেনি; কিন্তু এখন সে উপলব্ধি করছে, এই সন্তানবৎসলা নারী তার অনাগত সন্তানের পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি তার নিজের জন্য একটা সাটিনের জামার কথা পর্যন্ত ভেবে রেখেছে। এই রহস্যময়ী নারীর কথা ভাবতে ভাবতে সে নীরবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর সাহায্যে তামাকের বটিকা তৈরি করে পাইপের মুখে স্থাপন করে।

"তা হলে, তোমার তো কিছু টাকাকড়ি দরকার?" ওয়াঙ আপাত-গম্ভীর কণ্ঠে শুধায়।

"যদি তিনটে রৌপ্যমুদ্রা দাও।" ভীরুকণ্ঠে ওলান জওয়াব দেয়। "অবশ্য অনেক পয়সার প্রশ্ন। আমি খুব হিসেব করে দেখেছি, এর কমে চলবে না। তবে আমি এক কপর্দকও বাজে খরচ করব না। কাপড়ওয়ালা থেকে আমি কড়ায় গণ্ডায় কাপড় বুঝে নেব।"

ওয়াঙ কোমরে হাত দেয়। আগের দিন তাদের পুকুরের নলখাগড়া বিক্রি করেছে, দেড় মণ। দাম যা পেয়েছে তাতে তার স্ত্রীর চাহিদা মিটিয়েও কিছু বাঁচবে। সে টাকাটা তার কোমরের বাঁধা থলিতেই এখনো রয়েছে। সে থলি থেকে তিনটে রৌপ্যমুদ্রা বের করে টেবিলের উপর রেখে কী যেন ভাবে। তারপর আর একটা মুদ্রাও তাতে যোগ দেয়। এ মুদ্রাটা অনেক দিন বাঁচিয়ে রেখেছে, ইচ্ছে করলে এ দিয়ে জুয়া খেলবে বলে। হেরে যাবে ভয়ে সে জুয়া বড় একটা খেলে না। সে শহরে গিয়ে কথকদের মুখে পুরনো দিনের গল্প-কাহিনী শুনেই অবসর বিনোদন করে। গল্প শুনতে এক পেনির বেশি লাগে না।

"এ মুদ্রাটাও তুমি নাও," পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে সে স্ত্রীকে বলে। "ভালো মনে করলে বাচ্চার জন্য একটা রেশমি কাপড়ের কোট তৈরি কোরো। এই তো আমাদের প্রথম সন্তান।"

ওলান নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে মুদ্রাগুলোর পানে; তখ্খুনি হাত দিতে পারে না। কয়েক মুহূর্ত পর অতি চাপা কণ্ঠে বলে, "রুপার মুদ্রা কয়টা জীবনে এই প্রথম আমি হাতে নিলাম।" এই বলে ছোঁ মেরে মুদ্রা হাতের মুঠোতে নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে শোবার ঘরে চলে যায়।

ওয়াঙ লাঙ পাইপ টানে আর মুদ্রাগুলোর কথা ভাবে। সুফলা মাটির কল্যাণে সে আজ এই মুদ্রার মালিক, মাটির বুকে হাল চালিয়ে সে নিজেকে ক্ষয় করেছে তিলে তিলে; দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরিয়ে সে মাটির বুকে ফসল ফলিয়েছে। এই মাটিই তার সঞ্জীবনী শক্তি; এই মাটির ফসল বিক্রি করেই সে এই অর্থের অধিকারী। কাউকে দুটো পয়সা দিতে গেলে আগে তার মায়া হত, বুক টনটন করত; কিন্তু তার স্ত্রীর হাতে এ মুদ্রাগুলো নির্বিকারচিত্তে দিয়ে দিল; তার একটুও দুঃখ হল না। তার মনে হল, এ অর্থ এমনি এক বিত্তে রূপান্তরিত হবে, যে বিত্ত এই অর্থের চেয়ে মূল্যবান তার আপন সন্তানের পরিচ্ছদ। এই পরিচ্ছদে তারই আত্মভূষিত হবে। সে ভাবে, এ রহস্যময়ী নারী এতদিন তার সহচরীরূপে নীরবে তারই পাশে কাজ করেছে আর কল্পলোকে নববসনে সজ্জিত আপন সন্তানের নবমূর্তি রচনা করেছে।

চরম মুহূর্তে ওলান একলা পড়ে থাকে। একদিন সূর্যাস্তের পরে সে প্রসবব্যথা অনুভব করে; সে তখন স্বামীর সাথে মাঠে কাজ করছে। গমের মওসুম শেষে, পানি দিয়ে ক্ষেত ভাসিয়ে, ধানের চারা লাগানো হয়েছিল। গ্রীষ্মের বর্ষণ আর হেমন্তের ফসল পাকানো রোদের ছোঁয়া পেয়ে ধানের শিষ সোনালি হয়ে উঠেছে। স্বামী-স্ত্রী মিলে সারাদিন কাস্তে হাতে ধান কেটেছে, আঁটি বেঁধেছে। ওলান দেহের

গুরুভার নিয়েও মুখ বুজে কাজ করেছে; কিন্তু সঞ্চরণের স্বাচ্ছন্দ্য তার নেই; গতি তার ধীর মন্থর, তাই ওয়াঙের সাথে তাল মিলিয়ে সে কাজ করতে পারছে না, বারবার পিছনে পড়ে যাচ্ছে। মধ্যাহ্নের পর তার সঞ্চরণ মন্থরতর হয়ে ওঠে। স্বামী তার গতির মন্থরতায় অধৈর্য হয়ে তার পানে কঠোর দৃষ্টি হানে। ওলান কাজ ছেড়ে শিরদাঁড়া সোজা করতেই তার হাত থেকে কাস্তেটা পড়ে যায়; তার মুখে দেখা দেয় বেদনার স্বেদবিন্দু; প্রসববেদনার স্বেদ-নিস্রাব।

"আমার সময় হয়ে এল; বাড়ি যাই।" সে স্বামীকে বলে। "আমি না ডাকলে তুমি ঘরের ভিতর ঢুকো না; তবে নবজাত সন্তানের নাড়ি কাটার জন্য একটা বাঁশের কঞ্চি চেঁছে ফালি করে নিয়ে যেয়ো।"

ওলান মাঠের উপর দিয়ে বাড়ির দিকে যায়; সহজ স্বাভাবিক দেহগতি—যেন কিছুই হয়নি। ওয়াঙ ক্রমঅপসৃয়মাণ ওলানের পানে চেয়ে থাকে অনেকক্ষণ। ওলান দৃষ্টির আড়ালে পড়তেই সে পুকুরের পাড়ে গিয়ে একটা পাতলা কঞ্চি কাস্তে দিয়ে চেঁছে, হেমন্তের ঘন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়িমুখো যাত্রা করে।

টেবিলের উপর সদ্য-প্রস্তুত ধূমায়িত খাবার সাজানো রয়েছে। মহাসৃষ্টির বেদনাকাতর দেহে ওলান খাবার তৈরি করেছে। তার মনে হয়, অসাধারণ এই নারী—তার স্ত্রী। ঘরের সামনে গিয়ে সে ধীরে ধীরে তার স্ত্রীকে ডেকে বলে, "এই যে, কঞ্চি চেঁছে এনেছি।"

তার স্ত্রী তাকে ভিতরে ডাকবে, এই আশায় সে ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করে। কিন্তু ওলান তাকে না-ডেকে দরজার পাশে হামাগুড়ি দিয়ে এসে দরজার ফাঁকে হাত বাড়িয়ে বাঁশের কঞ্চিটা নিয়ে নেয়। তার মুখে কথা নেই, ওয়াঙ শোনে, হাঁপিয়ে-ওঠা ক্লান্ত জানোয়ারের মতো দ্রুত গভীর নিশ্বাস ফেলছে ওলান।

বুড়ো খাবার থালা থেকে মাথা তুলে বলে, "খেয়ে নে, সব ঠাণ্ডা হিম হয়ে যাবে যে!" একমুহূর্ত চুপ থেকে খেতে খেতেই বলে যায়, "এখনই এ নিয়ে ঘাবড়িয়ে লাভ নেই। সময় তো নেবেই। আমার মনে পড়ছে, তোর মায়ের প্রথম সন্তান প্রসবের সময়, সারারাত প্রসবযন্ত্রণার পর ভোরবেলায় সন্তান হল। আমি হতভাগ্য। একটার পর একটা প্রায় কুড়িটা সন্তানের বাপ হলাম কিন্তু টিকে আছিস তুই একলা। তাই ফি-বছর মেয়েদের সন্তান-প্রসব প্রয়োজন।" আবার কী একটা ভাবনা মনে জাগতেই হঠাৎ বলে ওঠে, "ও, আগামীকাল আমি দাদু হয়ে যাব!" বলেই আহার বন্ধ করে আবছা অন্ধকার ঘরে অনেকক্ষণ ধরে অট্টহাসি হাসতে থাকে।

কিন্তু ব্যাকুল ওয়াঙ আবার দরজার বাইরে এসে কান পেতে দাঁড়ায়। ক্লান্ত পশুর মতো হাঁপাচ্ছে ওলান, দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসে টাটকা রক্তের বিশ্রী দুর্গন্ধ। ঘরের অভ্যন্তরে ওলানের নিশ্বাসধ্বনি আরো করুণ, আরো দ্রুততর স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সে শঙ্কিতচিত্তে ভাবে, প্রবল শক্তিতে আর্তনাদ চেপে বেদনার্ত ওলান চাপা সুরে কাতরাচ্ছে।

ওলানের দুর্বিষহ প্রসবযন্ত্রণার গোঙানি ওয়াঙের কাছেও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সে দুয়ার ভেঙে ঘরে ঢুকবে, এমনি মুহূর্তে একটা ক্ষণস্থায়ী তীব্র আর্তনাদ ভেসে আসে। নাড়ি-ছেঁড়া আর্তনাদ। এ আর্তনাদে ওয়াঙ যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

সে ওলানের কথা ভুলে গিয়ে অধীর আগ্রহে চেঁচিয়ে অনুরোধ করে, "কী হল? ছেলে?" সে বারবার ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে চলে, "ছেলে কি মেয়ে, শুধু এই কথাটুকু বলে দাও।"

ঘরের ভিতর থেকে অস্পষ্ট কণ্ঠ ভেসে আসে, "ছেলে।" ধ্বনি নয় যেন প্রতিধ্বনি—এমনি নির্জীব, এমনি অস্পষ্ট।

এবার ওয়াঙ সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে টেবিলে গিয়ে খেতে বসে। যাক, সহজেই ঝামেলা চুকে গেল। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বুড়ো বেঞ্চের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। ওয়াঙ বাবার কাঁধে-ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙায়।

"ছেলে হয়েছে।" তার কণ্ঠে বিজয়ীর দীপ্ত সুর, "আজ থেকে তুমি দাদু হলে আর আমি বাবা।"

বুড়ো হেসে ওঠে। অবিরাম হাসি। ঘুমোবার আগে যেমন হেসেছিল।

"হ্যাঁ, তাইতো—তাইতো! আমি দাদু হয়েছি—দাদু।" এই বলে সে হাসতে হাসতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ঠাণ্ডা ভাতের থালাটা তুলে নিয়ে ওয়াঙ খেতে শুরু করে। হঠাৎ প্রচণ্ড খিদে অনুভব করে সে। কিন্তু তাড়াতাড়ি সে যেন কিছুতেই খেতে পারছে না। তার মন ঘুরে বেড়াচ্ছে পাশের ঘরে; তার স্ত্রী আর সদ্যোজাত পুত্রসন্তানকে ঘিরে। ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে তার স্ত্রীর ক্লান্ত সঞ্চরণ আর শিশুর অবিরাম কান্নার ধ্বনি।

"না, এ বাড়িতে আর সুখ-শান্তিতে বসবাস করা চলবে না।" আপনমনে বলতে বলতে গর্বে ওয়াঙের বুক ফুলে ওঠে।

আহার শেষ করে ওয়াঙ আবার পাশের ঘরের দুয়ারে গিয়ে উঁকি দেয়। ওলান তাকে ভিতরে ডাকে। ঘরময় রক্তের গন্ধ ভাসছে, কিন্তু কাঠের গামলায় ছাড়া ঘরের কোথাও রক্তচিহ্ন নেই। গামলাটায় পানি ঢেলে ওলান বিছানার নিচে এমনি ঠেলে রেখে দিয়েছে যে, এটা কারো চোখে বড় একটা পড়তে পারে না। লাল মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রসূতি গা ঢেকে বিছানায় শুয়ে আছে। রীতি অনুসারে ওয়াঙের ছেঁড়া পায়জামা গায়ে জড়িয়ে সদ্যোজাত শিশু মায়ের পাশে শায়িত।

নির্বাক নিস্পন্দ ওয়াঙ এগিয়ে যায়। তার হৃৎপিণ্ড যেন উপরে ঠেলে উঠতে চাইছে। সে সামনে ঝুঁকে ছেলের পানে তাকায়। গোলগাল মুখ, গায়ের রঙ শ্যাম। একমাথা দীর্ঘ সিক্ত কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ। ছেলে কান্না থামিয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছে।

ওয়াঙ এবার স্ত্রীর পানে তাকায়। তাদের দৃষ্টি বিনিময় হয়। বেদনার স্বেদে ওলানের মাথার কেশ সিক্ত; নয়নযুগল কোটরাগত; দেহ স্ফীতিক্ষয়িত। আর

কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু ওয়াঙের চোখে ওলানকে বড় করুণ মধুর মনে হয়। ওলানের মাতৃমূর্তির মধুরিমায় মন তার উদ্বেল হয়ে ওঠে। মা ও সন্তানের পানে তার হৃৎপিণ্ড ছুটে যেতে চায়। স্ত্রীকে কী বলবে, তা সে খুঁজে পায় না। অবশেষে শুধু বলে,

"কাল শহর থেকে আধাসেরখানেক লাল চিনি এনে গরম পানির সাথে মিশিয়ে তোমাকে খেতে দেব।"

ছেলের পানে তাকিয়ে সে কী একটা ভেবে সহসা বলে ওঠে, "এক ঝুড়ি ডিম কিনে এনে লালরঙে রাঙিয়ে গাঁয়ের লোকদের বিলিয়ে দিতে হবে। সবাই জানবে, আমার ছেলে হয়েছে।"

চার

পরদিন সকালে ওলান রোজকার মতন ওঠে, সংসারের কাজ করে; শুধু স্বামীর সাথে ক্ষেতখামারে কাজ করতে যায় না। ওয়াঙ একলাই অপরাহ্ণ পর্যন্ত ক্ষেতের কাজ ক'রে নীল রঙের চাপকানটা প'রে শহরে যায়। বাজারে গিয়ে প্রতিটা ডিম এক পেনি দরে পঞ্চাশটা ডিম কেনে আর ডিম রাঙাবার জন্য লাল কাগজ। কাগজ আর ডিম একসাথে সেদ্ধ করলেই ডিমগুলো রাঙা হবে।

ডিম আর কাগজ কেনার পর সে মিষ্টির দোকানে গিয়ে আধসেরটাক লাল চিনি কেনে। চিনিটা বাদামি রঙের কাগজে মুড়ে দিতে দিতে দোকানি হাসিমুখে বলে,

"এ নিশ্চয়ই ছেলের মায়ের জন্য—"

"হ্যাঁ ভাই, প্রথম ছেলে।" ওয়াঙ গোপন গর্বে বুক ফুলিয়ে জওয়াব দেয়।

"আচ্ছা! ভাগ্যবান পুরুষ তুমি!" নির্লিপ্ত কণ্ঠে দোকানি কথা বলতে বলতে অন্য এক গ্রাহকের প্রতি মনোযোগ দেয়। এমন কথা দোকানি রোজই কাউকে-না-কাউকে বলে, কিন্তু ওয়াঙ ভাবে, এই বিশেষ কথাগুলো দোকানি বিশেষ করে তাকেই বলেছে। দোকানির সৌজন্যে প্রীত হয়ে সে বারবার দোকানিকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নেয়।

প্রখর রোদে ধূলিধূসর পথ দিয়ে চলতে চলতে তার মনে হয়, তার সমান ভাগ্যবান পুরুষ আর নেই।

কিন্তু পরমুহূর্তে শঙ্কায় তার বুক কেঁপে ওঠে। এত সুখ কি তার সইবে? নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ যে তার মতন দীন-দরিদ্রের ভাগ্যে সয় না। আকাশে-বাতাসে দুষ্টমতি হিংসাতুর প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি তার সুখে তারা কাঁটা দিতে আসে! একথা ভেবেই সে মোমবাতিওয়ালার দোকানে গিয়ে বাড়ির প্রতিটি প্রাণীর নামে একটি করে, মোট চারটে ধূপকাঠি কেনে। কাঠিগুলো নিয়ে সে দেবতার মন্দিরে যায়। এই মন্দিরের বেদিতেই কয়দিন আগে সে আর ওলান ধূপকাঠি জ্বালিয়েছিল। সে কাঠিগুলোর ভস্ম পড়ে আছে। সেই ভস্মস্তূপের মধ্যে কাঠিগুলো

পুঁতে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে সে এবার বাড়িমুখো রওনা হয়। কী অসীম শক্তির অধিকারী এই বিপদভঞ্জনকারী দেবদেবীর যুগলমূর্তি!

কিছুকাল পর সবার অলক্ষে একদিন ওলান তার স্বামীর পাশে এসে খামারের কাজে লেগে যায়; ক্ষেতে নিড়ানি দেয়, ফসল কাটে, বাড়ির আঙিনায় শস্য মাড়াই করে; দুজনে মিলে মাড়ানো শস্য কুলোতে ভরে বাতাসের ওপর থেকে ধীরে ধীরে মাটিতে ফেলে। পরিষ্কার শস্যকণাগুলো মাটিতে পড়ে আর তুষখণ্ডগুলো বাতাসে উড়ে উড়ে যায়। নির্ভেজাল শস্য তারা ঘরে তোলে।

আবার আসে শীতঋতু—গম রোপণের মওসুম। ওয়াঙ হাল চালায় আর ওলান কোদাল হাতে পিছনে পিছনে মাটির ঢেলা ভাঙে।

মা সারাদিন কাজ করে; মাটিতে বসে বুকের বসন শিথিল করে দিয়ে সন্তানকে স্তন দেয়। হৈমন্তিক সূর্যের কিরণধারা মা ও ছেলের ওপর ঝরে পড়ে। মাটি-ধুলো উড়ে এসে জড়িয়ে থাকে মায়ের আর ছেলের মাথার চুলে; রৌদ্রতাপে আর ধুলোতে তাদের গায়ের রঙ মাটির মতন ধূসর হয়ে ওঠে। মনে হয়, মাটির-গড়া দুটো মূর্তি।

মায়ের তামাটে উন্নত স্তনযুগল থেকে তুষারশুভ্র দুগ্ধধারা সবেগে উচ্ছ্বসিত হয়। এক স্তন শিশুর নধরমুখে ঢালে অমৃত আর অন্য স্তন থেকে ঝর্নাধারার মতন নিঃসৃত হয় দুগ্ধধারা। মা বাধা দেয় না এ প্রবাহ। তার স্তন্য-দুগ্ধের পরিমাণ-প্রাচুর্য এই লোভী শিশুর প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে; এই নিরর্থক উদ্বৃত্ত অজস্রতা আরও বহু শিশুর প্রয়োজন মেটাতে পারে। মা এ সম্বন্ধে সচেতন; তাই নির্বিকারচিত্তে এ অমূল্য সম্পদের প্রতি তার এই ঔদাসীন্য। অক্ষয়-অশেষ এই উৎস মাঝে মাঝে দুকূলপ্লাবী বন্যার বেগে প্রবাহিত হয়। মা আপন পরিধেয় বাঁচাবার জন্য স্তনযুগল তুলে ধরে। মাটিতে দুগ্ধধারা পড়ে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। মাটির বুকে পড়ে থাকে কালো কোমল দাগ। মায়ের বুকের সঞ্জীবনী সুধা পানে তৃপ্ত ছেলেটা হয়েছে নাদুসনুদুস্ খোশমেজাজি।

শীতঋতুর সমাগমে তারা শীতের প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা করে নেয়। এবার তাদের ফসল হয়েছে অঢেল। আগে কোনোদিন এমন হয়নি। তিন কামরাওয়ালা তাদের বাড়িটা শস্যসম্ভারে ফেঁপে ওঠে। ঘরের কড়িবর্গায় ঝোলে শুকনো পেঁয়াজ-রসুন, গম আর চাউলভর্তি বড় বড় ডোলে ঘরগুলো ঠাসা। এই সঞ্চিত শস্যভাণ্ডারের বেশির ভাগই বাড়তি—বিক্রি হবে এই উদ্বৃত্ত শস্যসম্ভার। ওয়াঙ লাঙ মিতব্যয়ী। জুয়ার আড্ডায় বা ভোজন-বিলাসে অপব্যয় তার স্বভাববিরুদ্ধ। গাঁয়ের অন্যান্য চাষিদের মতন সে বাজে আমোদ-স্ফূর্তিতে মাতে না; তাই অন্যদের মতন তাকে নগদ পয়সার লোভে তাড়াহুড়ো করে অল্পদামে শস্যও বিক্রি করতে হয় না। সে রয়ে-সয়ে শীতের মওসুমে বা বড়দিনে তার সঞ্চিত শস্য হাতছাড়া করে, তখন খাদ্যদ্রব্যের প্রচুর দাম পাওয়া যায়।

কিন্তু তার চাচার কথা আলাদা। রয়ে-সয়ে বিক্রি তার ধাতে সয় না। ভালো করে ফসল পাকার অবসরও সে দেয় না। আগেই সব সাফ করে দেয়। অনেক

সময় জমিতে ফসল রেখেই সে তা বিক্রি করে দেয়, কেবল ফসল-তোলা আর মাড়াই'র ঝামেলা এড়ানোর জন্য। তার কাঁচাপয়সার আশু প্রয়োজন। ওয়াঙের চাচিও এক অদ্ভুত জীব। যেমনি স্থূল তার দেহ তেমনি স্থূল তার বুদ্ধি। তদুপরি সে কুঁড়ের বেগম। বসন-ভোজন-বিলাসের প্রতি তার অসীম অকৃত্রিম প্রীতি। ওয়াঙের স্ত্রী কিন্তু এমন নয়।

চাচার বাড়িখানার জীর্ণ অন্তিম দশা, ঘরের কড়িবর্গা শূন্য। পেঁয়াজ-রসুনের নামগন্ধও নেই এখানে। সঞ্চয়ী ওয়াঙের ঘরের চালে একটা শুয়োরের ঠ্যাংও শুঁটকি হয়ে ঝুলছে। সে এই ঠ্যাংটা কিনেছিল তার প্রতিবেশী চিঙের কাছ থেকে। শুয়োরটা রোগা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে বলে চিঙ ওটা জবাই করেছিল। বেশ প্রকাণ্ড ঠ্যাংটা ওলান নুন দিয়ে জারিয়ে রেখেছে। মুরগিও এমনি করে জারিয়ে রাখা হয়েছে। সময়-অসময়ে কাজে লাগবে।

শীতকাল। উত্তর-পূর্ব মরুভূমি থেকে ভেসে আসা কনকনে বাতাসে ওয়াঙ এই প্রাচুর্যের মাঝে নিঃশঙ্কচিত্তে দিব্যি বাড়িতে বসে কাটিয়ে দেয়। খোকা বসতে শিখেছে। ওয়াঙ তার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করে। তাদের বিয়ের দিনে নিমন্ত্রিত অতিথিদের ওয়াঙ এ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করে, প্রত্যেককে দশটা করে লাল রঙ ডিম খেতে দেয়। অনাহূত যারা খোকাকে আশীর্বাদ করতে আসে, তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয় দুটো করে লালরঙ-করা ডিম। তাদের খোকাকে দেখে দর্শকদের মনে ঈর্ষা জাগে। কেমন গোলগাল চাঁদপানা মুখ; মায়ের মতন উঁচু চোয়াল!

শীতের দরুন ওয়াঙ বাইরে যায় না। ঘরের অনাবৃত মেঝের উপর না বসে সে লেপ-পাতা মেঝেতে বসে। আলোর জন্য দক্ষিণের দুয়ারটা খুলে দেয়; শীতের উত্তরী হিমেল হাওয়া মাটির দেয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে যায়।

দোরগোড়ার খেজুরগাছের পাতা ছিঁড়ে ফালি-ফালি হয়ে গেছে; উইলো আর পিচগাছ দুটো রিক্তপত্র; বাড়ির পূর্বদিকের বাঁশঝাড়ের পাতাগুলোই কেবল হিমেল ঝড়ো হাওয়ার সাথে অনবরত সংগ্রাম করে বাঁশ আঁকড়ে ধরে আছে।

এই শুকনো নীরস হাওয়ায় গমের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারছে না। ওয়াঙ তাই ব্যাকুল মনে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করে। একদিন ধূসর আকাশ থেকে সহসা বৃষ্টিপাত হয়; প্রচণ্ড বাতাসের বদলে বইতে শুরু করে উষ্ণ মৃদু হাওয়া। তারা মুগ্ধদৃষ্টিতে বর্ষণমুখর প্রকৃতির পানে চেয়ে থাকে—বৃষ্টির ঋজু সতেজ ফোঁটা ধরিত্রীর বুকে পড়ে বিলীন হয়ে যায়; চাল বেয়ে টপ টপ করে বাড়ির আঙিনায় পড়ে। খোকা অবাক বিস্ময়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বৃষ্টির রজতবিন্দু ধরতে চায়—খিলখিল করে হাসে। তার হাসিতে যোগ দেয় তার বাপ-মা, তার দাদু। বুড়ো নাতির পাশে থপ করে বসে পড়ে বলে :

"এমন চমৎকার বাচ্চা বারো গাঁয়ে খুঁজেও একটা পাবে না। আমার ভাইয়ের নোংরা প্যাঁচা বাচ্চাগুলো দিকে চেয়ে দ্যাখো। এগুলো হাঁটতে শেখার আগে চোখ খুলে কোনোকিছুর দিকে চাইতেও শেখে না; সর্বদা চোখ বুজে থাকে।"

এই বারিধারার স্পর্শ গায়ে মেখে, গমের অঙ্কুর রাঙা মাটির বুক চিরে, আকাশের পানে সবুজ কিশলয় তুলে ধরে।

এমনি বর্ষণমুখর দিনে চাষিরা একে অন্যের বাড়িতে আসা-যাওয়া করে; তাদের মেলামেশা আমোদ-স্ফূর্তি চলে। তাদের জীবনে অবাধ অবসর, মনে অসীম আনন্দ। প্রকৃতি তাদের হয়ে মাঠে কাজ করছে; তাদের আর পিঠ ভেঙে পানির ভার বয়ে মাঠে ঢালতে হবে না; প্রসন্ন প্রকৃতি ক্ষেতের ফসলে পানি সিঞ্চনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাই তাদের আড্ডা জমে; চায়ের মজলিশ বসে, গল্পগুজব চলে। মাঠের আল ভেঙে একে অন্যের বাড়িতে খালিপায়ে আনাগোনা করে। মেয়েরা বাড়িতে বসে জুতো মেরামত করে; পুরনো ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করে, নববর্ষের উৎসবের আয়োজন লেগে যায়।

ওয়াঙ আর ওলান কিন্তু কারো বাড়িতে বড় একটা যায় না। গাঁয়ের এতগুলো বাড়ির মধ্যে তাদের মতো এমন আনন্দ আর প্রাচুর্য আর কোথাও নেই। ওয়াঙের ভয়, অত্যধিক মাখামাখি ও হৃদ্যতার পথ বেয়ে আসবে ঋণ দেওয়ার জন্য আবদার-অনুরোধ; ঋণ হয়ে বেরিয়ে যাবে তার স্ত্রী আর প্রাচুর্য। নববর্ষ সমাগত প্রায়, উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চিত প্রাচুর্য আর উপাদান কয়জনার আছে? তাই অতিহৃদ্যতা এড়িয়ে সে বাড়িতেই থাকে। তার বউ জামাকাপড় সেলাই করে আর সে তার চাষাবাদের সরঞ্জামগুলো পরীক্ষা করে; ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি মেরামত করে। সে করে ক্ষেতখামারের ব্যবস্থা আর তার বউ করে ঘরকন্নার ব্যবস্থা। মাটির কলসি ফুটো হয়ে গেলে বউ সেটা অকেজো বলে ফেলে দিয়ে নতুন কলসি কেনার বায়না ধরে না। সে কাদামাটি দিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে আগুনের তাপে পুড়িয়ে নেয়। কলসিটা আবার নতুনের মতোই হয়ে ওঠে।

পরস্পরের সমর্থন আর অনুমোদনে তাদের অন্তরঙ্গতা দানা বাঁধে; জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে। তাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হয় খুব কম। যেমন, "নতুন চারা করার জন্য স্কোয়াশের বীজ রেখেছ তো?" "এবার গমের খড় বিক্রি করে বিনের ডাঁটা জালাব।" কচিৎ কদাচিৎ ওয়াঙ হয়তো বলে, "আজ হালুয়াটা চমৎকার হয়েছে তো!" ওলান নির্বিকার জওয়াব দেয়, "এবার আমাদের গম ভালো হয়েছে, তাই হালুয়াটাও ভালো হয়।" এমনিধারা কথাবার্তা।

এবার ফসল বিক্রির টাকা খাইখরচা বাদে কিছু উদ্বৃত্ত রয়েছে। এ টাকা কোমরের থলিতে রাখতে বা এ সম্বন্ধে বউ ছাড়া অন্যের কাছে পরামর্শ করতে তার ভয় হয়। টাকাটা কোথায় রাখে এ সম্বন্ধে স্বামী-স্ত্রীতে গোপন পরামর্শ চলে। পরামর্শের পর ওলান তাদের বিছানার পাশে দেয়ালে গর্ত খোঁড়ে। ওয়াঙ টাকাগুলো সেই গর্তে রেখে দিলে, ওলান মাটি দিয়ে গর্তমুখ বন্ধ করে দেয়। গর্তের অস্তিত্বই যেন নেই আর কী! স্বামী-স্ত্রীর কাছে এই গোপন সঞ্চয় পরম সম্পদ। এই ঐশ্বর্যাধিকারের চেতনা বুকে নিয়ে ওয়াঙ নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে তার বন্ধুবান্ধব আর সহকর্মীদের সামনে চলাফেরা করে।

পাঁচ

নববর্ষের আগমনে সবার বাড়িতে উৎসব উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলে। ওয়াঙ লাঙ শহরে মোমবাতিওয়ালার দোকানে গিয়ে কিনে আনে অনেকগুলো চতুষ্কোণ লাল কাগজ; কাগজগুলোতে সোনার পানিতে লেখা কল্যাণবাণী—আনন্দ ঐশ্বর্যবাহী বাণী। কাগজগুলো সে তার তৈজসপত্র আর চাষাবাদের যন্ত্রে—লাঙল, জোয়াল, কোদাল, নিড়ানিতে সেঁটে দেয়। নতুন বছরে এগুলো তার সংসারে আনবে শ্রী-সৌভাগ্য, এই আশায় সে তার ঘরের দুয়ারগুলোতে সৌভাগ্যের-বাণী-লেখা লাল কাগজের ফালি লাগিয়ে দেয়; দুয়ারের পাল্লায় লাগিয়ে দেয় সুন্দর ফুল-লতা-আঁকা লাল কাগজের ঝালর। দেবতার পোশাক তৈরির জন্য লাল কাগজ কিনে এনেছে। তার বুড়ো বাপ কম্পিত হাতে দেবতার পোশাক নিপুণ সুন্দর করে তৈরি করে দেয়। ওয়াঙ সে পোশাক ক্ষেত্র-দেবতার যুগলমূর্তির গায়ে পরিয়ে দেয়। নববর্ষোপলক্ষে সে দেবতার উদ্দেশ্যে গোটাকয়েক ধূপকাঠিও জ্বালায়। বাড়ির মাঝঘরে টাঙানো দেবতার ছবির তলায় জ্বালবে বলে, সে দুটো মোমবাতিও কিনে আনে।

ওয়াঙ ফের শহরে গিয়ে খানিকটা শুয়োরের চর্বি ও সাদা চিনি কিনে আনে। বউ চর্বিটা কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়। বাড়ির জাঁতায় গুঁড়ো করে চর্বি আর চিনি মিশিয়ে নববর্ষের পিঠে তৈরি হবে। এ পিঠের নাম 'মুন-কেক' বা চন্দ্রপুলি। এ পিঠে হোয়াঙ-মঞ্জিলে খাওয়া হত। পিঠেগুলো সেঁকার জন্য টেবিলে সাজাতেই ওয়াঙের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। তার বউ যেমন পিঠে বানিয়েছে, গাঁয়ের আর কোনো মেয়ে এমনটি পারবে না। আর এমন পিঠে সাধারণ লোকে খেতেও পারে না—এ বড়লোকের খাদ্য। গোটাকতক পিঠের উপর তার বউ লাল বাদাম আর শুকনো সবুজ প্লামের কুঁচি দিয়ে সুন্দর ফুল-লতা-পাতা এঁকে দেয়।

"এমন জিনিস খেয়ে ফেলতে মায়া লাগে।" ওয়াঙ আপন মনে বলে।

রঙের চাকচিক্য দেখে অবোধ শিশু যেমন আনন্দে মেতে ওঠে, বুড়োও এই পিঠে দেখে টেবিলের চারপাশে তেমনি আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। সে ছেলেকে বলে, "তোর চাচা আর তার বাচ্চাগুলোকে ডেকে দেখিয়ে দে, নয়ন সার্থক করুক।"

সমৃদ্ধি ওয়াঙকে সাবধানী করে তুলেছে। সে জানে, বুভুক্ষুকে শুধু মনোরম পিঠে দেখাবার জন্য ডেকে আনা চলে না। সে চট করে জওয়াব দেয়, "নববর্ষের আগে নববর্ষের পিঠে দেখানো দোষের।"

ময়দা-চর্বি-মাখা হাতে ওলানও বলে ওঠে, "এগুলো আমাদের জন্য নয়। সাদাসিধে কয়েকটা পিঠে আমাদের জন্য করা হয়েছে। এই দামি পিঠে খাওয়ার মতন ধনী আমরা নই। হোয়াঙ-মঞ্জিলের বড় বেগমের জন্য আমি এগুলো বানিয়েছি। নববর্ষের পরদিন আমি খোকাকে নিয়ে যাব বড় বেগমকে দেখাবার জন্য। খালিহাতে না গিয়ে এই পিঠেগুলো নিয়ে গিয়ে তাঁকে সওগাত দেব।"

এবার পিঠেগুলোর মর্যাদা আরও বেড়ে যায়। ওয়াঙ খুশি হয়। যে বাড়িতে সে একদিন দীনহীন বেশে ভীরুর মতন গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে বাড়িতে তার স্ত্রী যাবে একজন সাক্ষাৎকারিণী হিসেবে। সঙ্গে নিয়ে যাবে তার মূল্যবান পোশাক-পরিহিত পুত্রসন্তান আর এই মহার্ঘ সওগাত।

তাদের হোয়াঙ-মঞ্জিলে গমনের এই পরিকল্পনার মহিমা নববর্ষ উৎসবের অন্যান্য অঙ্গগুলোকে ম্লান করে দেয়।

ওলানের তৈরি কালো কাপড়ের কোটটা গায়ে দিতে দিতে ওয়াঙ ভেবে নেয়, এই কোটটা পরেই সে জমিদারবাড়িতে যাবে।

নববর্ষের প্রথমদিনে তার চাচা ও অন্যান্য প্রতিবেশীরা তাদের শুভকামনা জানাতে এলে সে তাদের হৈ-হুল্লোড় আর অত্যাচার অবহেলায় সয়ে যায়। সে দামি রঙিন পিঠেগুলো তাদের চক্ষুর আড়াল করে রাখে। পাছে এসব বাজে লোকদের আবার এ মূল্যবান সামগ্রী দিতে হয়। অভ্যাগতরা সাদা পিঠেগুলোর স্বাদ-গন্ধেই এমনি প্রশংসামুখর হয়ে ওঠে যে, এক একবার তার ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, "এরই এত প্রশংসা, ফুল-কাটা রঙিন পিঠেগুলো দেখলে যে কী করতে!" কিন্তু অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করে।

সে বলে না কিছু। আগামীকালের এতবড় অনুষ্ঠানের গৌরব সে অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। সে চায়, এই মহামূল্য সওগাত নিয়ে বুক ফুলিয়ে জমিদারবাড়িতে প্রবেশ করতে।

নববর্ষের দ্বিতীয় দিন মেয়েদের মেলামেশার, দেখা-সাক্ষাতের দিন। পুরুষেরা আগের দিন পানাহারে মত্ত হয়ে হৈ-হুল্লোড় করেছে। আজ মেয়েদের আনন্দ-কোলাহলের পালা। প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠেই ওলান ছেলেকে রঙিন পোশাকে সাজায়। গায়ে লাল জামা, পায়ে বাঘমুখো জুতো, সদ্য মুণ্ডিত মাথায় সোনালি সুতোয় বুদ্ধের মূর্তিতোলা টুপি পরিয়ে ছেলেকে বিছানায় বসিয়ে দেয়। ওয়াঙ তারপর চটপট তৈরি হয়ে নেয়। ওলান তার দীর্ঘ কালো কেশ আঁচড়ে রুপোর পানি-দেওয়া কাঁটা দিয়ে খোঁপা বেঁধে নেয়, নতুন কালো কোটটা গায়ে। ওয়াঙের কোটটাও এ কাপড়ের তৈরি। এবার তারা যাত্রা করে। ওয়াঙের কোলে ছেলে আর বউয়ের হাতে পিঠের ঝুড়ি। শীতের শস্যহীন মাঠে বেয়ে তারা চলে।

হোয়াঙ-মঞ্জিলের ফটকে পৌঁছেই তারা তাদের মর্যাদার যোগ্য স্বীকৃতি পায়। ওয়াঙের ডাকে ফটক খুলে দিয়ে দরোয়ান ফ্যালফ্যাল চোখে তাদের পানে চেয়ে আঁচিলের চুল তিনটে পাকাতে থাকে। তাদের হঠাৎ যেন চিনতে পরে বলে ওঠে : "আরে! ওয়াঙ চাষি যে! এবার আর একলা নয়; তিনজন।" তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের জাঁকজমক আর পুত্রসন্তান দেখে বলে, "তোমার অবস্থা যে বদলে গেছে দেখছি। আর তোমাকে আশীর্বাদ করে কী হবে? এমনিই তো ভাগ্য তোমার যথেষ্ট সুপ্রসন্ন হয়েছে।"

ওয়াঙ লাঙ তাচ্ছিল্যের সুরে জওয়াব দেয়—যেন কোনো নিচুস্তরের লোকের সাথে কথা বলছে—"সবই মাটির দৌলতে! এবার ফসল হয়েছে ভালো, তাই।" এই বলে দৃঢ় নিশ্চিত পদক্ষেপে ফটকের ভিতর প্রবেশ করে।

তাদের হাব-ভাব, চাল-চলন দরোয়ানের মনে প্রভাব বিস্তার করে। সে ওয়াঙকে অনুরোধের সুরে বলে :

"আমি তোমার বউ আর ছেলেকে ভিতরে দিয়ে আসি, তুমি আমার গরিবখানায় বসো।"

ওয়াঙ ফটকে দাঁড়িয়ে, তার স্ত্রী আর ছেলের পানে তাকিয়ে থাকে। দরোয়ানের সাথে তারা শতমহলা বাড়িতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

তার বউ যাচ্ছে জমিদার-বেগমের সাথে দেখা করতে! সঙ্গে ছেলে আর ভেট! সাধারণ ব্যাপার নয়! এ গৌরবের অধিকারী সে একলা। এতে আর কারো ভাগ নেই। সে এবার দরোয়ানের ঘরে প্রবেশ করে।

দরোয়ানের স্ত্রী-র মুখে বসন্তের দাগ। সে ওয়াঙের জন্য আসন পেতে দেয়। ওয়াঙ নির্লিপ্তভাবে এ সম্মান গ্রহণ করে। এ সম্মান তার ন্যায্য প্রাপ্য; তার প্রতি অনুগ্রহ নয়। দরোয়ানের স্ত্রী তাকে এক-পেয়ালা চা দেয়। সে চায়ে চুমুক না দিয়ে অবজ্ঞাভরে পাশে রেখে দেয়। এ চায়ের পাতা অতি বাজে; তার অযোগ্য। এমনি ওয়াঙের ভাবখানা।

কতক্ষণ পর দরোয়ান ওলান আর তার ছেলেকে নিয়ে ফিরে আসে। সে তার স্ত্রী-র পানে তীক্ষ্ণ চোখে চায়, স্ত্রীর মনস্তত্ত্ব আবিষ্কারের আশায়। আজকাল স্বল্পবাক স্ত্রী-র মনস্তত্ত্ব, খেয়ালখুশি একনজরেই তার চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওলানের মুখে তৃপ্তির আভাস; কিন্তু অন্দরমহলে কী ঘটেছে তা বিশদভাবে শোনার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অন্দরমহলে প্রবেশের সুযোগ নেই বলেই তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছে।

দরোয়ান ও তার স্ত্রীকে সংক্ষিপ্ত অভিবাদন জানিয়ে সে ওলান আর ছেলেকে নিয়ে কালবিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়ে। ওলানের কোলে ইতিমধ্যে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। সে ঘুমন্ত ছেলেকে ওলানের কোল থেকে নিজের কোলে নেয়। ঘুমন্ত শিশু নতুন কোট পরে কুঁকড়ে পড়ে থাকে।

"খবর কী?" ওয়াঙ পিছন ফিরে ওলানকে প্রশ্ন করে। ওলানের মন্থরতায় জীবনে এই প্রথম ওয়াঙের মনে বিরক্তি জাগে। ওলান ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে এসে স্বামীর কানে ফিসফিস করে বলে, "আমার বিশ্বাস, এদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে।"

তার কণ্ঠস্বর আহত; যেন কোনো ক্ষুধিত দেবতার কথা বলছে।

"কী বলতে চাও, পরিষ্কার করে বলো।" ওয়াঙ আবার বউকে বলে।

ওলান ধীরে শান্তকণ্ঠে এ প্রশ্নের জওয়াব দেয়। চট করে অনায়াসে কিছু বলা তার পক্ষে অসম্ভব।

"বড় বেগম গেলবারের কোটটাই গায়ে দিয়ে আছে দেখলাম। এমনটি আগে কোনোদিন দেখিনি। দাস-দাসীর গায়েও নতুন জামা-কাপড় দেখলাম না।" একটু থেমে আবার বলে, "আমার এ কোটটার মতন দামি কোট তো কারো গায়েই দেখতে পাইনি। বড়সাহেবের উপপত্নীদের কোনো ছেলেরই রূপে-পরিচ্ছদে আমার খোকার সাথে তুলনা হয় না।"

ধীর প্রশান্ত হাসিতে ওলানের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াঙও উচ্চস্বরে হেসে খোকাকে আরও নিবিড় করে বুকে জড়িয়ে ধরে। কী চমৎকার মানিয়েছে খোকাকে এই পোশাকে! এই আনন্দোচ্ছ্বাসের মাঝখানে হঠাৎ ওয়াঙের মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কী বোকামি! এই মুক্ত আকাশের তলে এমন সুন্দর পুষ্ট খোকাকে অনাবৃত অবস্থায় নিয়ে চলেছে। কে জানে কোন্ অপদেবতার নজর কখন পড়ে যায়! এই ভেবে সে তৎক্ষণাৎ নিজের গায়ের কোটটা খুলে ছেলেকে ঢেকে দেয়। ছেলের মাথা বুকে লুকিয়ে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, "কী মন্দ কপাল! শেষকালে কিনা একটা মেয়ে হল! আর যা চেহারার ছিরি। বসন্তের দাগে মুখটা কুৎসিত হয়ে আছে। এবার এটা মলেই বাঁচি—"

"হ্যাঁ, তাই।" বলে ওলানও সায় দেয়। তার মনেও বিপদের ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এই সতর্কতায় নিশ্চিন্ত হয়ে ওয়াঙ আবার পুরনো আলোচনায় ফিরে আসে। "এই দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে কোনো আঁচ পেলে?"

"বাবুর্চির সাথে সামান্য আলাপ হয়েছিল বৈ কি! তার অধীনে আমি অনেকদিন কাজ করেছি। তার মুখে শুনলাম, জমিদারি বেশিদিন টেকবে না। জমিদারের পাঁচটি তরুণ ছেলে বিদেশে বসে পানির মতন পয়সা খরচ করছে। নিত্যি নতুন মেয়েমানুষ জোগাড় করছে আর সাধ মিটে গেলেই বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এদিকে বড়সাহেবও ছেলেদের সাথে এ ব্যাপারে পাল্লা দিয়ে চলছেন। বাড়িতে বসে ফি-বছর দুটো-একটা করে উপপত্নীর সংখ্যা বাড়াচ্ছেন। ওদিকে বড়বেগমও আফিম খেয়ে সারাদিন বুঁদ হয়ে পড়ে থাকেন। এতেও মুঠো মুঠো টাকা খরচ হচ্ছে।"

"তাই নাকি?" ওয়াঙ মন্ত্রমুগ্ধের মতন বিড়বিড় করে।

"এদিকে আবার আসছে বসন্তে জমিদারের সেজমেয়ের বিয়ে।" ওলান বলে যায় : "আর এ বিয়েতে যৌতুকের যা বহর! যৌতুক নয় তো, বন্দি রাজপুত্রের মুক্তি-মূল্য। এ টাকা খরচ করলে বড় শহরের একজন কেউকেটা হয়ে থাকা যায়। পোশাকের কাপড় আসবে বিদেশ থেকে; সদলবলে দর্জি আসবে সাংহাই থেকে। পোশাকে ফ্যাশানের একটু এদিক-ওদিক হলে চলবে না। বিদেশি পোশাকের মতন আধুনিক সুন্দর হওয়া চাই।"

"আচ্ছা এত পয়সা খরচ করে বিয়েটা হবে কার সঙ্গে শুনি?" এই অজস্র অর্থব্যয়ের কথা শুনে ওয়াঙ যুগপৎ প্রশংসা আর আশঙ্কায় বলে ওঠে।

"সাংহাইয়ের কোনো এক ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলের সাথে।" একটু থেমে ওলান আবার বলে যায়, "দুর্দশায় যে তারা পড়েছে, এ নিঃসন্দেহ; কারণ বড়বেগমও

বলছিলেন, তাঁরা সামান্য জমি বিক্রি করতে চান—বাড়ির দক্ষিণ মাঠের ধেনো জমি। জমিটা খুবই ভালো। ফি-বছর খালের পানিতে এ জমি ভেসে যায়।"

"তারা জমি বেচবে?" ওয়াঙ যেন ব্যাপারটা এবার তলিয়ে বুঝতে পারে। "তাহলে সত্যি তারা খারাপ অবস্থায় পড়েছে। নইলে জমি কেউ বেচে? মাটি যে মানুষের রক্ত-মাংসের শামিল!"

এই বলে সে একমুহূর্ত কী ভাবে। তার মনে কী একটা মতলব খেলে যায়। সে মাথায় মৃদু করাঘাত করতে করতে বলে, "এ জমি আমি কিনব।"

"কিন্তু জমিটা—" ওলান সংশয়জড়িত কণ্ঠে কী যেন বলতে চায়।

"না, এ জমি আমি কিনবই", কর্তৃত্বের সুরে ওয়াঙ চেঁচিয়ে ওঠে।— "হোয়াঙ-মঞ্জিলের এ জমি আমি হাতছাড়া হতে দিচ্ছি না।"

"জমিটা যে অনেক দূরে।" ওলান ভীরুকণ্ঠে আপত্তি জানায়। "সেখানে পৌঁছতেই তো আধাদুপুর কেটে যাবে।"

"তা হোক গে। এ জমি আমি কিনবই।" তার সুরে বিরক্তি ফুটে ওঠে। ও যেন মায়ের প্রতিকূল ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেদ প্রকাশ করছে।

"জমি কিনবে, সে তো ভালো কথা!" ওলান শান্তকণ্ঠে স্বামীর ইচ্ছায় সায় দেয়।—"দেয়ালের গর্তে টাকা লুকিয়ে রাখার চেয়ে এ অনেক ভালো। কথা হল, তোমার চাচার জমি কিনলেই পারো। তিনি আমাদের জমির লাগজমিটা বিক্রির জন্য খরিদ্দার খুঁজে বেড়াচ্ছেন।"

"চাচার জমি!" ওয়াঙের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সে জমি আমি কিনছি না। সে গত বিশ বছরে ধরে এ জমি থেকে কেবল ফসল শুষেছে, এক রত্তি সার দেয়নি! ও জমির মাটি আর মাটি নেই, চুনের মতোই ক্ষয়ে নিঃসার হয়ে গেছে। না, আমি হোয়াঙদের জমিই কিনব।"

"হোয়াঙদের জমি!" কথাটা সে এমন অবহেলাভরে বলে যে, এ যেন অতি মামুলি লোকের জমি। এই ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবাড়ির নির্বোধ লোকদের চেয়ে সে যেন উঁচুস্তরের লোক। সে নগদ টাকা হাতে নিয়ে গিয়ে সরল ভাষায় বলবে, "এই টাকা নিয়ে এসেছি। এবার বলো তোমাদের জমির দাম কত?" সে যেন একথাগুলো খোদ জমিদার আর তার গোমস্তাকে এখনই বলছে, এমনি তার মনে হয়, "আমি যে-কোনো খরিদ্দারের মতন দাম দেব, ন্যায্য দাম। কি বলো? টাকা সঙ্গেই আছে।"

তার যে স্ত্রী বহুদিন এই অভিজাতম্মন্য গর্বোদ্ধত পরিবারে দাসীবৃত্তি করেছে, সে স্ত্রী হবে এমনি পুরুষের গৃহিণী, যে পুরুষ সেই গর্বোদ্ধত পরিবারের জমির স্বত্বাধিকারী। যে মাটি হোয়াঙ-পরিবারকে বংশানুক্রমিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি দিয়েছে, সে হবে সেই মাটির মালিক। ওলান তার স্বামীর মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করে, সহসা স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করে বলে :

"বেশ, জমি তাহলে কেনা হোক। ধেনো জমি সত্যি ভালো। জমিটা খালের কাছেই, তাই পানির অসুবিধাও হবে না।"

এবার ধীর-মন্থর হাসির রেখা ফুঠে ওঠে ওলানের মুখে। এ হাসি তার অনায়ত কালো চোখের নিষ্প্রভতায় ঔজ্জ্বল্য দিতে পারে না, অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে অস্পষ্ট করুণকণ্ঠে বলে, "গতবার এমনি দিনে আমি ছিলাম ও-বাড়ির বাঁদি।"

তারা দুজন নীরবে পথ চলে।

ছয়

এই একটুকরো জমির স্বত্বাধিকারী হয়ে ওয়াঙের জীবনধারা বদলে যায়। দেয়ালের ফোকর থেকে টাকা বের করে সে জমিদারবাড়িতে যায়। জমিটা কিনে সে জমিদারের সমান সম্মান অর্জন করে, কিন্তু পরক্ষণেই এই সম্মানবোধ তার মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়। তার মনটা কেমন যেন বিমর্ষ আর নিরুৎসাহ হয়ে ওঠে। এই মনোভাব যেন অনুতাপের পর্যায়ে এসে নামে। দেওয়ালের যে ফোকরটা এতদিন রৌপ্যমুদ্রায় পূর্ণ ছিল, সেই ফোকরের বর্তমান শূন্যতার কথা ভেবে তার অনুতপ্ত মন কেঁদে ওঠে। তার মনে হয়, টাকাটা খরচ না করলেই ভালো হত। এ টাকা আবার ফিরে আসুক, শূন্য গর্তটা আবার পূর্ণ হয়ে ওঠুক। জমিটাতে ফসল ফলাতে কত পরিশ্রম করতে হবে। জমিটা সত্যি অনেক দূর। ওলান ঠিকই বলেছিল। তাছাড়া সে যে ভেবেছিল, জমি-কেনার ব্যাপারটা খুব জমকালো হবে, তা তো হয়নি। এ নিয়ে কোনো চাঞ্চল্য জাগেনি কোথাও। সে হোয়াঙ-মঞ্জিলে খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছেছিল। দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্নে পড়লেও বড়হুজুরের ঘুম তখনও ভাঙেনি। ওয়াঙ খুব হেঁকে দরোয়ানকে বলল :

"বড় হুজুরকে খবর দাও, তার সাথে আমার জরুরি কাজ আছে। টাকা-পয়সা লেনদেনের ব্যাপার!" দরোয়ান স্পষ্ট জওয়াব দিল, "সারা দুনিয়ার টাকা হাতের মুঠোতে পেলেও আমি এখন সেই বুড়ো বাঘের ঘুম ভাঙাতে পারব না। তিনি এখন তাঁর আনকোরা মেয়েমানুষ নিয়ে ঘুমোচ্ছেন। এই মেয়েটি মাত্র তিনদিন হল আমদানি হয়েছে। তার ঘুম ভাঙিয়ে আমি আমার মাথা খোয়াতে রাজি নই।" কণ্ঠে শ্লেষ মাখিয়ে পুরনো কথার জের টেনে বলেছিল. "তুমি কি ভেবেছ, ধনদৌলতের কথা শুনেই তাঁর ঘুম ভাঙবে? এতটুকু বয়স থেকে ধনদৌলত নিয়েই তিনি ছিনিমিনি খেলছেন। টাকা তাঁর হাতে খোলামকুচি।"

শেষপর্যন্ত ঘুসখোর ধড়িবাজ নায়েবের সাথেই তাকে কথা বলতে হল। লোকটা বাস্তু-ঘুঘু। দেখতে নাদুসনুদুস তেল-চকচকে। তার হাতদুটোতে যেন আঠা লাগানো রয়েছে। প্রত্যেকটি লেনদেনের সময় তার হাতে কিছু-না-কিছু লেগে থাকবেই। জমিটার দরকষাকষির ফাঁকে ফাঁকে ওয়াঙের মনে হয়, জমির চেয়ে নগদ টাকার মূল্য বেশি। নগদ টাকা চোখের সামনে চকচক করে।

তবে জমির ওপর তার নিজস্ব অধিকার হল, এই তার সান্ত্বনা। একদিন সে জমিটা সরেজমিনে দেখতে চায়। তার এই নতুন সম্পদ অর্জনের খবর এখন পর্যন্ত

কেউ জানে না। কালোমাটির একফালি জমি। সে জমিটা মনোযোগ দিয়ে দেখে, আপন পদক্ষেপে জমিটার পরিমাণ মেপে নেয়। জমিটা দৈর্ঘ্যে তিনশো আর প্রস্থে একশো বিশ পা। জমিটার চারকোণে চারটি সীমানির্দেশক পাথরের স্তম্ভ হোয়াঙ-পরিবারের মোহর বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ! এবার এই মোহর সে বদলে ফেলবে। তবে এখন নয়, আরও ধনৈশ্বর্যের মালিক হয়ে। তখন সে কারো তোয়াক্কা করবে না। জমিটার পানে তাকিয়ে সে আপনমনে ভাবতে থাকে। ভাবে, "জমিদারের কাছে এ জমি মাটি মাত্র, কিন্তু আমার কাছে এ অমূল্য ধন।"

এই কথা ভাবতেই মন তার বিগড়ে যায়। সামান্য একফালি তো জমি! এরই জন্য সে কিনা তার সমস্ত সঞ্চয় উজাড় করে দিয়ে এল। মন তার ধিক্কারে ভরে যায়। নগদ টাকাগুলো গোমস্তার হাতে গুনে দেবার সময় সে গর্ব অনুভব করেছিল বৈকি! কিন্তু টাকাটা হাতে নিয়ে গোমস্তা বেটা তাচ্ছিল্যের সুরে তাকে বলল কিনা, "যাক, এ দিয়ে বুড়িবেগমের দিনকয়েকের আফিমের খরচ চলবে!"

তার আর এই জমিদারবাড়ির মধ্যকার ব্যবধানটা আজ দুস্তর অলঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে। সামনের খালটার মতন দুস্তর; জমিদারবাড়ির উঁচু প্রাচীরের মতন দুর্লঙ্ঘ্য। তার মনে সংকল্প জাগে, এ ব্যবধানকে জয় করতে হবে। সঞ্চয়ের পর সঞ্চয় করে জমির পর জমি সে কিনবে—জমিদারের জমি। তখন এই জমিটুকু হবে অতি অকিঞ্চিৎকর।

এমনি করে এই জমির ফালিটুকু ওয়াঙের স্বপ্নসাধের প্রতীক হয়ে থাকে।

বসন্ত আসে ঝড়ো-হাওয়া আর বৃষ্টিভরা ছেঁড়া মেঘের টুকরো নিয়ে। ওয়াঙের জীবনে আসে শীতের কর্মহীন অবসরের বদলে দিনমান মাঠে অক্লান্ত পরিশ্রমের পালা। বুড়ো বাড়িতে বসে ছেলে আগলায় আর ওয়াঙ-দম্পতি উদয়াস্ত ক্ষেতে কাজ করে।

এরই মধ্যে একদিন ওয়াঙ বউয়ের দেহে সন্তান-সম্ভাবনা লক্ষ করে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ফসল-তোলার মুওসুমে কি বউটা অকেজো হয়ে পড়ে থাকবে? ক্লান্ত-বিরক্ত ওয়াঙ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বউয়ের উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে : "বিয়োবার ঠিক সময়টাই বেছে নিয়েছ, দেখছি।"

ওলানও জোরালো কণ্ঠেই জওয়াব দেয় :

"এবারে এমন কিছু নয়, প্রথমবারেই যা একটু কষ্ট হয়।"

সেদিন থেকে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম অবধি, এ সম্বন্ধে তাদের মধ্যে আর কোনো কথা হয় না।

হেমন্তের এক ভোরবেলায় ওলান নিড়ানিটা নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে ঢোকে। সেদিন ওয়াঙ দুপুরবেলায় খেতেও বাড়ি যায় না। আকাশে সেদিন বজ্রমেঘের ঘনঘটা; এদিকে তার মাঠের ধান পেকে গেছে। কেটে আঁটি না বাঁধতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তার অবসর নেই খাবার খেতে ঘরে যাওয়ার। সন্ধ্যার পূর্বেই ওলান আবার মাঠে ফিরে এসে স্বামীর পাশে কাজে লেগে যায়। তার দেহের

স্ফীতি মিলিয়ে গেছে; দেহ ক্লান্ত অবসন্ন। সে নিঃশঙ্ক, নীরব। তাকে দেখে ওয়াঙের মনে করুণা জাগে। তার বলতে ইচ্ছা হয় :

"আজ তোমার অনেক কষ্ট হয়েছে; বাড়িতে গিয়ে বরং আরাম করো।" কিন্তু আপন শ্রান্ত দেহের যন্ত্রণা তাকে নির্মম করে তোলে। আপনমনে সে ভাবে : সন্তান-প্রসবে তার স্ত্রীর যা কষ্ট হয়েছে; মাঠের কাজে তার নিজেরও তার চেয়ে কম হয়নি। তাই কাস্তে চালানোর ফাঁকে সে স্ত্রীকে শুধু জিজ্ঞেস করে :

"ছেলে হয়েছে, না, মেয়ে?

ওলান শান্তকণ্ঠে বলে, "ছেলে।"

তাদের মধ্যে আর বাক্যালাপ হয় না, তবে ওয়াঙ এ সংবাদে প্রসন্ন হয়; তার ক্লান্তির তীব্রতা লাঘব হয়ে যায়। পশ্চিম আকাশের গায়ে একখণ্ড মেঘের ফাঁকে চাঁদ ওঠে। তারা দুজন কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে যায়।

গোসল করে রোদে-তাতা দেহ ঠাণ্ডা করে খাওয়াদাওয়া শেষ করে ওয়াঙ আমেজ করে এক-পেয়ালা চা খায়। চা খেয়ে এবার সে তার ছেলে দেখতে যায়। ওলান রান্নাবান্না শেষ করে শুয়েছে, তার পাশে সদ্যোজাত সন্তান। বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তবে বড়ছেলের মতন বড়সড় হয়নি। ছেলে দেখে ওয়াঙ প্রসন্নমনে মাঝের ঘরে ঢোকে। ছেলে; আবার আর একটা ছেলে। প্রতি বছর একটি করে ছেলে হলে লাল ডিম বিলানো সম্ভবপর নয়। প্রথম ছেলের বেলায় বিলিয়েছে, এই যথেষ্ট। প্রতিবছর একটি ছেলের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়িটার পয় আছে বলতে হবে। ওলান এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে ভাগ্যশ্রী। সে বাপকে ডেকে বলে :

"তোমার নাতির সংখ্যা যে একটা বাড়ল বাবা! এবার বড়টাকে তোমার বিছানায় শোয়াতে হবে।"

বুড়ো আনন্দে মেতে ওঠে। সে তো এতদিন এই কামনাই করে এসেছে। নাতি তার বুকে শুয়ে কচি নরম দেহের উষ্ণতায় তার স্থবির হিমদেহ উষ্ণ করবে। এতদিন নাতিটা তার মাকে ছেড়ে আসতে রাজি হয়নি। আজ সে কচি পা-দুখানায় ভর করে মায়ের বুকে অন্য শিশুকে দেখে বুঝে নেয়, এ রাজ্যে তার আর স্থান নেই। তাই বিনা-প্রতিবাদে সে দাদুর পাশে শুতে যায়।

এবারও খুব ভালো ফসল হয়েছে। ওয়াঙ লাঙ আবার উদ্বৃত্ত টাকা দেয়ালের ফোকরে লুকিয়ে রাখে। হোয়াঙদের জমিটায় তার জমির দ্বিগুণ ধান হয়েছে। সে জমির মাটিটা অত্যন্ত রসালো আর উর্বর। সে জমিতে আগাছার মতন প্রচুর ধান হয়েছে। এবার সবাই জানতে পারে এ জমিটার মালিক ওয়াঙ লাঙ। তাকে গায়ের প্রধান করার আলাপ শোনা গেল।

সাত

তার চাচা সম্বন্ধে ওয়াঙ যা আশঙ্কা এতদিন করেছিল, শেষপর্যন্ত তা বাস্তবে পরিণত হয়। তার বাবার ছোটভাই এই চাচা। ওয়াঙের আশঙ্কা ছিল, নিজের সংসারে অভাব

হলে যে-কোনো সময় তার চাচা আত্মীয়তার দাবি নিয়ে তাদের স্কন্ধে চেপে বসতে পারে। ওয়াঙদের অভাব-অনটনের দিনে এ লোকটা যেমন করেই হোক, ক্ষেত খুঁটে তার সাত ছেলে, স্ত্রী আর নিজের পেট চালিয়েছে। কিন্তু একবার পেটে কিছু পড়লে হাত গুটিয়ে বসে থাকাই এ গোষ্ঠীর স্বভাব। ওয়াঙের চাচি নড়েচড়ে ঘরখানাও ঝাঁট দেয় না; ছেলেমেয়েগুলোও এমনি কুঁড়ে যে, খেয়েদেয়ে মুখের এঁটো ধোবার কষ্টটুকু করতেও নারাজ। সবচেয়ে লজ্জার কথা তার বিয়ের যোগ্য ধিঙি-মেয়েরা মাথার রুক্ষ চুলগুলোকে কাকের বাসা বানিয়ে সারা পাড়ায় ধেই ধেই করে বেড়ায়, বেগানা পুরুষদের সাথে হাসি-তামাশা করে। এমনি অবস্থায় তাদের বড়মেয়েকে একদিন দেখে সে ক্রোধ সংবরণ করতে না-পেরে চাচিকে শুনিয়ে দেয় :

"তোমাদের হয়েছে কী শুনি? এমনি করে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়ালে কে তোমার মেয়েদের বিয়ে করতে আসবে? ধাড়ি মেয়ে, তিন বছর আগে বিয়ের বয়স হয়েছে। আজ স্বচক্ষে দেখলাম, গাঁয়ের একটা পাজি বখাটে ছোকরা ওর হাত ধরে টানাটানি করছে আর এই বেহায়া মেয়েটা দাঁত বের করে দিব্যি হাসছে, ছিঃ!"

তার চাচির সারাদেহে একমাত্র রসনাটাই সচল আছে। এবার বুড়ি তার এই সচল অঙ্গের ঝাল ওয়াঙের উপর ঝাড়তে শুরু করে :

"তা তো বলবেই। বিয়ের যৌতুক, অন্যান্য খরচ আর ঘটক বিদায়ের পয়সা কে দেবে? যাদের জমির অন্ত নেই; যারা ইচ্ছা করলেই নগদ পয়সা দিয়ে জমিদারের গোটা জমিদারি কিনতে পারে, তাদের মুখে এমন বড় কথা সাজে বৈ কি! তোমার চাচার যা ফাটা কপাল! আজীবন কপালপোড়া মানুষ! কী মন্দভাগ্য নিয়েই যে ও জন্মেছে! সব অদৃষ্ট! অন্যের মাঠে সোনা ফলে, আর ওর বোনা বীজ মাঠে পড়েই পুড়ে ছাই হয়ে যায়, ফসলের বদলে জন্মে রাজ্যের আগাছা। কারো চেয়ে পরিশ্রম তো ও কম করে না!"

এই বলে সে ইনিয়ে-বিনিয়ে বিলাপ আরম্ভ করে। এই বিলাপ শেষপর্যন্ত উন্মত্ততায় পর্যবসিত হয়। চুল ছিঁড়ে গলা ফাটিয়ে সে আপন দুঃখের কাহিনী বলে যায় :

"পোড়াকপালের দুর্ভোগ তোমরা বুঝবে না। অন্যের ক্ষেতে জন্মে প্রচুর গম-ধান আর আমাদের ক্ষেতে জন্মে আগাছা! অন্যের বাড়িঘর যুগযুগ ধরে অটল দাঁড়িয়ে থাকে আর ভূমিকম্পের দৌরাত্ম্যে আমাদের বাড়ির দেয়ালে ফাটল ধরে। অন্য মেয়েরা পেটে ধরে পুত্রসন্তান আর আমি—আঁটকুড়ি পেটে ধরি মেয়ের পর মেয়ে। ছেলে একটা হয়েছে বটে; সেটা হয়েছে কুলাঙ্গার, একেই বলে পোড়াকপাল!"

তার চেঁচামেচিতে পাড়াপড়শি এসে জড়ো হয়, ওয়াঙ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বক্তব্য শেষ না করে সে যাবে না—

"যাই হোক, চাচা মুরুব্বি মানুষ। তাকে উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে অশোভন। তবে এতটুকু বলে যাই, মেয়ের কৌমার্য নষ্ট হওয়ার আগে বিয়েটা

দিয়ে দেওয়া সমীচীন। যে-মেয়ে কুত্তির মতো পথে পথে ঘুরে বেড়ায় তাকে দিয়ে কেলেঙ্কারি হবেই। এ জানা কথা।"

সোজাসুজি আপন বক্তব্য বলে ওয়াঙ বাড়ি চলে যায়। তার চাচি তখনও চেঁচাতে থাকে। তার ইচ্ছা ছিল, এবারও হোয়াঙদের কিছু জমি কিনবে; সাধ্যমতন প্রতিবছরই কিছু কিনতে থাকবে। বাড়িতে একটা ঘর বাড়াবার স্বপ্নও তার ছিল। সে আর তার ছেলে জমিদারের সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, আর তার চাচার অপোগণ্ড ছেলেমেয়েরা একই বংশের বংশধর হয়ে দিন দিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে। একথা ভাবতেই তার মনে ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে।

পরদিন ওয়াঙ মাঠে কাজ করছে, এমন সময় তার চাচা এসে হাজির। ওলান অনুপস্থিত। দ্বিতীয় সন্তান জন্মের পর দশ মাস কেটে গেছে। সে আবার আসন্নপ্রসবা। এবার শরীরটাও তার ভালো যাচ্ছে না, তাই সে মাঠে আসছে না। ওয়াঙ একাই কাজ করছে। শ্লথ বিপর্যস্ত তার পরিহিত বসন, জামা বোতামহীন; কোমরবন্ধের সাহায্যে কোনোমতে তার পরিধেয় দেহ-লগ্ন হয়ে আছে। মনে হয়, বাতাসের একটা ঝাপটা গায়ে লাগলেই সে উলঙ্গ হয়ে যাবে। কর্মরত ওয়াঙের পাশে তার চাচা এসে নীরবে দাঁড়ায়। ওয়াঙ তার পানে চোখ না তুলেই দুষ্টুমির সুরে বলে, "মাফ করো চাচা! কাজে কামাই দিতে পারছি না। বিন ফলাতে হলে দু-তিনবার গোড়াগুলো খুঁচিয়ে দিতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে এ কাজটা সেরে ফেলেছ। আমি কুঁড়ে চাষি; কোনো কাজই ঠিক সময়ে শেষ করে যে একটু বিশ্রাম করব, আমাকে দিয়ে তা হয় না।"

তার চাচা তার কথার খোঁচা বেশ বুঝতে পারে। সে বিদ্রূপটা হজম করে শান্তকণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"আমি কপালপোড়া মানুষ। এবার বিশটা বিনের বীজ পুঁতেছিলাম, চারা গজিয়েছে মাত্র একটা। তারও আবার এমনি দশা যে গোড়া খুঁচিয়ে কোনো ফল হবে না। এবার বিন খেতে হলে কিনেই খেতে হবে।" একথা বলেই সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

ওয়াঙ মন শক্ত করে নেয়। সে জানে তার চাচা একটা-কিছু চাইতে এসেছে। সে নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলে। বিনের চারাগুলো সমব্যবধানে বেশ সুস্থ ঋজু হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। মাটিতে এগুলোর স্পষ্ট ছায়া পড়েছে। তার চাচাই কথা বলে, "ঘরের মানুষটা বলছিল, আমার হতচ্ছাড়ি বড়মেয়েটার বিয়ের ব্যাপারে তুই নাকি খুব উৎসাহী। তুই যা বলেছিস, সব খাঁটি। বয়সে ছোট হলে কী হবে, তোর যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি। সত্যি তার বিয়েটা দিয়ে ফেলা উচিত। বয়েস তার পনেরো, ঠিক বয়েসে বিয়ে হলে এতদিনে ক'ছেলের মা হয়ে যেত। ভয়ে মরি, কবে কোন বখাটে ছোঁড়ার সঙ্গে কিছু কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে-না বসে। তখন জাতি-কুল-মান সব যাবে। তখনকার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখ্। চুন-কালি তো শুধু আমার মুখেই পড়বে না। আমি যে তোর চাচা।"

ওয়াঙ সজোরে নিড়ানিটা মাটিতে পুঁতে রাখে। সে স্পষ্ট করে বলে দিতে চায় তার কথা। বলতে চায়, "তাহলে মেয়েকে শাসনে রাখলেই পারো। মেয়েটাকে বাইরে বেড়াতে না দিয়ে বাড়িতে বসিয়ে ঘরকন্নার কাজ আর বাড়ির জামাকাপড় সেলাই করতে দাও না কেন?" কিন্তু মুরুব্বির মুখের ওপর এমন কথা বলা যায় না। সে নীরবে একটা গাছের গোড়া খোঁচাতে থাকে।

তার চাচা ব্যথিত কণ্ঠে আগের কথার জের টেনে বলে, "আমার সবদিক দিয়েই বরাত মন্দ। তোর মায়ের মতন একটা মেয়ে বিয়ে করার সৌভাগ্য আমার হলে আমার এমন দুর্দশা হত না। তোর মা যেমন ছিল কর্মক্ষম, তেমনি বছর বছর পুত্রসন্তানের জন্ম দিত, তোর বউও তাই। আর তোর চাচি দিন দিন মুটিয়ে হাতির মতন হচ্ছে আর একপাল মেয়ের জন্ম দিয়েছে আর ছেলে যা একটা হয়েছে, সে বেটা তো নিষ্কর্মা কুঁড়ের বাদশাহ। একে মেয়ে বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমন না হলে আমিও তোর মতন ধন-দৌলতের মালিক বনতে পারতাম। তখন এ সৌভাগ্য আমি একলা ভোগ না করে তোদের নিয়ে ভোগ করতাম। তখন স্বেচ্ছায় আমি সুপাত্রে তোর মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিতাম, সদাগরি আফিসে ভালো বেতনে তোর ছেলের চাকরির বন্দোবস্ত করতাম, খুশি হয়ে তোর জীর্ণ বাড়ি আমি মেরামত করতাম। তোকে, তোর বাপকে, তোর ছেলেমেয়েকে খাইয়ে-দাইয়ে পরম সুখে রাখতাম। আমরা যে এক—একই রক্ত যে আমাদের ধমনিতে বইছে।"

ওয়াঙ শক্ত জওয়াব দেয়, "তুমি জানো, আমি ধনী নই। পাঁচ-পাঁচটা মুখের অন্ন আমাকে জোগাড় করতে হয়। বাবা বুড়োমানুষ; তার কাছে কোনো সাহায্য পাই না, অথচ খাচ্ছে ঠিক। তাছাড়া আর একটা মুখও বাড়ছে বলে।"

তার চাচা খ্যাঁক করে ওঠে : "তুই ধনী নস, এ মিথ্যাকথা। তুই ধনী, নিশ্চয়ই ধনী। জমিদারের জমি তো কিনেছিস, কত টাকা যে এ-জন্য দিয়েছিস, তুই-ই জানিস। গাঁয়ের অন্য কেউ এত টাকা দিতে পারত?"

ওয়াঙ একথায় তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। হাতের নিড়ানিটা ছুড়ে ফেলে সে গর্জে ওঠে, "আমার যদি দুটো পয়সা হয়েই থাকে, সে পয়সা করেছি পরিশ্রম করে আমি আর আমার স্ত্রী। অন্যের মতো আমরা তো জুয়া খেলে বা দোরগোড়ায় বসে গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করি না। অথচ জমিতে তাদের আগাছার জঙ্গল, ছেলেপিলেগুলোর পেটে দানা নেই। এমন অলস আমিরি আমাদের ধাতে সয় না।"

চাচার পীতাভ মুখমণ্ডল লাল হয়ে ওঠে। সে ছুটে এসে ওয়াঙের দুই গালে দুই চড় কষিয়ে দেয়, বলে :

"বেয়াদব কোথাকার! মুরুব্বির মুখের ওপর কথা! নীতি-ধর্ম সব হারিয়েছিস? মুরুব্বি মানিস না! জানিস না, ধর্মগ্রন্থের উপদেশ, মুরুব্বির দোষ ধরতে নেই?"

ওয়াঙ নিজের অপরাধ বুঝতে পেরে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে এই মুরুব্বি চাচাটির বিরুদ্ধে মনে মনে জ্বলতে থাকে।

"তোর কীর্তি-কাণ্ড গাঁয়ের লোকদের বলে দিচ্ছি।" চাচা প্রচণ্ড ক্রোধে চেঁচাতে থাকে। "গতকাল বাড়ি বয়ে কত কথা শুনিয়ে এলি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে রটালি আমার মেয়ে নষ্ট-চরিত্র, আর আজ আমাকে গালমন্দ করলি। অথচ তোর বাবার অনুপস্থিতিতে আমিই হব তোর অভিভাবক। আমার মেয়ে নষ্ট হোক, কেলেঙ্কারি করুক, মুরুব্বির মুখের ওপর অমন কথা বলার সাহস কারো হত না।" চাচা বারবার ভাঙা গলায় শাসায়, "বলে দেব এসব কীর্তি গাঁয়ের লোকদের কাছে।"

"আমাকে এখন কী করতে হবে বলো", ওয়াঙ অগত্যা বলে।

পাছে গাঁয়ের লোকে তার বেআদবির কথা জানতে পারে এই ভয়ে তার অহমিকায় আঘাত লাগে। শত হোক, চাচা তো তার মুরুব্বি; একই রক্ত-মাংসে গড়া তাদের দেহ।

ওয়াঙের কথায় এক লহমায় চাচা যেন ভিন্ন মানুষ হয়ে যায়, তার রাগ পানি হয়ে যায়। ওয়াঙের কাঁধে হাত রেখে সে স্মিতকণ্ঠে মধু ঢেলে বলে, "আহা হা। আমি তোকে চিনি রে, চিনি! এই বুড়ো তোকে ভালো করেই চেনে। তুই আমার সোনার চাঁদ ছেলে। এই বুড়োর হাতে কিছু টাকা দে তো। ধর্ দশটা কি নয়টা রুপোর মুদ্রা। তাহলেই মেয়েটার বিয়ের একটা সুরাহা করতে পারি। তুই খাঁটি কথাই বলেছিস। সোমত্থ মেয়ে। বিয়েটা এখন না দিলেই নয়।" বুড়ো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা দুলিয়ে ভক্তিপূর্ণ চোখে আকাশের পানে তাকায়।

ওয়াঙ নিড়ানিটা মাটি থেকে উঠিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সংক্ষেপে বলে, "বাড়ি এসো। রাজরাজড়ার মতো টাকার থলি তো বয়ে বেড়াই না!" সে দীর্ঘ পদক্ষেপে আগে আগে নীরবে চলে। তিক্ততায় মন তার ভরে ওঠে। যে-টাকা দিয়ে আরও কিছু জমি কেনার পরিকল্পনা ছিল, সে-টাকা তাকে তার চাচার হাতে তুলে দিতে হচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই এ টাকা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে জুয়ার টেবিলে গড়িয়ে পড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

দুমদাম করে বাড়িতে ঢুকে, দোরগোড়ায় ক্রীড়ারত তার দুটো ছেলেকে ধাক্কা দিয়েই সে ঘরে যায়। তার চাচা ভালোমানুষটির মতো ছেলেদুটোকে কাছে ডেকে, তার ছেঁড়া মলিন পোশাকের কোনো নিভৃত গহ্বর থেকে দুটা পেনি বের করে দুই ছেলের হাতে গুঁজে দেয়। তাদের কোলে নিয়ে, তাদের কচি মসৃণ মাংসল দেহ বুকে চেপে ধরে তাদের কোমল ঘাড়ে নাক ডুবিয়ে আদর করে :

"আহ্। কী চমৎকার খুদে দুজন পুরুষ।" বলে দুইজনকে দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরে।

ওয়াঙ দাঁড়ায় না, সোজা শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে। চোখ-ধাঁধানো বাইরের রোদ থেকে ঘরে ঢুকে, ঘরের ভিতরটা অন্ধকার মনে হয়। দেয়ালের একটা ছোট্ট ফাঁক দিয়ে যে-আলোর রেখা ঘরে ঢুকছে, তাতেই যা-কিছু চোখে পড়ে। কাঁচা উষ্ণ রক্তের পরিচিত গন্ধ তার নাকে লাগে। সে তার বউকে প্রশ্ন করে, "কী ব্যাপার? সময় হয়েছে?"

তার বউয়ের ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠ ভেসে আসে। তার কণ্ঠে এমন ক্ষীণতা ওয়াঙ কোনোদিন লক্ষ করেনি। সে চমকে ওঠে। বউ বলে,

"খতমও হয়ে গেছে। একটা হতচ্ছাড়ি মেয়ে—আনন্দ করে বলার মতো খবর নয়।"

ওয়াঙ থ হয়ে দাড়িয়ে থাকে। তার মনে এক অশুভ চেতনার উদয় হয়। মেয়ে! একটা মেয়েই তো তার চাচার বাড়িতে এই অনাসৃষ্টি ঘটিয়েছে। তার নিজের বাড়িতে আবার মেয়ের উপদ্রব!

ওলানের কথায় সাড়া না দিয়ে সে দেয়ালের এবড়োথেবড়ো জায়গাটা হাতড়ে হাতড়ে বের করে। এইখানেই তার গুপ্তধন লুক্কায়িত। সে উপরের ঢেলাটা সরিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে আন্দাজ করে দশটা মুদ্রা গোনে।

"ওখান থেকে টাকা বের করছ কেন?" অন্ধকারে তার বউয়ের প্রশ্ন তীরের মতো ছুটে আসে।

"বিপাকে পড়ে চাচাকে ধার দিতে হচ্ছে।" সে সংক্ষেপে জওয়াব দেয়।

ওলান প্রথমটায় কিছু বলে না। একটু পরে সে তার নির্বিকার গম্ভীর কণ্ঠে বলে :

"ধার কথাটা মুখে বোলো না, ধার বলে কোনো জিনিস সে-বাড়িতে অচল। সে-বাড়িতে শুধু দান করা চলে।"

"তা আমি বেশ জানি।" তিক্তকণ্ঠে ওয়াঙ জওয়াব দেয়। "এ তো টাকা দেওয়া নয়, নিজের মাংস কেটে দেওয়া। তা-ও আবার রক্তের সম্বন্ধ রয়েছে বলে।"

বাইরে এসে চাচার হাতে টাকাগুলো ফেলে দিয়ে সে বুকে তীব্র হিংস্রতা নিয়ে ক্ষিপ্রপদে মাঠে গিয়ে কাজে লাগে। আজ সে মাটির ভিত উপরে ফেলবে। টাকাগুলোর কথা তার মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। সে কল্পনায় দেখতে পায়, তার চাচা অবজ্ঞাভরে টাকাগুলো জুয়োর টেবিলে ঢেলে দিচ্ছে, আর একজন অলস জুয়াড়ি টাকাগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে। তার গায়ের রক্ত পানি-করা টাকা; তার পরিশ্রমলব্ধ সঞ্চয়। ভেবেছিল, এ টাকা দিয়েই সে আরও জমি আনবে তার অধিকারে।

সন্ধ্যার দিকে তার ক্রোধাগ্নি দহনে দহনে নিবে শেষ হয়ে যায়। সে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ায়। তার বাড়ির কথা মনে পড়ে, ক্ষুধার তীব্র অনুভূতি জাগে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে নবাগতা কন্যা-শিশুর কথা। তাহলে তার বাড়িতেও কন্যার আগমন শুরু হল। বুকটা তার ব্যথায় ভারী হয়ে ওঠে। কন্যারা পিতামাতার কোনো কাজেই লাগে না। পরের জন্য তাদের ভরণপোষণ করতে হয়, ঝক্কি-ঝামেলা পোয়াতে হয়। চাচার সঙ্গে রাগ করে, মেয়েটার মুখ দেখার কথাও তার মনে জাগেনি।

দাঁড়িয়ে থেকে তার মন বিষাদক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। এ মওসুমে তার আর পাশের জমিটা কেনা হল না। আবার শস্য উঠলে দেখা যাবে। হয় কি না কে জানে। সংসারে আবার একটা নতুন মুখ বেড়ে গেল। গোধূলির শুক্তি-রঙ ম্লান আকাশের বুকে একঝাঁক কালো কাক কা-কা করে উড়ে যায়। তার চোখের সামনে কাকের

ঝাঁকটা একখণ্ড মেঘের মতো আকাশে তাদের বাড়ির গাছগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। সে নিড়ানি হাতে কাকগুলোকে চেঁচিয়ে তাড়া করে। এরা উড়ে গিয়ে ধীরে ধীরে বৃত্তাকারে ওয়াঙের মাথার উপর ঘুরতে থাকে; কা-কা রবে ওয়াঙকে ব্যঙ্গ করে, তারপর ঘনায়মান অন্ধকার আকাশে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ওয়াঙের কণ্ঠে করুণ কাতরানি বেরিয়ে আসে : "একটা অশুভ লক্ষণ।"

আট

কোনো মানুষের প্রতি উপরওয়ালা একবার অপ্রসন্ন হলে আর বুঝি মুখ তুলে তার পানে তাকায় না। কবে গ্রীষ্মের সমাগমে বৃষ্টিপাতের কথা ছিল; আজ পর্যন্ত একফোঁটা বৃষ্টির দেখা নেই। মেঘহীন নির্মল আকাশ চকচক করছে। শুষ্ক, তৃষ্ণাতুর ধরণীর প্রতি আকাশের নির্মম উপেক্ষা। অস্তোদয় উদয়াস্ত নির্মেঘ আকাশ। নিশীথের আকাশে সোনালি নক্ষত্ররাজির নিষ্ঠুর দীপ্তি।

বেপরোয়া ওয়াঙের বারিধারাবঞ্চিত চষা জমির বুকে ফাটল ধরেছে, বসন্তের স্নিগ্ধ স্পর্শ পেয়ে যে গমের অঙ্কুর সাহসে বুক বেঁধে মাটির স্তর ভেদ করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল, আকাশ-মাটির অনুগ্রহবঞ্চিত হয়ে সে অঙ্কুর রৌদ্রের নিচে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শেষপর্যন্ত শুষ্ক পাণ্ডুর দেহে মাটির গায়ে ঝরে পড়েছে। গেরুয়া মাটিতে বোনা ওয়াঙের ধানক্ষেতের চারাগুলো সবুজ শ্যামল পাতা মেলে ধরেছিল আকাশের পানে। গমের আশা নির্মূল হয়ে যাওয়ার পর ওয়াঙ বাঁশের বাঁকে করে সেই ধানক্ষেতে পানি ঢালল। বাঁক বয়ে বয়ে তার কাঁধে কড়া পড়ে গেল। পিপাসার্ত মাটি সে-পানি অবলীলাক্রমে শুষে নিল। বৃষ্টি আর হল না।

পুকুরের পানি শুকিয়ে কাদা হয়ে গেল, কুয়ার পানিও শুকিয়ে শুকিয়ে এত নিচে নামল যে, ওলান একদিন ভয়ে স্বামীকে বলল, "ছেলেমেয়েদের মুখে পানি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে, ক্ষেতে পানি ঢালা বন্ধ করতে হবে।"

"কিন্তু ক্ষেতে পানি না পড়লে যে তারা না-খেয়ে মরবে।" ওয়াঙ ক্রোধে চেঁচিয়ে ওঠে! কিন্তু এই চিৎকার শেষপর্যন্ত বুকভাঙা কান্নার মতো শোনায়। আসলে মাটির সাথেই তো তাদের জীবন-মরণ জড়িয়ে আছে।

কেবল নতুন-কেনা খালের পাড়ের জমিটায় ফসল ফলে, কারণ সারা গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হল না দেখে ওয়াঙ অন্যান্য জমির আশা ছেড়ে দিয়ে এই লোভী জমিটাতেই দিনমান খাল থেকে পানি এনে ঢেলেছে। জীবনে এই প্রথম ওয়াঙ ফসল-তোলার সাথে সাথে ফসল বেচে ফেলে রুপোর মুদ্রাগুলো যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে সে মুঠোর ভিতর শক্ত করে ধরে। হোক দেবতারা বিরূপ, হোক অনাবৃষ্টি, তার সংকল্প সে পূর্ণ করবেই। সে দেহপাত করেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে এই কয়টা মুদ্রার জন্য। খুশিমাফিক এ মুদ্রা সে খরচ করবে। সে এ মুদ্রাগুলো নিয়ে সোজা হোয়াঙ-মঞ্জিলে যায়। গোমস্তার সাথে দেখা হতেই সে কোনো ভূমিকা না করে সোজা বলে :

"খালের ধারে আমার জমিটার সংলগ্ন জমিটা আমি কিনতে চাই। সঙ্গে টাকা নিয়ে এসেছি।"

ওয়াঙ লোকমুখে শুনেছে যে, হোয়াঙ-পরিবার দুরবস্থার চরমে এসে পৌঁছেছে। বুড়ো বেগম অনেক দিন অবধি তার পূর্ণমাত্রা আফিম পাচ্ছে না, তাই ক্ষুধিত বাঘিনীর মতো ভয়ঙ্করী হয়ে আছেন। রোজ গোমস্তাকে ডেকে পাঠান, গালাগালি করেন। মাঝে মাঝে দু-একটা পাখার ঘা-ও মারেন। বলেন, "বিক্রি করার মতন জমি আর নেই?"

গোমস্তা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। আগে লেনদেনের বেলায় যা উপরি কিছু তার নিজের হাতে আসত, সে পাওনাও সে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করেছে—তবু মনিবদের খাই মেটাতে পারছে না। তার ওপর আর এক উপদ্রব। বুড়ো জমিদারবাড়ির এক দাসী-কন্যাকে অন্তঃপুরে স্থান দিয়েছেন। এই দাসীটিও যৌবনে জমিদারের অনুগ্রহের পাত্রী ছিল। বর্তমানে বাড়ির এক চাকরের বিবাহিতা স্ত্রী। এই ষোড়শী যুবতী দাসী-কন্যা বুড়োর স্থবির দেহে নতুন করে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই জরাজীর্ণ, দুর্বল ক্রমবর্ধমান থলথলে কামাতুর দেহ যে-কোনো ছিপছিপে শিশু-বালিকা, কিশোরী-যুবতীর আসঙ্গলিপ্সায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এ কামনার যেন নিবৃত্তি নেই। তার বেগমের যেমন আফিমের নেশা, তার তেমন নারীর নেশা। তাকে বুঝানো অসম্ভব যে, তার প্রেয়সীদের স্বর্ণালঙ্কার জোগাড় করার মতন সম্বল তাদের আর নেই। যে সারাজীবন হাতটুকু বাড়াবার কষ্ট স্বীকার করেই যতবার খুশি মুঠোভরা টাকা পেয়েছে—'টাকা নেই' একথার গুরুত্ব তো সে উপলব্ধি করতে পারে না।

মা-বাপের এই চালচলন দেখে, জমিদার-পুত্ররা কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে ভাবে : তাদের জীবন আরামে কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট তাদের আছে। তাদের যতসব তম্বিতাম্বা পড়ে এসে গোমস্তার উপর।—এই বেটা জমিদারি ঠিকমতো পরিচালনা করতে পারছে না। এই অবস্থায় পড়ে, গোমস্তার মেদবহুল দেহের চাকচিক্য লোপ পেয়েছে। তার চিন্তা-ভাবনার শেষ নেই; তার দেহ শুকিয়ে চামড়া আলগা হয়ে গেছে।

হোয়াঙ-পরিবারের জমিও অনাবৃষ্টির ফলে আবাদ হয়নি। তাই ওয়াঙের "নগদ-টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছি" বলা মানে বুভুক্ষুকে বলা "আহার্য এনেছি"।

গোমস্তা এ-সুযোগ হাতছাড়া হতে দেয় না। অন্যান্যবারের মতো দরকষাকষি নেই, চা খেয়ে সময় অপহরণ নেই। শুধু দুজনের মধ্যে ব্যাগ্রব্যাকুল দু-চারটি কথার আদান-প্রদান; দলিলে নাম সই, সিলমোহর লাগানো আর টাকার হাতবদল। সংক্ষিপ্ত লেনদেন।

জমির মালিক এখন ওয়াঙ লাঙ। তার রক্ত-মাংস পানি-করা সঞ্চিত অর্থের বিচ্ছেদ-ভাবনা ওয়াঙ আর ভাবে না। এই অর্থে সে তার আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ অর্জন করেছে। অর্থ তার সার্থক হয়েছে। এই অর্থে সে বিপুল পরিমাণ উর্বর ভূমির অধিকারী। এই ভূমিখণ্ড পরিমাণে তার আগের কেনা জমির দ্বিগুণ। কিন্তু এই

বিপুলত্ব আর উর্বরতার চেয়েও বড় কথা হল, এই ভূখণ্ডের প্রাক্তন স্বত্বাধিকারী এক অভিজাত জমিদার। ওয়াঙ এ ভূখণ্ড ক্রয় করে এর স্বত্বাধিকারী হয়েছে। এ জমি কেনার কথা সে কাউকেও বলে না, এমনকি ওলানকেও না।

মাসের পর মাস বৃষ্টির সাথে দেখা নেই। হেমন্ত আসে। খণ্ড খণ্ড হালকা মেঘ আকাশের গায়ে নেহাত অনিচ্ছায় ভেসে বেড়ায়। গাঁয়ের পথে অলস উদ্বিগ্ন চাষিরা জড়ো হয়ে আকাশের পানে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে তাকায়; গভীর অভিনিবেশে মেঘখণ্ডগুলো পর্যবেক্ষণ করে; এই মেঘে বৃষ্টি হবে কি না তাই নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু বর্ষণোপযোগী যথেষ্ট মেঘ-সঞ্চারের পূর্বেই একদিন ঈশানকোণের মরুভূমি থেকে প্রচণ্ড বাতাস এসে, মেঝে ঝাঁট দেওয়ার মতো করে মেঘের টুকরোগুলোকে ঝেঁটিয়ে আকাশ পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। আবার মেঘহীন বন্ধ্যা আকাশ শূন্যদৃষ্টিতে বৃষ্টির কামনায় উন্মুখ পৃথিবীর পানে চেয়ে থাকে। ভোরবেলা পূর্বান্তে সূর্য ওঠে; সারাদিন আপনমনে একলা পথে চলে দিনান্তের প্রান্তে ডুবে যায়। নির্মল রাতের আকাশে চাঁদ ছোট-ছোট সূর্যের মতো প্রখর জোছনাধারা বর্ষণ করে।

জমি থেকে ওয়াঙ লাঙ ফসলের মধ্যে ঘরে আনে সামান্য বিন। যে ধানক্ষেতে ধানের চারা লাগাবার আগেই বৃষ্টির অভাবে হলদে হয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল সেই ক্ষেতে ওয়াঙ মরিয়া হয়ে ভুট্টা লাগিয়েছিল। সেই ভুট্টাক্ষেত থেকে কুড়িয়ে আনে গোটাকয়েক ভুট্টার ছড়া। তা-ও আবার অপুষ্ট। মাড়াইয়ের সময় সে একটা দানাও নষ্ট হতে দেয় না। আঙিনায় বসে বসে পিটিয়ে ভুট্টা তোলার সময় সে তার ছেলেদুটোকে ভুট্টার খোসাগুলো পরীক্ষা করে দেখার জন্য বলে; যাতে সাথে সাথে দানা চলে না যায়। ছেলেদুটো টিপে টিপে দেখে। ওয়াঙ খোসাগুলো জ্বালাবার জন্য আলাদা করে সরিয়ে রাখতেই ওলান বলে :

"না, এগুলো জ্বালিয়ে নষ্ট করব না। আমার মনে পড়ে—তখন আমি খুব ছোট—সানটুঙ-এ ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, তখন আমরা এই খোসা গুঁড়িয়ে খেয়েছি, ঘাস-পাতা খাওয়ার চেয়ে এগুলো খেতে ভালো।"

তার কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে যায়—ছেলেদুটোও। এই অজন্মা যেন ভারি অমঙ্গলের লক্ষণ। সারাটা বাড়ি যেন আতঙ্কে থমথম করে। শুধু কোলের মেয়েটাই নিঃশঙ্ক, তার চাহিদা মেটাবার জন্য প্রচুর আহার্য সঞ্চিত রয়েছে তার মায়ের দুটো পুষ্ট স্তনে। ওলান মেয়েকে স্তন দিতে দিতে বিরক্তির সুরে বলে :

"খেয়ে নে, যতক্ষণ পাচ্ছিস, আফসোস মিটিয়ে খেয়ে নে।"

দুর্দিন যেন এখনো চরমে পৌঁছেনি আর কী! এ অবস্থায় ওলান আবার সন্তানসম্ভবা। তার বুকের দুধ একসময় শুকিয়ে যায়। একটা ক্ষুধার্ত শিশুর অবিশ্রান্ত ক্রন্দনে এই আতঙ্কগ্রস্ত বাড়িটার পরিবেশ আরও ভয়াল হয়ে ওঠে।

কেউ যদি ওয়াঙকে প্রশ্ন করত, "সারা হেমন্তকালটা ছেলেপিলে নিয়ে কী খেয়ে বাঁচলে?" সে জওয়াব দিত, "জানি না, এখান-ওখান থেকে খুঁটে কুড়িয়ে চলেছে।"

কিন্তু তাকে এ প্রশ্ন করার কেউ নেই। সারা অঞ্চলে কেউ কাউকে প্রশ্ন করে না, "কেমন করে দিন চলছে?" সবারই মনে আত্মজিজ্ঞাসা : "আজ আমি কী খাব?" বাপ-মাদের মনে প্রশ্ন : "আজ বাচ্চাদের মুখে কী দেব?"

যতদিন সাধ্য ছিল, ততদিন ওয়াঙ লাঙ তার বলদটার সাধ্যমতোই যত্ন করেছে। যতদিন পাওয়া যেত ততদিন বলদটাকে সে একমুঠো খড় বা কয়েকটা লতাপাতা জোগাড় করে দিয়েছে। শীতের দরুন তা-ও শুকিয়ে ঝরে পড়েছে। অলস কর্মহীন জীবন—চাষবাস নেই; ঘরে বীজ নেই;—বীজ চাষিরা পেটের জ্বালায় খেয়ে ফেলেছে। আর যদিও-বা কেউ বীজ বোনে, সে-বীজ বোনার সাথে সাথে শুকিয়ে যাচ্ছে। বলদটা এখন ছাড়া পেয়ে নিজেই চরে খায়। বড়ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেয় ওটার তদারক করার জন্য, যাতে কেউ চুরি করে না নিয়ে যায়। সে নাকের দড়ি ধরে পিঠে বসে থাকে। দিনকয়েক পর এ-ব্যবস্থাও আর চলে না। কবে হয়তো ছেলেটাকে মেরেধরে গাঁয়ের লোক বা তার পাড়া-প্রতিবেশীরাই বলদটাকে ছিনিয়ে নিয়ে জবাই করে ফেলবে। তাই দোরগোড়ায় বাঁধা থেকে-থেকে বলদটা কঙ্কালসার হয়ে ওঠে।

কিন্তু একদিন এমনি দশা যে, ঘরে না আছে চাল, না আছে গম; থাকার মধ্যে আছে গোটাকয়েক বিন আর কয়েকটা ভুট্টার দানা। পেটের জ্বালায় বলদটাও চিৎকার করে। বুড়ো এ হাল দেখে প্রস্তাব করে :

"এবার বলদটাই জবাই করে খাওয়া হোক।"

ওয়াঙ আর্তনাদ করে ওঠে। এ যেন মানুষ জবাই করে খাওয়ার প্রস্তাব। বলদটা তার কৃষিজীবনের আজীবন সাথী। সে ওটাকে কখনও আদর করেছে; বিরক্তিতে কখনও-বা গালাগালি দিয়েছে। ওটা তারই সঙ্গে মাঠে গেছে, মাঠ থেকে ফিরেছে। তার যৌবনের প্রথম সে একটা বাছুর কিনেছিল; সেই বাছুরটাই বলদ হয়েছে—সে আপত্তি করে :

"বলদটা খাব কেমন করে? আবার আমরা চাষবাসই-বা করব কাকে দিয়ে?"

তার বাপ শান্তকণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"তোমার প্রাণটা বড় না বলদের প্রাণটা বড়? তোমার ছেলেদের প্রাণ বাঁচাবে, না এই জানোয়ারটার? জীবন গেলে জীবন পাবে না, কিন্তু বলদটা গেলে আর একটা বলদ কেনা কঠিন হবে না।"

তবুও ওয়াঙ কিছুতেই সেদিন বলদটা জবাই করতে দেয় না। এমনি করে একদিন যায়, দুদিন যায়, ক্ষুধার্ত ছেলেরা কাঁদে, সান্ত্বনা দিয়ে তাদের কান্না আর থামানো যায় না। ওলান ছেলেদের হয়ে মিনতি-ভরা চোখে ওয়াঙের পানে তাকায়। এ দৃষ্টির মর্ম ওয়াঙ বুঝে। তার সঙ্কল্পের ভিত নড়ে যায়। তাহলে শেষপর্যন্ত বলদটাকে আর রাখা গেল না। সে রুক্ষকণ্ঠে সম্মতি দেয়, "বলদটাকে জবাই করতে চাও করো, কিন্তু আমার হাতে এ কাজ হবে না।"

এই বলে সে ত্রস্তপদে ঘরে গিয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। মরণযাত্রীর শেষ করুণ-আহ্বান যেন তার কানে না পৌঁছায়।

ওলান রান্নাঘর থেকে ছোরাটা নিয়ে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে আসে। জানোয়ারের গলায় একটা জোর কোপ বসিয়ে দেয়। ওর দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একটা গামলাতে বলদের দেহের রক্তটুকু ওলান রেখে দেয়, পুডিং-এর সাথে তারা খাবে বলে। সে চামড়াটা ছাড়িয়ে বলদের বিরাট দেহটা টুকরো টুকরো করে কাটে।

রান্না-করা গোশ্‌ত খাবার টেবিলে দেওয়ার আগে ওয়াঙ ঘর থেকে বেরুতে পারে না। একটুকরো গোশ্‌ত মুখে দিতেই তার বমি হওয়ার উপক্রম হয়—চোখ বুজে সামান্য পরিমাণ সুরুয়া খেল সে। ওলান সান্ত্বনার সুরে বলে :

"আসলে একটা বলদ বৈ তো নয়। এটা তো বুড়িয়েই গেছল। খেয়ে নাও তো! দুঃখ কোরো না। সুদিন হলে, আর একটা—এর চেয়েও ভালো বলদ কিনব।"

এই সান্ত্বনার বাণীতে ওয়াঙের দুঃখ কতকটা লাঘব হয়। শেষপর্যন্ত সবার সাথে একটু একটু করে সে গোশ্‌তও খায়।

শেষটায় বলদের গোশ্‌ত ফুরিয়ে যায়; হাড়গুলোও মজ্জার জন্যে চিবিয়ে চিবিয়ে শেষ করে। বাকি শুধু চামড়াটা। ওলান চামড়াটা শুকিয়ে নেয়।

প্রথমদিকে ওয়াঙের বিরুদ্ধে গাঁয়ের লোকদের একটা বিদ্বেষভাব ছিল। তাদের ধারণা ছিল, সে অঢেল টাকার মালিক হয়ে বসে আছে। লোকে জানবে এই ভয়ে টাকা খাদ্যসামগ্রী লুকিয়ে রেখেছে। তার চাচার ঘরে সবার আগেই দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়েছিলে। সে, তার স্ত্রী আর সাত-সাতটি অভুক্ত সন্তান। সে একদিন ওয়াঙের সামনে এসে হাত পাতে। ওয়াঙ বাধ্য হয়ে তার চাচার ছিন্ন কাপড়ের আঁচলে সামান্য বিন আর কিছু গম ঢেলে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দেয় :

"এর বেশি দেবার ক্ষমতা আমার নেই।"

তার চাচা আর একদিন এসে হাত পাততে ওয়াঙ তাকে খালিহাতে ফিরিয়ে দিয়ে শুনিয়ে দেয় :

"মুরুব্বিদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে আমার বাড়ির প্রাণীদের পেট ভরবে না।"

সেদিন থেকে সে পদাঘাতে বিতাড়িত কুকুরের মতন তার পিছনে লাগে। গায়ে তার নামে মিথ্যাকথা রটিয়ে বেড়াতে থাকে :

"আরে! আমার ভাইপোর কথা বলছ? তার টাকা আর খাবার অঢেল; কিন্তু কাউকে দেবে না। আমাকে আর আমার পরিবারের লোকজনদেরও না। অথচ, আমরা তো তারই আপনজন—এক বংশের লোক। অনাহারে মরা ছাড়া আমাদের উপায় কী!"

গাঁয়ের প্রতিটি ঘরে অভাব অনটন। নগদ পয়সা যৎসামান্য যা ছিল তা-ও ফুরিয়ে গেছে খোরাকি কিনে। এদিকে আবার কনকনে শীতের হাওয়া বইছে। শাণিত ছুরির মতন ধারালো এর তীব্রতা। একদিকে সপরিবারে তারা ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে, অন্যদিকে শীতের নিষ্ঠুর তীব্রতায় ভুগছে। এই অসহ্য যন্ত্রণায়

মরিয়া হয়ে ওঠে গেঁয়ো চাষার দল। তাদের উস্কানি দেয় ওয়াঙের চাচা। সে অনাহারক্লিষ্ট কুকুরের মতন শীতে কাঁপে আর পথে পথে বলে যায় :

"গাঁয়ে এমন লোকও আছে, যার ঘরে লুক্কায়িত রয়েছে প্রচুর খাদ্যশস্য—যার সন্তানেরা এখনও মোটা হচ্ছে।"

তার কথা শুনে একরাতে লম্বা লাঠি হাতে নিয়ে গায়ের বুভুক্ষু বেপরোয়া চাষিরা ওয়াঙের বাড়ি হামলা করে। পাড়া-প্রতিবেশীদের কণ্ঠস্বর শুনে দরজা খুলে দিতেই, তারা হিংস্র পশুর মতন ওয়াঙের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে ঠেলে দরজার বাইরে বের করে দেয়—তার ভীত-সন্ত্রস্ত ছেলেদের ছুড়ে বাইরে ফেলে। এবার তারা লুক্কায়িত খাদ্যশস্যের সন্ধানে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে সারাবাড়িটা তছনছ করে। অনেকক্ষণ অনুসন্ধানের পর তারা আবিষ্কার করে ওয়াঙের শস্যভাণ্ডার—কয়েকটা শুকনো বিন আর মুঠোখানেক গম। আশাভঙ্গের দুঃখে তারা হুঙ্কার ছাড়ে। তারা আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। সর্বনাশা উন্মত্ততা জেগেছে আজ তাদের মনে। তারা বাড়ির আসবাবপত্র সব টেনে হিঁচড়ে একত্র জড়ো করে। এমনকি সন্ত্রস্ত রোরুদ্যমান বুড়োর তক্তপোশটাও বাদ দেয় না।

ওলান এসে সামনে দাঁড়ায়। তার সহজ মন্থর কণ্ঠধ্বনিতে চাষিদের উন্মত্ত চিৎকার ডুবে যায় :

"সাবধান। ওটি হচ্ছে না। আমাদের বাড়ি থেকে টেবিল, বেঞ্চ বা তক্তপোশ কেড়ে নেবার সময় এখনও হয়নি। আমাদের খাদ্যশস্য যা নেবার তা নিয়েছ। তোমাদের নিজেদের টেবিল বেঞ্চ এখনও বেচে খাওনি, আমাদের আসবাবপত্র রেখে যাও। নিজেদেরগুলো আগে বেচে আমাদেরগুলো নিতে এসো। এখন আমরা সবাই একপর্যায়ে আছি। তোমাদের চেয়ে এখন আমাদের এককণা শস্যও বেশি নেই। না, তোমাদের ঘরে বরং বেশি আছে; কারণ আমাদের যা ছিল, সব তোমরা কেড়ে নিয়েছ। আর বেশি নিলে তোমাদের ওপর উপরওয়ালার অভিসম্পাত পড়বে। এবার সবাই মিলে এসো একসাথে বেড়িয়ে পড়ি ঘাস-পাতা আর গাছের বাকলের সন্ধানে। তোমরা তোমাদের সন্তানদের খাওয়াবে পরাবে আর আমরা আমাদের এই তিনটি আর গর্ভস্থ চতুর্থটিকে খাওয়াব পরাব।"

কথাগুলো শেষ করার সময় সে পেটে হাত বুলোয়। তার কথায় আর ব্যবহারে হানাদারেরা লজ্জা পেয়ে একে একে বেরিয়ে যায়। মূলত তারা লোক মন্দ নয়, ক্ষুধার তাড়নায়ই এমন পাশবিক হয়ে উঠেছে।

একজন কিন্তু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। সে চিঙ। ছোটখাটো স্বল্পবাক পাতবনের মানুষটি। মুখের আদল বানরের; চোখ কোটরাগত, গাল চোপসানো, মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। সে অনুতপ্ত, সৎলোক। ক্ষুধার্ত ছেলের ক্রন্দন তাকে এই কুপথে নামিয়েছে। তার লুক্কায়িত রয়েছে একমুঠো বিন। সে এ সম্পদ এ-বাড়ির শস্যভাণ্ডার থেকেই লুণ্ঠন করেছে। কিছু বলতে গেলে এ সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে

বলে ভয়ে সে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। সে বেদনার্ত অনুতপ্ত চোখে ওয়াঙের পানে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়।

ওয়াঙ আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকে। এই আঙিনায় সে বছরের পর বছর ফসল মাড়াই করে গোলায় তুলেছে। ফসল নেই তাই আঙিনাও অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বাড়িতে বুড়ো বাপ আর ছেলেমেয়েদের মুখে তুলে দেবার মতন এককণা শস্য নেই। তাছাড়া রয়েছে ওলান—তার জীবনসঙ্গিনী, তাকে আপন দেহ পুষ্ট রাখা ছাড়াও দেহান্তর্লীন অনাগত সম্ভাবনাটুকুকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। জীবধর্মের নিষ্ঠুর নিয়মে এই ভ্রূণ তার মায়ের রক্ত-মাংস থেকে গোপনে জীবরস শোষণ করছে। সহসা ওয়াঙের মন শঙ্কিত হয়ে ওঠে, কিন্তু পরক্ষণে তার ধমনিতে বয়ে যায় সান্ত্বনার স্নিগ্ধ কোমল ধারা। সে আপন মনে বলে ওঠে :

"সব হারাতে পারি কিন্তু আমার মাটি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমার দেহের শ্রম আর মাটির ফল আমি মাটিতেই গচ্ছিত রেখেছি। নগদ টাকা থাকলে তারা ছিনিয়ে নিয়ে যেত। অর্থের বিনিময়ে আর কিছু ঘরে রেখে দিলে, তারা তা-ও নিত। আমার মাটি অক্ষয়। এ মাটি আমার।"

নয়

দোরগোড়ায় বসে ওয়াঙ আপন মনে ভাবে, এবার কিছু একটা করতেই হবে। শূন্য বাড়িতে অনাহারে পড়ে সে তিলে তিলে মরতে পারে না। ক্ষুধার জ্বালায় তার কটিবন্ধ কষে আঁটা। তার কঙ্কালদেহে বেঁচে থাকার দুর্বার সংকল্প, মানবজীবনের পূর্ণ পরিণতির পথে এমনি করে নির্বোধ ভাগ্যের খামখেয়ালির কাছে আত্মসমর্পণ করে সে তার অমূল্য জীবন হারাতে পারে না। মাঝে মাঝে অব্যক্ত ক্রোধে সে ঘর থেকে শূন্য আঙিনায় ছুটে যায়; বজ্রমুষ্টি নির্মম নির্মেষ অগ্নিঝরা নীল আকাশের পানে তুলে উন্মাদের মতন চেঁচিয়ে ওঠে :

"তুমি বুড়ো বড্ড শয়তান। মাথার উপরে বসে শয়তানি করছ।"

এমন কথা বলায় পাতক হয়েছে, এ ভয়ে বুক হয়তো তার কেঁপে ওঠে। কিন্তু এ ভয় ক্ষণিক। একমুহূর্ত পরেই সে ক্রোধদীপ্ত কণ্ঠে বলে : "যা অবস্থা হয়েছে, এর বেশি আর কী হবে।"

একদিন অনাহারক্লিষ্ট দুর্বলদেহে পা টেনে টেনে সে ক্ষেত্র-দেবতার মন্দিরে যায়। এমন দুর্দিনে উদাস নির্বিকার দেবতা আপন দেবীর দেহলগ্ন হয়ে বসে আছে। সজ্ঞানে সে দেবতার গায়ে থুতু দেয়। এ যুগলমূর্তির সামনে আজ ধূপকাঠি জ্বলে না; বহুদিন থেকে কেউ এখানে ধূপকাঠি জ্বালাতে আসেনি। কাগজের দেহাবরণ ছিঁড়ে গেছে, অনাবৃত হয়ে পড়েছে তাদের মাটির দেহ। ভক্তদের এই দুর্দশায়ও তারা অচঞ্চল। ক্রোধে সে দেবতার পানে চেয়ে দাঁত কটমট করে। তারপর ধীরে ধীরে গোঙাতে গোঙাতে বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

আজকাল তারা কেউ বড় একটা বিছানা ছেড়ে ওঠে না। প্রয়োজনও নেই। বিকারগ্রস্ত নিদ্রা সাময়িকভাবে অন্তত তাদের অনশনের ক্লেশ ভুলিয়ে রাখে। ভুট্টার শুকনো খোসাগুলো নিঃশেষ করে তারা গাছের বাকল পর্যন্ত সাবাড় করে ফেলেছে। শীতে বৃক্ষ পত্রহীন; পাহাড়ে যা-কিছু ঘাস-পাতা পাওয়া যায় তাই এখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের একমাত্র আহার্য। একটা জানোয়ার পর্যন্ত চোখে পড়ে না। দিনকয়েক হেঁটেও গরু, গাধা, অন্য জানোয়ার বা হাঁস-মুরগির দেখা কোথাও মিলবে না।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পেট বাতাসে ফুলে উঠে; গাঁয়ের পথে তারা ছুটে বেড়ায় না। ওয়াঙের দুটো ছেলে কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার সামনে নিষ্ঠুর সূর্যের তাপে এসে বসে। তাদের গোলগাল মাংসল দেহ কঙ্কালসার হয়ে গেছে; ছেঁড়া কাঁথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকে।

কোনো নালিশ নেই মেয়েটার। প্রথমদিকে তারা ক্ষুধার তাড়নায় অবিরাম চিৎকারে সারা বাড়িটা তোলপাড় করে রাখত; কিন্তু এখন সে শান্ত হয়ে গেছে, যা পায় তাই চোষে; কাঁদে না। সে তার শীর্ণ তোবড়ানো ছোট মুখখানা বের করে সবার পানে চেয়ে থাকে। সে মুখে দন্তহীন বুড়ির মতন শুকনো বিশীর্ণ ঠোঁট, কোটরাগত কালো দুটো চোখ। এই ক্ষুদ্রপ্রাণের বেঁচে থাকার নিত্য সংগ্রাম বাপের স্নেহ আকর্ষণ করে। সে সাধারণ মেয়ের মতন স্বাস্থ্যবতী আর প্রফুল্লচিত্ত হলে, মেয়ে বলে বাপ হয়তো তাকে অবহেলা করত, এখন মাঝে মাঝে বাপ মেয়েটার পানে চেয়ে ওকে আদর-সোহাগ করে।

একদিন মেয়েটা তার দন্তহীন মাড়ি বিস্ফারিত করে ম্লান হাসি হাসতেই ওয়াঙের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। সে মেয়েটার শীর্ণ হাতখানি তার কঙ্কালময় হাতে তুলে নেয়। এরপর থেকেই সে উলঙ্গ মেয়েটাকে মাঝে মাঝে কোলে নিয়ে তার কোটের ঈষৎ উষ্ণতায় ঢেকে দেয়; আপন দেহে জড়িয়ে ধরে দোরগোড়ায় বসে শুকনো বিস্তৃত মাঠের পানে চেয়ে থাকে।

বুড়োই বাড়িতে সবার চেয়ে ভালো আছে। বাড়িতে আহার্য জুটলেই, তাকে প্রথম দেওয়া হয়। তারপর ছেলেদের অধিকার। ওয়াঙের গর্ব, কেউ বলতে পারবে না মৃত্যুমুহূর্তেও সে বাপকে অনাদর করছে। নিজেদের দেহের গোশ্‌ত্‌ কেটেও সে বাপকে খাওয়াবে। বাপকে সে অনাহারে রাখবে না। বুড়ো দিনরাত পড়ে পড়ে ঘুমোয় আর যা পায় তাই খায়। হামাগুড়ি দিয়ে আঙিনায় গিয়ে গায় রোদ লাগাবার মতন দৈহিক শক্তি তার এখনও আছে। বাড়ির সবাই'র মধ্যে তার মনেই স্ফূর্তি আছে। ফাটা বাঁশে বাতাস লাগলে যেমন কাঁপা আওয়াজ হয় একদিন বুড়ো তেমনি কাঁপাকণ্ঠে বলে :

"এর চেয়েও আকাল দেখেছি—এর চেয়েও। আমি বাপ-মাকে পেটের জ্বালায় সন্তান কামড়ে খেতে দেখেছি।"

"এমন রাক্ষুসে কাণ্ড এ বাড়িতে হবে না।" ওয়াঙ আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে।

একদিন প্রতিবেশী চিঙ এসে উপস্থিত। শুকিয়ে তার শরীর ছায়ার চেয়েও ক্ষীণ হয়ে গেছে। মাটির মতন বিবর্ণ হয়ে গেছে তার শুকনো ঠোঁট! সে ওয়াঙের কানে কানে বলে :

"শহরের লোকেরা কুকুর বিড়াল যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। আমরাও এদিকে হালের গরু, ঘাস-পাতা এমনকি গাছের ছাল পর্যন্ত খেয়ে সাবাড় করে ফেলেছি। খাবার মতন আর কী রইল?"

ওয়াঙ নিদারুণ নৈরাশ্যে মাথা নাড়ে। তার কোলে রয়েছে তার মেয়ের ক্ষীণ কঙ্কালসার দেহ। সে মাথা নিচু করে মেয়েটার শীর্ণ মুখ আর তীক্ষ্ণ করুণ মুখের পানে তাকায়। মেয়েটাও তার পানে পলকহীন চোখে চেয়ে আছে। তার চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠেই চকিতে মিলিয়ে যায়। এই হাসি ওয়াঙের বুক ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

চিঙ আরও এগিয়ে আসে।

"আমাদের গাঁয়েও কেউ কেউ মানুষের মাংস খাচ্ছে।" সে ফিসফিস করে বলে যায়। "তোমার চাচা-চাচিও নাকি! তা না হলে তারা বাঁচছে কেমন করে? ঘুরে বেড়াবার মতন শক্তিই-বা দেহে পাচ্ছে কোত্থেকে। সবাই তো জানে, দুবেলা খাবার তাদের কোনোকালেই জুটত না।" কথা বলতে বলতে আরও এগিয়ে আসতেই ওয়াঙ চিঙের মূর্ত-মৃত্যু মাথাটার ভয়ে পিছিয়ে আসে! চিঙের চোখদুটোও বীভৎস। এক অজানা শঙ্কায় ওয়াঙের বুক কেঁপে উঠে। সে হঠাৎ উঠে পড়ে। ভীতকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে :

"আমরা এ গাঁ ছেড়ে দক্ষিণদেশে চলে যাব। এ অঞ্চলে সবাই দুর্ভিক্ষপীড়িত, সবাই উপোসী। প্রভু যত শয়তানই হোক, হ্যানের বংশধরকে নিশ্চিহ্ন নির্বংশ করবেন না।"

চিঙ বিষণ্ণকণ্ঠে বলে, "তুমি তরুণ। আমি আর আমার স্ত্রী দুজনই বুড়ো হয়েছি। আছে মাত্র একটা মেয়ে। জীবনের সাধও আমাদের মিটেছে। সুতরাং মরণে আমাদের দুঃখ নেই।"

"তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবান। আমার বুড়ো বাপ আছে, স্ত্রী আছে, আর তিনটে শিশু আছে। আর একটাও শিগগিরই আসছে। এতগুলো মুখের আহার জোগাতে হয় আমাকে। আমাদের যেতেই হবে, নইলে কবে নিজেদের স্বভাব ভুলে গিয়ে বুনো কুকুরের মতন একে অন্যকে কামড়ে খাব।"

সহসা তার মনে হয়, সে সত্যিকথাই বলেছে। সে ওলানকে ডাক দেয়। হাঁড়ি চড়ার মতন শস্যকণা ঘরে নেই, উনুনে দেবার মতন কাঠখড়িও নেই। তাই ওলান আজকাল নীরবে বিছানায় পড়ে থাকে।

"এসো আমরা দক্ষিণদেশে চলে যাই", সে ওলানকে বলে।

তার কণ্ঠস্বরে এমন খুশির আমেজ অনেকদিন ফোটেনি। ছেলেরা তার পানে চোখ তুলে তাকায়। বুড়ো পর্যন্ত হামা দিয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ওলান

অতিকষ্টে শয্যাত্যাগ করে, দুয়ারের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে বলে : "তাই ভালো, অন্তত চলে ফিরে মরতেও পারবে।"

ওলানের গর্ভস্থ সন্তানটা একটা গ্রন্থিল ফলের মতন ঝুলছে। তার মুখে মাংসের লেশ নেই; মুখের হাড়গুলো পাহাড়ের চূড়ার মতন উঁচিয়ে আছে। "কাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা করো", ওলান আবার বলে। "কাল পর্যন্ত পেটটা খালাস হয়ে যাবে, নড়াচড়া দেখে তাই মনে হচ্ছে।"

"তা হলে, কালই যাব", বলে ওয়াঙ বউয়ের মুখের পানে তাকায়। বিবর্ণ পাণ্ডুর শুকনো মুখখানা তার বুকে ব্যথা-করুণায় ভরে ওঠে। বেচারা আবার একটা বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে।

"তুমি যে এই অবস্থায় কেমন করে চলবে, তাই ভাবি!" সে ওলানকে বলে।

চিঙ তখনও দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ওয়াঙ চিঙকে বলে—বলতে তার মন চায় না—"তোমার বাড়িতে যদি সামান্য শস্যকণাও থাকে তা দিয়ে আমার বউয়ের জানটা বাঁচাও। এই ভালোমানুষিটুকু করো। তুমি যে আমার বাড়িতে ডাকাতি করতে এসেছিলে, সে কথা আমি ভুলে যাব।"

লজ্জিত চিঙ বিনয়নম্র কণ্ঠে বলে :

"সেই কলঙ্কজনক ঘটনার পর থেকে তোমার কথা মনে হলেই আমি শান্তি পাই না। তোমার চাচা-কুকুরটাই তো আমাকে এই বলে লোভ দেখাল যে, তোমার বাড়িতে শস্যভাণ্ডার লুকানো আছে। এই আকাশের দিব্যি, আমার বাড়িতে দরজার পাশে সামান্য কয়েকটা শুকনো লাল বিন পাথর-চাপা দিয়ে পুঁতে রেখেছি—ভেবেছিলাম মৃত্যুমুহূর্তে এগুলো মুখে দেব, যাতে শূন্য পেটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে না হয়। এ থেকে গোটাকয় তোমাকে দিয়ে দেব। কালই কিন্তু দক্ষিণদেশের দিকে বেরিয়ে পড়ো। আমি এখানেই আমার বাড়ি আঁকড়ে পড়ে থাকব। পুত্রসন্তানহীন বুড়ো আমি। আমার পক্ষে জীবন-মরণ দুই সমান।"

এই বলে চিঙ চলে যায়। অল্পক্ষণ পরেই মাটিমাখা দুইমুঠো শুকনো বিন রুমালে বেঁধে নিয়ে আসে। খাবার দেখে ছেলেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে; বুড়োর চোখও চিকচিক করে ওঠে। ওয়াঙ তাদের সরিয়ে দিয়ে বিনগুলো তার শায়িতা স্ত্রীর কাছে নিয়ে যায়। সে অনিচ্ছায় গোটাকয়েক বিন চিবিয়ে খায়। না-খেয়ে উপায় নেই। সে জানে তার প্রসবক্ষণ আগত প্রায়। উপোসী দেহে যন্ত্রণার তীব্রতা সে সহ্য করতে পারবে না।

মাত্র কয়েকটা বিন ওয়াঙ আপন মুঠোতে লুকিয়ে রাখে। সে একটা একটা করে এগুলো মুখে পুরে চিবিয়ে নরম মণ্ডে পরিণত করে। তারপর মেয়ের কচি ঠোঁটে ঠোঁট রেখে, মণ্ডটুকু মেয়ের মুখে পুরে দেয়। মেয়েটা আস্তে আস্তে মুখ নাড়ে। ওয়াঙ আহারের তৃপ্তি অনুভব করে।

রাতটা ওয়াঙ মাঝের ঘরে থাকে। ছেলেদুটো তাদের দাদুর ঘরে আর তৃতীয়টা ওলানের আঁতুড়ে ঘরে। প্রথম সন্তান প্রসবের বেলায় সে যেমনভাবে ছিল, আজও সে তেমনি উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এই দুঃসময়ের ওলান তার প্রসব-মুহূর্তে কাছে

থাকতে দেবে না। প্রসব-মুহূর্তে সে একলা থাকবে, পুরনো গামলাটায় বসে সে সন্তান প্রসব করবে। পশু যেমন শাবকের দেহ চেটে প্রসবের চিহ্ন মুছে নিঃশেষ করে দেয়, সেও তেমনি ঘরময় হামাগুড়ি দিয়ে ধুয়ে মুছে ঘর থেকে প্রসবের চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

ওয়াঙ তার অতিপরিচিত তীব্র কান্নাধ্বনি শোনার জন্য কান পেতে থাকে। নিরানন্দ নৈরাশ্যভরা এ প্রতীক্ষা। ছেলেমেয়ের প্রশ্ন এখন অর্থহীন। সংসারের বোঝা বাড়ে বৈ তো নয়।

"মরা সন্তান হলেই রক্ষা হয়"—সে আপন মনে বিড়বিড় করে।

সেই মুহূর্তে একটা ক্ষীণ কান্না তার কানে ভেসে আসে। কী ক্ষীণ এ কান্নার আওয়াজ! রেশ তার নৈঃশব্দের বুকে তরঙ্গায়িত হয়ে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। "না, সংসার থেকে দয়ামায়ার অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেছে। অকরুণ সংসার!" ওয়াঙ তিক্তকণ্ঠে কথাটা শেষ করে আবার কান পাতে।

আর কান্না শোনা যায় না। বাড়ির স্তব্ধতা দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। বহুদিন থেকে সর্বত্র স্তব্ধতা বিরাজ করছে। কর্মহীন স্তব্ধতা। ঘরে ঘরে মৃত্যুযাত্রীর করুণ স্তব্ধতা, এ বাড়িটাও তাই। এই নিষ্ঠুর নৈঃশব্দ ওয়াঙের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে; তার মনে জাগে আতঙ্ক। সে ওঠে, ওলানের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে ডাকে। নিজের কণ্ঠস্বরে নিজের বুকে যেন সাহস আসে, সে ডাকে :

"তোমার বিপদ কেটে গেছে তো?" বলেই সে উত্তরের প্রতীক্ষা করে, যদি তাকে বাইরে রেখেই ওলান মরে পড়ে থাকে।

যাক, ভিতরে খস্‌খস্‌ আওয়াজ শোনা যায়। ওলান নড়াচড়া করছে। বাঁচা গেল। দীর্ঘনিশ্বাসের মতন বিষাদ-করুণ কণ্ঠে ওলান জওয়াব দেয় :

"ভিতরে এসো!"

ওয়াঙ ভিতরে যায়। ওলান বিছানার সাথে মিশে একা শুয়ে আছে। পাশে সদ্যোজাত শিশু নেই।

"বাচ্চা কোথায়?" সে প্রশ্ন করে।

ওলান দুর্বল হস্তসঞ্চালনে ইঙ্গিত করে। মেঝেতে শিশুর দেহটা পড়ে আছে।

"মরে গেছে?" চেঁচিয়ে ওঠে ওয়াঙ।

"হ্যাঁ মরে গেছে।" অনুচ্চকণ্ঠে জওয়াব দেয় ওলান।

ওয়াঙ নিচু হয়ে শিশুর একমুঠো দেহটা পরীক্ষা করে। অস্থিচর্মসার দেহ—একটা মেয়ে। তার বলতে ইচ্ছা হয়, "আমি যে কান্না শুনতে পেলাম।" কিন্তু সে ওলানের মুখের পানে তাকায়। সে চোখ বুজে পড়ে আছে, তার গায়ের রঙ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ; খোঁচা খোঁচা হাড় বেরিয়ে আছে চামড়ার তলা থেকে। অবসন্নদেহে স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। কী যন্ত্রণাই-না বেচারা সহ্য করেছে। ওয়াঙ আর কিছু বলতে পারে না। সে নিজে তো এ কয়মাস নিজের দেহের ভারই বহন করেছে, কিন্তু ওলান তো এই বোঝাটাও বয়ে বেড়িয়েছে। অনাহারে কী যন্ত্রণাই

ভোগ করেছে বেচারা ওলান। আর এই উপোসী ভ্রূণটা পেটের জ্বালায় তাকে খেয়েছে—বেঁচে থাকার নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষায়।

ওয়াঙ নীরবে মরা শিশুটাকে পাশের ঘরে নিয়ে একটা ছেঁড়া মাদুরে জড়িয়ে নেয়। শিশুর গোলাকার মাথাটা এদিক-ওদিক এলিয়ে পড়ে। ওয়াঙের চোখে পড়ে, শিশুর গলায় দুটো কালো থেঁতলানো দাগ। জড়ানো মাদুরটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। দূরে যাওয়ার সামর্থ্য তার নেই। এক জায়গায় একটা পুরনো কবরের গর্তে দেহের বোঝাটাকে সে নামিয়ে দেয়। এই গোরস্তানে অনেক অজানা অবহেলিত কবর রয়েছে। মরা শিশুটাকে কবরে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই একটা উপোসী বাঘা কুকুর তার পিছনে এসে ওঁৎ পেতে দাঁড়ায়। কুকুরটা এমনি ক্ষুধিত যে, সে একটা প্রস্তরখণ্ড কুকুরটার গায়ে ছুড়ে মারলেও কুকুরটা দূরে সরে না। ওয়াঙের পা দুটো দেহের ভার বইতে না পেরে ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসে। সে দু'হাতে মুখ ঢেকে বাড়ির দিকে রওনা হয়।

"ভালোই হল।" আপন মনে ওয়াঙ বিড়বিড় করে। এই প্রথম সে নৈরাশ্যে একেবারে ভেঙে পড়ে।

পরদিন সকালে নীলের পালিশ দেওয়া আকাশে নিয়মিত সূর্য ওঠে। বাড়িঘর ছেড়ে এই অসহায় ছেলেমেয়ে হৃত-শক্তি স্ত্রী আর অক্ষম-বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ার ভাবনা তার কাছে স্বপ্নের মতো অলীক মনে হয়। এই নির্জীব শক্তিহীন মানুষগুলো একশো মাইল দূরের পথ পেরিয়ে সেই প্রাচুর্যের দেশে যাবে কেমন করে? আর কে জানে, সেদেশেও আহার মিলবে কিনা? সেখানেও তো অনাবৃষ্টির দরুন দুর্ভিক্ষ থাকতে পারে! দেহের অবশিষ্ট শক্তি নিঃশেষ করে গিয়ে হয়তো দেখবে সেখানেও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীর মিছিল চলছে। অজানা অচেনা দেশ। না, এই বাড়িতে থেকে আপন বিছানায় শুয়ে মরা তার চেয়ে অনেক ভালো। দাওয়ায় বসে ওয়াঙ নিরাশাচ্ছন্ন অন্তরে ভাবে আর শুকনো কঠিন মাঠের পানে চোখ মেলে তাকায়। খাদ্য বলে যা-কিছু মুখে দেওয়া যায়, তার এককণাও নেই কোথাও। খুঁটে খুঁটে সাফ করে দিয়েছে সবাই মিলে।

হাত শূন্য। বহু আগে শেষ কপর্দকটি বেরিয়ে গেছে। পয়সা দিয়েই-বা কী হবে? আহার্য কিনবে কোত্থেকে? আগে সে শুনেছে, শহরের ধনী লোকেরা নিজেদের জন্য এবং মুনাফার লোভে শস্য মজুদ করে রাখে। এসব কথায় আগে তার রাগ হত; এখন হয় না। বিনাপয়সায় পেট ভরে খাবার লোভেও সে এখন এই দুর্বলদেহে শহরে যেতে পারবে না। তাছাড়া ক্ষুধার অনুভূতিও এখন আর নেই।

প্রথমদিকে ক্ষুধার জ্বালায় পেট চোঁ চোঁ করত। সে অবস্থা বহুদিন পার হয়ে গেছে। এখনও তো নিজের ক্ষেত থেকে একটু মাটি এনে পানির সাথে গুলে ছেলেদের মুখে দিতে পারা যায়। সে নিজে অবশ্য নির্লোভ। এ কয়দিন ধরে ছেলেরা তো তাই খাচ্ছে। তাই তো মাটি করুণাময়ী ধরিত্রী। কতকটা পুষ্টিকর গুণ আছে এ মাটিতে, কিন্তু শেষপর্যন্ত এ পুষ্টি মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

তবে শূন্য পেটে কিছু পড়ে। ওলানের মুষ্টিবদ্ধ বিন কয়টায় সে কিছুতেই হাত দেবে না। বহুক্ষণ পরে ওলান যে একটা একটা দানা করে চিবোয় এই শব্দ শুনেই সে মৃদু আরাম অনুভব করে।

ওয়াঙ ভবিষ্যতে সুখের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে আপনশয্যায় শুয়ে সুপ্তির পথে মরণ-বরণের স্বপ্নসুখ উপভোগ করছে, এমন সময় সে দেখে কারা যেন মাঠ পেরিয়ে আসছে। সে দাওয়ায় বসে তাদের আগমন-প্রতীক্ষা করে। কাছে আসতেই সে আগন্তুকদের একজনকে চিনতে পারে। সে তার চাচা। চাচার সাথে আরও তিনজন অচেনা লোক।

তার চাচা আনন্দের ভান করে চিৎকার করে বলে, "কতদিন তোদের দেখিনি।" এগিয়ে আসতে আসতে বলে, "বেশ আছিস তাহলে। বড়ভাই কেমন?"

ওয়াঙ তার চাচার পানে তাকায়। একটু রোগা বটে; কিন্তু অনাহারী নয়। তার তো এমনটি হওয়ার কথা নয়। ওয়াঙের নিঃশেষিত দুর্বল দেহের সমস্ত শক্তি সর্বনাশা ক্রোধে রূপান্তরিত হয়ে চাচার ওপর পড়তে চায়।

"তুমি যে খেয়েদেয়ে বেশ আছ দেখছি—বেশ আছ।" ওয়াঙ বিড়বিড় করে। অজানা লোকগুলো উপস্থিতি বা ভদ্রতার ধার সে ধারে না। সে তার চাচার মাংস-লাগা দেহের পানে চায় আর নিষ্ফল আক্রোশে আকাশের পানে হাত ছুড়ে মারে।

"খাচ্ছি বই কি!" তার চাচা চিৎকার করে জওয়াব দেয়। "যদি আমার বাড়ির হাল দেখতে! চড়াই পর্যন্ত সেখানে একটা দানা খুঁটে পাবে না। তোমার চাচি—কেমন ধুমসি আর চকচকে ছিল তোমার মনে আছে? একদম চুপসে গেছে। তার গায়ের চামড়া হয়ে গেছে বাঁশে-ঝোলানো জামার মতন। চামড়ার তলায় শুকনো হাড়গুলো থরথর করছে। ছেলেমেয়েদের চারটে মাত্র এখনও জীবিত আছে—ছোট তিনটে পাততাড়ি গুটিয়েছে। আমার হাল তো দেখতেই পাচ্ছিস!" বলে জামার আস্তিনে সে তার চোখদুটো মোছে।

"খাওয়া তোমাদের ঠিকই চলছে—ঠিকই চলছে।" ওয়াঙ নির্জীব কণ্ঠে বারবার বলে।

ওয়াঙের চাচা চটপট জওয়াব দেয়, "তোর আর বড়ভাইয়ের চিন্তাই তো এতদিন করেছি আর তা প্রমাণ করতেই আজ এলাম। এরা শহুরে লোক। অতি ভালোমানুষ। প্রথম সুযোগে তাদের কাছ থেকে কিছু খাবার ধার করে খেলাম এবং প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, খেয়েদেয়ে একটু চাঙা হয়েই আমাদের গাঁ থেকে তাদের কিছু জমি কিনে দেব। তোর জমির কথাই আমার প্রথম মনে পড়ল। তোর তো ভালো জমি আছে। তুই তো আপনজন! তারা নগদ টাকা দিয়ে তোর জমি কিনতে এসেছে। টাকা মানেই খাদ্য—টাকা মানেই জীবন।"—এই কথাগুলো বলেই তার চাচা এক পা পিছনে সরে দাঁড়ায়।

ওয়াঙ লাঙ অনড় বসে থাকে। একবার দাঁড়িয়ে লোকগুলোকে শিষ্টাচার পর্যন্ত দেখায় না। একবার মাত্র চোখ তুলে লোকগুলোকে দেখে নেয়। তারা সত্যি

শহুরে। তাদের পরনে ময়লা রেশমি-ঝোলা পোশাক। তুলতুলে হাত। দীর্ঘ হাতের নখ দেখে মনে হয় তাদের খাওয়া-পরার অভাব নেই; সতেজ সুপুষ্ট দেহ।

সহসা তাদের বিরুদ্ধে ওয়াঙের মনে তীব্র ঘৃণা জাগে। এসব পান-ভোজন-বিলাসী শহুরে লোকগুলো তার সামনে দাঁড়িয়ে অথচ তার ছেলেরা ক্ষুধার জ্বালায় মাটি গুলে খাচ্ছে। তারা এসেছে তার চরম দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তার জমি কেড়ে নিতে। রোষকষায়িত চোখে সে তাদের পানে তাকায়—তার খুলিসর্বস্ব মুখাবয়বে কোটরাগত চোখে ক্রোধবহ্নি জ্বলে ওঠে। "জমি বেচব না!" সে কঠোর কণ্ঠে জানিয়ে দেয়।

তার চাচা এক পা এগিয়ে আসে। এমন সময় ওয়াঙের ছোটছেলেটা হামাগুড়ি দিয়ে দাওয়ায় এসে উপস্থিত হয়। অনাহার-ক্লিষ্ট ছেলেটা পায়ে চলার শক্তি হারিয়ে আবার শৈশবে ফিরে এসেছে।

ওয়াঙের চাচা ছেলেটাকে দেখে বিস্ময়ে চিৎকার করে ওঠে, "গত গ্রীষ্মে আমি যে নাদুসনুদুস ছেলেটাকে একটা পেনি দিয়েছিলাম, এ সেই ছেলে না? কী হাল হয়েছে!"

সকলের দৃষ্টি ছেলেটার ওপর পড়ে। এত দুঃখেও যার চোখে কোনোদিন অশ্রু ঝরেনি, আজ সহসা সেই ওয়াঙ নীরবে কাঁদে। তার বহুদিনের পুঞ্জিত বেদনা অশ্রু হয়ে বুক ভাসিয়ে দেয়।

"কত দাম দেবে?" ওয়াঙ অস্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করে। তাকে তো এই তিনটে শিশু আর বুড়ো বাপের মুখে আহার জোগাতে হবে। তার আর ওলানের ভাবনা নেই। তারা তাদের জমিতে নিজহাতে কবর খুঁড়ে মরণের কোলে ঘুমিয়ে পড়তে পারবে, কিন্তু এই ছেলে-মেয়ে আর শিশুদের তো একটা বন্দোবস্ত করা চাই।

আগন্তুকদের মধ্যে এক-চোখ-কানা লোকটা জওয়াব দেয়, "এই উপোসী ছেলেটার মুখ চেয়ে এই দুর্দিনের বাজারেও উচিত-মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যই আমরা দেব। আমরা দেব—" লোকটা একটু থেমে নীরস কণ্ঠে বলে, "একর প্রতি একশো পেনি।"

ওয়াঙ লাঙ তিক্তহাসি হেসে ওঠে চেঁচিয়ে বলে, "দাম না দিয়ে খয়রাত বললেই পারো। এর চেয়ে বিশগুণ দাম দিয়ে যে আমি এ জমি কিনেছি।"

"হ্যাঁ, তা হয়তো কিনেছ। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অনাহারী লোকের কাছ থেকে নিশ্চয়ই তুমি কেনোনি।" অন্য একটা বেঁটে উঁচু নাকওয়ালা লোক অভদ্রভাবে টিপ্পনি কাটে।

ওয়াঙ আগন্তুকদের পানে তাকায়। এরা ভাবে ওয়াঙ দায়ে ঠেকেছে। অনাহারী পুত্র-কন্যার আর বৃদ্ধ পিতার মুখে অন্ন জোগাবার জন্য কে না সবকিছু দিতে সম্মত হয়? সমর্পণের দুর্বলতা তার বুকে অভূতপূর্ব ক্রোধে রূপান্তরিত হয়। ক্ষিপ্ত কুকুরের মতন সে আগন্তুকদের পানে ধাবিত হয়।

"না, জমি আমি বেচব না," সে গর্জন করে ওঠে, "মাটি খুঁড়ে আমি সন্তানদের খাওয়াব, তা-ও ভালো। তারা মরলে, এ মাটিতে আমি তাদের কবর দেব। যে মাটিতে আমাদের জন্ম, সে মাটিতেই আমরা মরব তবু মাটি বেচব না।"

কান্নার বেগে তার সারাদেহ কাঁপতে থাকে। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

আগন্তুকদের দল এ দৃশ্যে মুচকি হাসে। তার চাচাও নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে। ওয়াঙের এসব কথা পাগলামি মাত্র, এই ধারণা নিয়ে তারা ওয়াঙের ক্রোধ নিবৃত্তির প্রতীক্ষা করে।

হঠাৎ ওলান দোরগোড়ায় এসে লোকগুলোকে বলে—অতিসাধারণ ভাবব্যঞ্জনাহীন তার কণ্ঠস্বর—বলে :

"জমি আমরা বেচব না, কিছুতেই না। জমি হাতছাড়া হলে দক্ষিণদেশ থেকে ফিরে এসে পেট-চালাবার বন্দোবস্ত আমাদের থাকবে না। তবে আমরা আমাদের টেবিল, তক্তপোশ, বিছানা আর বেঞ্চগুলো বেচে ফেলব। এমনকি উনুনে বসানো কড়াইটা পর্যন্ত বেচতে রাজি আছি। তাই বলে চাষাবাদের সরঞ্জামাদি নয়।"

তার ধীরগম্ভীর কণ্ঠের প্রভাব ওয়াঙের ক্রোধ-গর্জনকে ম্লান করে দেয়। ওয়াঙের চাচা হকচকিয়ে প্রশ্ন করে,

"তোমরা কি সত্যি দক্ষিণদেশে যাচ্ছ?"

এক-চোখ-কানা লোকটা সঙ্গীদের সাথে কী পরামর্শ করে, ওলানকে বলে :

"জিনিসগুলো একদম রদ্দি। এগুলো দিয়ে উনুন ধরানোই চলবে। সবগুলোর দাম দুটো রুপোর মুদ্রা দেব। দিতে চাও তো দাও, নইলে চললাম।"

কথাগুলো বলে সে অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওলান শান্তকণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"একটা তক্তপোশের দামও যে এর চেয়ে বেশি। যাক দামটা চটপট দিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে যাও।"

কানা লোকটা কোমর থেকে দুটো রুপোর মুদ্রা বের করে ওলানের প্রসারিত হাতে ফেলে দেয়। এবার আগন্তুক তিনটি ঘরের ভিতর ঢুকে একে একে সবগুলো জিনিস বের করে নেয়। ওয়াঙের বাপের ঘরে কিন্তু ওয়াঙের চাচা ঢোকে না। সে বাইরে প্রতীক্ষা করে। সে তার বড়ভাইকে মুখ দেখাতে চায় না; বড়ভাইকে তক্তপোশ থেকে মেঝেতে নামিয়ে দেবার সময় সে সামনে থাকতে চায় না। সব সরিয়ে নেবার পর বাড়িটা শূন্য হলে, ওলান স্বামীকে বলে :

"এই দুটো মুদ্রা হাতে থাকতে চলো বেরিয়ে পড়ি; নইলে ঘরের কড়ি বর্গা বেচে খেতে হবে, দেশে ফিরে এসে তখন আর মাথা গুঁজবার জায়গা পাব না!"

"তাই চলো!" ওয়াঙ বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে জওয়াব দেয়। মাঠের উপর দিয়ে আগন্তুকদের অপসৃয়মাণ মূর্তিগুলোর পানে তাকিয়ে সে বারবার স্বগতোক্তি করে :

"আমার জমি তো রইল! আমার জমি!"

দশ

দরজাটা জোরে টেনে শিকলটা তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। কাপড়চোপড় যা আছে তা পরনেই আছে। ওলান ছেলেদুটোর হাতে দুটো ভাতের

থালা আর একজোড়া করে খাওয়ার কাঠি গুঁজে দেয়। ছেলেরা সাগ্রহে ওগুলো আঁকড়ে ধরে—এগুলো যেন ভবিষ্যৎ অন্নসংস্থানের প্রতিশ্রুতি। তারা মাঠের উপর দিয়ে মন্থরগতিতে চলে—অতি ছোট্ট একটা ভুখ-মিছিল। তাদের মন্থরগতিতে মনে হয়, তারা হয়তো নগর-প্রাচীরের দেওয়াল পর্যন্তও পৌঁছতে পারবে না। মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ওয়াঙ চলে; কিন্তু তার বুড়ো বাপ হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতেই মেয়েটাকে ওলানের কোলে দিয়ে ওয়াঙ বাপকে কাঁধে তুলে নেয়। হাওয়ার মতন পাতলা বুড়ো শীর্ণ দেহটার ভারেও ওয়াঙ টলতে থাকে। তারা নীরবে ক্ষেত্রদেবতার ক্ষুদ্র মন্দিরের পাশ দিয়ে চলে; সেখানে যুগল-দেবতার মূর্তি নির্বিকার ঔদাস্যে বিরাজ করছে। কে যায় কে আসে সেদিকে তাদের লক্ষ নেই। দৈহিক দৌর্বল্যে এই কন্‌কনে বাতাসেও ওয়াঙের দেহ ঘেমে ওঠে। শীতের ঠাণ্ডা বাতাসের অবিরাম আঘাতে ছেলেদুটো কাঁদে; ওয়াঙ তাদের মিষ্টিকথায় ভোলাতে চেষ্টা করে :

"তোরা যে মস্তবড় হয়েছিস, দক্ষিণদেশে যাচ্ছিস তোরা, কাঁদবি কি রে! সেখানে শীত নেই; আছে প্রচুর খাবার, সাদা ধবধবে ভাত আমরা সবাই মিলে রোজ পেট ভরে খাব।"

পথে বিশ্রাম করে করে তারা শেষপর্যন্ত শহর-প্রাচীরের ফটকে এসে পৌঁছায়। এককালে ওয়াঙ এখানকার স্নিগ্ধতায় শরীর জুড়িয়েছিল। কিন্তু এখন! সুড়ঙ্গপথে শীতের দমকা বাতাস তাদের গায়ে কাঁটার মতো বিঁধছে। শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপে ওয়াঙ। তাদের পায়ের তলায় তুষারকণা জড়ানো কাদা। ছেলেরা এগুতে পারে না। মেয়েকোলে ওলান আপনদেহের ভারে অসহায়। ওয়াঙ টল্‌তে টল্‌তে বাবাকে পার করে দিয়ে এসে একে একে ছেলেদুটোকেও পার করে দেয়। ওয়াঙের দৈহিক শক্তি নিঃশেষ—সেই দেহ বেয়ে বৃষ্টির মতন ঘাম ঝরে, সে স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে অনেকক্ষণ হাঁপায়। অন্যেরা তীব্র শীতের মাঝখানে তার চারদিকে অপেক্ষা করে।

তারা এবার জমিদারবাড়ির ফটকের কাছে এসে পৌঁছায়, ফটকটা বন্ধ। ফটকের দুপাশের ধূসরবর্ণের সিংহদুটোর দেহে বিক্ষুব্ধ বাত্যার আঘাতচিহ্ন। সিঁড়ির ধাপে কুঁকড়ে পড়ে আছে গোটাকয় কঙ্কাল-মূর্তি। তারা তাদের লোভাতুর বুভুক্ষু দৃষ্টি মেলে ধরে রুদ্ধ ফটকের পানে। ওয়াঙ তার ক্ষুদ্র দুঃস্থ মিছিল নিয়ে ফটকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কে একজন হেঁড়ে-গলায় বলে ওঠে: "এই বড়লোকেরা দেবতার মতনই পাষাণ-হৃদয়। তাদের ঘরে অঢেল ভাত। উদ্বৃত্ত ভাতে তারা মদ বানায় আর আমরা উপবাসে ধুঁকে ধুঁকে মরি।"

আর একজন কাতরিয়ে ওঠে : "যদি ক্ষণকালের জন্য এই দুখানা হাতে একটু শক্তি আসত, তবে এদের পিশাচপুরীতে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দিতাম, সে আগুনে আমি নিজে পুড়ে মরলেও আমার দুঃখ হত না। উচ্ছন্নে যাক হোয়াঙ-বংশের জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীরা।"

ওয়াঙ এদের কথায় কোনো সাড়া দেয় না। তারা নীরবে দক্ষিণদিকে এগিয়ে চলে।

শহরের দক্ষিণসীমায় পৌছতে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসে, এমনি ধীর-মন্থর তাদের চলার গতি। তারা দেখে, অসংখ্য দক্ষিণ-যাত্রীরা সেখানে ভিড় করে আছে। ওয়াঙ ভাবে, শহর-প্রাচীরের কোনো কোণে মাথা গুঁজে রাত কাটাবে। ইতিমধ্যে সে সপরিবারে ভিড়ের মধ্যে ওলটপালট খাচ্ছে। একটা লোক ভিড়ের ধাক্কায় তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই সে জিজ্ঞেস করে, "এরা কোথায় যাচ্ছে?"

লোকটা জওয়াব দেয়, "আমরা সব অনাহারীর দল! দক্ষিণে যাচ্ছি ফায়ার ওয়াগনে চড়ে। ঐ সামনের বাড়ি থেকেই গাড়িটা ছাড়ছে। আমাদের মতো লোকের পক্ষে এই ভালো। ভাড়া বেশি নয়, এক ডলারেরও কম।"

ফায়ার ওয়াগন! এর গল্প কেবল লোকের মুখেই শোনা যেত। ওয়াঙ লাঙও আগে চা-খানায় বসে এর নাম শুনেছে। শুনেছে একটার সাথে করে অনেকগুলো গাড়ি একসাথে শিকল দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। জন্তু বা মানুষ এ গাড়ি টানে না—কলে টানে। ড্রাগনের নিশ্বাসের মতন কল থেকে আগুন আর পানি বেরোয় শোঁ শোঁ করে। অনেকবার ভেবেছে কোনো ছুটিছাটার দিনে গিয়ে সে এই গাড়ি দেখে আসবে; কিন্তু ক্ষেতখামারের কাজের ঝামেলায় তার আর ফুরসৎ হয়ে ওঠেনি। তার বাড়িটাও আবার শহরের উত্তর সীমান্ত থেকে বেশদূরে। তা ছাড়া, অজানা-অচেনা জায়গা; তাই সে বড় একটা ভরসাও পায়নি। নিত্যপ্রয়োজনীয় যা, তার চেয়ে বেশি জানা সমীচীনও নয়।

ওয়াঙও সন্দিগ্ধচিত্তে ওলানের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করে :

"আমরাও কি তা হলে ফায়ার-ওয়াগনেই যাব?"

তারা দুজন মিলে বুড়ো আর বাচ্চাদের জনতার মাঝখান থেকে সরিয়ে এনে ভীত-উদ্বিগ্ন চোখে পরস্পরের পানে তাকায়। আরাম পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে বুড়ো আর ছেলেদুটো মাটিতে শুয়ে পড়ে। জনতার কোলাহল তাদের ঘুমে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। ওলান এখনও মেয়েটাকে কোলে করে আছে; মেয়েটার চোখ বোজা। তার মাথাটা মরার মাথার মতো অবশ হয়ে ওলানের কাঁধের উপর এগিয়ে পড়েছে দেখে ওয়াঙ অন্য সবার কথা ভুলে গিয়ে আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে :

"মেয়েটা কি সত্যি মরে গেল?"

"না, প্রাণটা এখনো ধকধক করছে। তবে আজ রাত হয়তো পার হবে না। যদি এমনি করে চলতে হয়, তবে আমাদেরও—"

কথা খুঁজে না-পেয়ে ওলান স্বামীর পানে তাকায়, তার চৌকোণ মুখে অবসাদের করুণ ছায়া। ওয়াঙও তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা পায় না। আপন মনে ভাবে, আর একটা দিন এমনি করে চললে, তাদেরও আর রাত পার হবে না, সে কণ্ঠে জোর করে উৎসাহ ফুটিয়ে ডেকে ওঠে :

"বাবারা উঠে পড়, তোদের দাদাজানকেও টেনে ওঠা। এই ওয়াগনে চড়ে আমরা দিব্যি বসে বসে দক্ষিণে পৌছাব।"

তারা তার আহ্বানে সাড়া দেবার আগেই, অন্ধকারের বুক চিরে ড্রাগনের মতন গর্জন করে দুচোখে আগুন জ্বালিয়ে দৈত্যের মতো কী একটা ছুটে আসে, চারদিকে হুড়োহুড়ি, হাঁকডাক শুরু হয়। ভিড়ের চাপে তারা এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ে, কিন্তু দলচ্যুত হয় না। অন্ধকার হৈ-হুল্লোড় আর ধাক্কাধাক্কির ফাঁকে তারা একটা ছোট্ট দরজা দিয়ে বাক্সের মতো একটা ঘরে গিয়ে ঢোকে। দৈত্যটা তাদের বুকে নিয়ে বিকট শব্দে অন্ধকারের বুকে চিরে আবার ছুটে চলে।

এগারো

একশো মাইল দীর্ঘ পথের ভাড়া হিসেবে ওয়াঙ ওয়াগন-কর্তৃপক্ষের হাতে দুটো ডলার দেয়। অফিসার একমুঠো পেনি ফিরিয়ে দেয়। ওয়াগন একজায়গায় থামতেই কয়েকটা পেনি দিয়ে ওয়াঙ ফেরিওয়ালার কাছ থেকে চারটে রুটি ও ছোটমেয়েটার জন্য একবাটি নরম ভাত কিনে নেয়। বহুদিন থেকে তারা একসাথে এত খাবার পায়নি। পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলছে কিন্তু খাদ্যবস্তু কিছু মুখে পুরতেই তাদের খাবার ইচ্ছা লোপ পেয়ে যায়। অনেক ভুলিয়ে-ভালিয়ে ছেলেদুটোকে সামান্য রুটি খাওয়ানো হল, কিন্তু বুড়োকে তোয়াজ করতে হয় না। বুড়ো তার দন্তহীন মাড়ির ফাঁকে ফেলে মহাঅধ্যবসায়ে রুটি চুষতে থাকে।

চলতি গাড়ির ওঠানামার দরুন যেসব যাত্রী তার গায়ের উপর হেলেদুলে পড়ে তাদের উদ্দেশে সুরে বন্ধুত্বের আমেজ মিশিয়ে বুড়ো আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বলে, "না-খেলে কি চলে? কয়দিন অনাহারে আমার পেটটা একটু কুঁড়ে হয়েছে; হোক। আমার না-খেলে চলবে না, পেটের কুঁড়েমির জন্য আমি পটল তুলি আর কী!" বিরলশ্মশ্রু বিজ্ঞ বুড়োর কথায় সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

ওয়াঙ কিন্তু খাবারের জন্য সব পেনি খরচ করে না, শহরে পৌঁছে মাথাগোঁজার জন্য চাটাই কিনতে সে যথাসাধ্য বাঁচিয়ে রাখে। আগে বহুবার দক্ষিণদেশে গেছে এমন বহু নরনারী এ গাড়িতে চলেছে। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা প্রতিবছর সেখানে গিয়ে ভিক্ষে বা কাজ করে খাবার খরচ বাঁচায়। প্রথমদিকে নতুন পরিবেশে অনভ্যস্ত ওয়াঙ, চলন্ত ওয়াগনের ঘুলঘুলির ফাঁকে চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে ঘূর্ণায়মান মাটির পানে চেয়ে থাকত। এখন এ জীবনে সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে সহযাত্রীদের কথাবার্তা কান পেতে শোনে। তারা বিজ্ঞের মতো কথা বলে; মনে করে শ্রোতার দল অকাট-মূর্খ।

"প্রথম গিয়েই ছ'টা চাটাই কিনে ফেলো," উটমুখো লোকটা বলে যায়— "প্রত্যেকটা চাটাই'র দাম দু'পেনি দিতে হবে। তোমাকে অজ পাড়াগেঁয়ে মনে করলেই তিন পেনি করে চেয়ে বসবে। আমাকে কিন্তু কোনো দক্ষিণী চালবাজই ঠকাতে পারেনি কোনোদিন, টাকার গুমর তাদের যতই থাকুক।' কথাটা বলে সে প্রশংসার লোভে চারদিকে ফিরে ফিরে তাকায়। ওয়াঙ সাগ্রহে তার কথা শোনে।

"তারপর"—লোকটা অনাবৃত গাড়ির ধুলোময়লা-ভরা মেঝেতে বসে গাড়ির লৌহচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি ছাপিয়ে চিৎকার করে বলে যায়—"এই চাটাইগুলো একত্র বেঁধেছেঁদে একটা কুঁড়েঘরের মতন আশ্রয় তৈরি করে নাও। এবার গায়ে কাদা-ময়লা মেখে নিজকে করুণার পাত্র করে ভিক্ষেয় বেরিয়ে পড়ো।"

ওয়াঙ জীবনে কারো কাছে হাত পাতেনি। এই বিদেশ-বিভূঁয়ে অচেনা লোকের কাছে হাত পাতাটা তার আদৌ মনঃপূত হয় না।

"ভিক্ষে করতে হবে?" ওয়াঙ পাল্টা প্রশ্ন করে।

"নিশ্চয়ই!" উটমুখো লোকটা রুক্ষকণ্ঠে জওয়াব দেয়। "তবে পেটে কিছু না দিয়ে বেরিও না। এখানকার লোকদের খাবার অভাব নেই। সকালবেলায় লঙ্গরখানায় গিয়ে এক পেনি খরচ করে একপেট সাদা ভাতের মণ্ড খেয়ে ভিক্ষেয় বেরিয়ে পড়ো। ভিক্ষের পয়সায় বিনের চাটনি, পেঁয়াজ-রসুন, যা খুশি কেনো।"

ওয়াঙ আড়ালে গিয়ে সহযাত্রীদের পানে পিছন ফিরে, গোপনে কোমরে-বাঁধা পেনিগুলো গুনে দেখে। গোটা-ছয় চাটাই আর প্রত্যেকের একবেলার মণ্ড কিনেও তিন পেনি অবশিষ্ট থাকে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ওয়াঙ ভাবে, এই মূলধনে সে নতুন জীবনের যাত্রা শুরু করতে পারবে। কিন্তু পথচারীদের সামনে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরার চিন্তা তার মনকে পীড়া দিতে থাকে। তার বাপ, তার ছেলেদুটো, এমনকি ওলানকে দিয়েও এ সম্ভব; কিন্তু তাকে দিয়ে এ কাজ হবে কেমন করে? তার যে দুটো শক্তসমর্থ হাত রয়েছে।

"পুরুষদের করার মতন অন্য কাজ মেলে না?" সে লোকটার পানে ফিরে প্রশ্ন করে।

"এ্যাঁ! কাজ?" লোকটা মেঝেতে ওয়াক করে থুতু ফেলে ঘৃণাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলে, "পাবে বৈ কি, ইচ্ছা করলে প্রখর রোদে হলদে রঙের রিকশায় বড়লোকদের নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে পারবে। গায়ের রক্ত ঘাম হয়ে ঝরে পড়বে। আর ভাড়ার জন্য যখন অপেক্ষা করবে, তখন গায়ের ঘাম জমে বরফ হবে। ভিক্ষেই আমার জন্য ভালো।" তারপর সে ওয়াঙকে এমনি মধুর ভাষায় গালি দেয় যে, ওয়াঙ আর তাকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করে না।

তবু লোকটার কথায় তার উপকার হয়। ফায়ার ওয়াগন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাত্রীদের নামিয়ে দিলে ওয়াঙ তার পরিকল্পনামতো কাজ করে যায়। সে বুড়ো আর বাচ্চাদের একটা প্রকাণ্ড বাড়ির ধূসর প্রাচীরের গায়ে বসিয়ে দিয়ে ওলানকে তাদের তদারক করতে বলে চাটাই কিনতে বেরিয়ে পড়ে। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে বাজারের পথটা চিনে নেয়। ওয়াঙ এদের কথা বুঝতে পারে না। তাদের উচ্চারণ কেমন কড়া আর ভাঙা-ভাঙা। তার কথাও এদেশি লোকেরা বুঝতে না-পেরে তাকে দাঁতখিঁচুনি দেয়। এমনি করে সে মানুষের চেহারা দেখে তাদের মেজাজ বোঝার অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যার কাছে সঠিক নির্দেশ পাবে তার কাছেই পথের নির্দেশ জিজ্ঞেস করে। এদেশের লোকেরা আসলে বদমেজাজি।

শহর-প্রান্তে এসে চাটাই'র দোকানটা বের করে। চাটাই'র দাম যেন তার ভালো করেই জানা, এমন ভাব দেখিয়ে সে দামটা দোকানির গদিতে ফেলে দিয়ে চাটাই নিয়ে বেরিয়ে আসে। তার বিলম্ব দেখে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। তাকে ফিরতে দেখে সবাই শান্ত হয়। সে বুঝতে পারে, তার অনুপস্থিতিতে এরা সবাই অচেনা জায়গায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, কেবল বুড়োই ঘাবড়ায়নি। সে বিস্ময়-পুলকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে। ওয়াঙ ফিরতেই সে বলে ওঠে :

"দেখছিস, এদেশের লোকগুলো কী মোটাসোটা। কেমন মসৃণ তেল-চকচকে তাদের চেহারা! নিশ্চয়ই তারা রোজ গোশ্‌ত খায়।"

কোনো পথচারী ওয়াঙ-পরিবারের পানে ফিরে তাকায় না। পাকা-রাস্তা দিয়ে কত লোক আনাগোনা করে। সবাই ব্যস্ত-ত্রস্ত। ভিখিরিদের পানে চোখ তুলে তাকাবার সময় এদের নেই। কতক্ষণ পরপর ভারবাহী গাধার দল পথ দিয়ে খুটখুট করে চলে যায়। কোনোটার পিঠে বাড়ি তৈরির মালমশলা, কোনোটার পিঠে চাবুক-হাতে চালক। চালক শপাং শপাং নিরীহ জন্তুগুলোর পিঠে চাবুক লাগায় আর চেঁচায়। ওয়াঙের পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্রতিটি চালক কেমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ চাহনি হানে। কোনো রাজরাজড়াও হয়তো এই বিস্ময়াভিভূত গৃহহীনদের পানে এমন দৃষ্টিতে চাইবেন না। এই ওয়াঙ-পরিবারের চোখের সামনে জন্তুদের পিঠে এমনি করে চাবুক মেরে চালকেরা যেন বিশেষ আনন্দ পায়। চাবুকের ঘায়ে বেচারা গাধাগুলো লাফিয়ে ওঠে; গাধাগুলোর আস্ফালন দেখে চালকেরা হেসে গড়িয়ে পড়ে। এই দৃশ্যে ওয়াঙ চটে গিয়ে কোথায় কুঁড়ে বানাবে, তাই খুঁজতে থাকে।

তাদের পিছনে প্রাচীর ঘেঁষে আরও বহু কুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু প্রাচীরের অভ্যন্তরে কে আছে কেউ জানে না, আর জানার উপায়ও নেই। সুদূরবিস্তারী উঁচু-ধূসর প্রাচীর। কুকুরের পিঠে এঁটুলির মতো চাটাইয়ের চালাগুলো প্রাচীরের গায়ে লেগে আছে। ওয়াঙ এই চালাগুলোর মতো চালা তৈরির চেষ্টা করে, কিন্তু চেরা-নলের চাটাই শক্ত করে মুড়তে চায় না। ওয়াঙ শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দেয়। ওলান সহসা বলে ওঠে, "আমি পারব। ছোটবেলায় দেখেছি মনে আছে।"

মেয়েটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সে চাটাইগুলো বেঁকিয়ে দুদিকে মাটির সাথে লাগিয়ে ইট দিয়ে দুটো দিক চাপা দিয়ে দেয়। একজন মানুষ চালার ভিতরে বেশ সোজা হয়ে বসতে পারে। একটা চাটাই বাঁচিয়ে সে চালার নিচে মাটিতে বিছিয়ে দেয়।

চালাটার নিচে উঁচু হয়ে বসে তারা পরস্পরের পানে তাকায়। তারা যে মাত্র একদিন আগে এখান থেকে একশো মাইল দূরে তাদের ঘর-সংসার ক্ষেতখামার ফেলে চলে এসেছে, এ যেন অসম্ভব মনে হয়। পায়ে হেঁটে এই দূরত্ব পার হতে হতে তাদের একসপ্তাহ লাগত, তাদের কেউ কেউ হয়তো শেষই হয়ে যেত।

এই সম্পদশালী অঞ্চলের প্রাচুর্যের অনুভূতি তাদের মনে আশার সঞ্চার করে। এখনো কারো মুখে অনাহারের চিহ্ন দেখা যায় না। "চলো এবার লঙ্গরখানার খোঁজ করি।"—ওয়াঙের একথায় সবাই খুশি হয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে।

এবার ছেলেদুটো পথ চলতে চলতে খাবার-কাঠি দিয়ে থালাগুলো টুংটাং করে বাজায়; এ-বার তাদের শূন্য বাটিগুলো পূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রাচীরের পাশে চালাগুলো উঠবার কারণ তারা উপলব্ধি করে। প্রাচীরের উত্তর-সীমান্তের পাশ দিয়েই একটা রাস্তা; সে রাস্তা দিয়ে অসংখ্য উপোসী লোক চলেছে—হাতে শূন্য বাটি, গামলা আর টিনের ডিবে নিয়ে। তারা চলেছে এই পথের শেষ সীমান্তে অবস্থিত দুস্থদের লঙ্গরখানায়। ওয়াঙ লাঙ সপরিবারে সেই অসংখ্য উপোসীদের ভিড়ে মিশে যায়। দুটো বিরাট চালাঘরের সামনে এসে দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়ায় তারা।

চালাগুলোর পিছনে বিরাট মাটির উনুন। এমন বিরাট উনুন ওয়াঙ কোনোদিন দেখেনি। উনুনের মুখে চাপানো রয়েছে ছোট পুকুরের মতন অতিকায় লোহার কড়াই। কড়াই'র মুখের কাঠের ঢাকনিগুলো খুলে দিতেই সাদা ফুটন্ত ভাত চোখে পড়ে; ভেসে আসে ভাতের সুরভিত বাষ্পের মেঘ। তাদের নাসারন্ধ্রে এর চেয়ে মনোরম সুরভি আর কোনোদিন লাগেনি। ভিড়ের চাপ এবার সামনের দিকে এগিয়ে আসে। শুরু হয় চেঁচামেচি, হৈ-হুল্লোড়। মায়েদের গালাগালি—কেউ হয়তো তাদের সন্তানদের মাড়িয়ে দিল—আর শিশুদের কান্না। লঙ্গরখানার লোকেরা চিৎকার করে, "সবাই পাবে, কেউ বাদ পড়বে না। সবুর করো।"

কিন্তু দুর্দমনীয় বুভুক্ষের দল পেট না-ভরা পর্যন্ত পরস্পর জানোয়ারের মতন কাড়াকাড়ি মারামারি করে। চাপে পড়ে ওয়াঙ লাঙ তার বুড়ো বাপ আর ছেলেদের আঁকড়ে ধরে রাখে; ভিড়ের চাপে তারা কড়াই'র সামনে পৌঁছতেই ওয়াঙ বাটি বাড়িয়ে দেয়। বাটি ভরে গেলে সে দামটা চুকিয়ে দেয়। দামটা দেওয়া পর্যন্ত প্রাণপণ শক্তিতে তারা কোনোমতে টিকে থাকে।

পথে নেমে তারা ভাতটা খেয়ে নেয়। ওয়াঙের বাটিতে খানিকটা ভাত পড়ে থাকে। সে বলে :

"এটুকু বাড়ি নিয়ে যাই, রাত্রে খাব।"

পাশে দণ্ডায়মান লাল-নীল উর্দি-পরা একটা চৌকিদার-গোছের লোক রুক্ষস্বরে বলে :

"না, পোটলা বাঁধা চলবে না। পেটে যা ধরে খেয়ে যেতে পারো।"

"দাম দিয়েছি; খেয়েই যাই, আর নিয়েই যাই, এতে তোমার কী?"

লোকটা তাকে বুঝিয়ে বলে :

"আমরা এই নিয়ম করেছি তোমাদের ভালোর জন্যই। কারণ, এমন পাষাণ লোকও আছে যারা গরিবের লঙ্গরখানার ভাত সস্তায় কিনে নিয়ে গিয়ে তাদের শুয়োরদের খাওয়ায়। গরিবদের জন্যই এমন সস্তা-দরে ভাত বিক্রি হচ্ছে, নইলে

এক পেনির ভাতে কারো পেট ভরতে পারে? এই ভাত গরিব মানুষের জন্য, শুয়োরের জন্য নয়।"

ওয়াঙ বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে :

"এমন পাষাণও আছে নাকি? আচ্ছা, গরিবদের এমন সস্তা-দরে খাওয়াচ্ছে কেন? কে এ ব্যয়ভার বহন করছে?"

"শহরের ধনী আর সম্ভ্রান্ত লোকেরা এর ব্যয়ভার বহন করছে; কেউ পারলৌকিক পুণ্যের আশায় আর কেউ বাহবা পাওয়ার আশায়।"

"যাক, যে-কারণেই করুক, কাজটা ভালো।" ওয়াঙ মন্তব্য করে, "এমন লোকও নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা নেহাত দয়া করেই ঐ কাজ করেন।"

চৌকিদার তার কথায় সায় দিচ্ছে না দেখে সে আবার বলে, "এমন দরদী লোকও তো দু-একজন আছেন?"

তার সাথে কথা বলে বলে লোকটা ক্লান্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আপনমনে অলস সুরে গুনগুন শুরু করে। ছেলেরা ওয়াঙের পিছন ধরতেই সে তাদের নিয়ে তাদের নতুন চালাঘরে ফিরে যায়।

গ্রীষ্মের পরে এই তাদের প্রথম পেট ভরে খাওয়া। আহারের প্রাচুর্যে তাদের দেহে অবসাদ নেমে আসে। গভীর ঘুমে তারা রাত কাটিয়ে দেয়। পরদিন সকালবেলায় তাদের ঘুম ভাঙে।

কাল ভাত কিনে হাতের পুঁজি শেষ হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওয়াঙ স্ত্রীর পানে চায়। কিন্তু শূন্য-বন্ধ্যা মাঠের নৈরাশ্য বুকে নিয়ে যে-দৃষ্টি সে একদিন ওলানের পানে তুলে ধরেছিল, আজকের দৃষ্টিতে সে নৈরাশ্য নেই। এই প্রাচুর্যের দেশে তারা না-খেয়ে মরতে পারে না। তাদের নিজের দেশে তো পয়সা খরচ করেও খাবার পাওয়া যায় না। ওলান স্থির শান্তকণ্ঠে জওয়াব দেয়—এমন পরিস্থিতির সাথে তার যেন আজন্ম পরিচয়—

"আমি আর বাচ্চারা ভিক্ষা করতে পারি; বাবাও পারেন। তাঁকে দেখে লোকের মনে দয়া হবে।"

ওলান ছেলেদের কাছে ডাকে। তারা পেট ভরে খেয়ে পুরনো দিনের অনাহারের কথা ভুলে গিয়ে পরম নিশ্চিন্ততায় হা করে নতুন জগৎটাকে দেখছে। তারা কাছে এলে ওলান তাদের হাতে বাটি দিয়ে বলে :

"তোরা এই বাটি হাতে নিয়ে এইভাবে জোরে জোরে বলবি—"

নিজের শূন্য বাটিটা হাতে নিয়ে সে করুণস্বরে বলে, "দয়া করুন হুজুর! দয়া করুন মা। পরকালের পুণ্য হাসেল করুন একটা পয়সা দিয়ে। এই গরিবদের জান বাঁচান।"

ছেলেদুটো আর ওয়াঙ, ওলানের পানে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এসব ওলান কোথায় শিখল? এই রহস্যময়ী নারীর কত রহস্যই তার কাছে অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে

গেছে। তার মৌন-জিজ্ঞাসার উত্তরে ওলান বলে, "যে আকালের বছরে আমাকে বেচে দেওয়া হয়েছিল সে-বছর ভিক্ষে করে পেটের ভাত জোগাড় করেছি।"

এমন সময় বুড়োর ঘুম ভাঙে। তাকেও একটা বাটি দেওয়া হয়। চারজন মিলে রাস্তায় ভিক্ষে করতে বেরিয়ে যায়। ওলান পথচারীদের সামনে বাটি তুলে ধরে করুণ সুরে ভিক্ষে চায়। অনাবৃত বুকে ঘুমন্ত শিশুর এলিয়ে পড়া মাথাটা তার অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দোল খায়। শিশুকে দেখিয়ে সে আর্তকণ্ঠে বলে :

"আপনারা দয়া না করলে, এই কোলের শিশুটা মরে যাবে হুজুর। আমাদের পেটেও দানা নেই, আমরাও না-খেয়ে আছি, মা!"

শিশুটাকে সত্যি মরার মতো দেখায়; মাথাটা এদিক-ওদিক নড়ছে। দেখে দু-একজনের মনে দয়া হয়। তারা অগত্যা ভাঙতি পয়সা দু-একটা তার দিকে ছুড়ে দেয়।

কিন্তু ছেলেরা ভিক্ষেটাকে একটা খেলা বলে মনে করে। বড়ছেলেটা লাজুক। ভিক্ষে চাইতে গিয়ে সে কুণ্ঠিত হাসি হেসে ফেলে; এটা তাদের মায়ের নজরে পড়তেই মা রেগে তাদের কুঁড়েঘরে নিয়ে গিয়ে বেদম মার মারে আর গাল দেয় :

"ভিক্ষের কথা মুখে এনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁত বের করে হাসিস। লজ্জা করে না? না-খেয়ে মর্।" এই বলে সে আবার চড় কষতে থাকে। মারের চোটে তার হাতই প্রায় ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, ছেলেদের গাল বেয়েও অশ্রু ঝরতে থাকে। তখন কান্নারত দুটো ছেলেকে ওলান আদর করে পথে বের করে বলে দেয় :

"হ্যাঁ, এবার কাঙালির মতোই চেহারা হয়েছে। আবার হাসলে কিন্তু রক্ষা নেই বলে দিচ্ছি!"

ওয়াঙও পথে বের হয়ে এখানে-ওখানে জিজ্ঞেস ক'রে একটা রিকশার খাটাল আবিষ্কার করে। তারপর সারাদিনের জন্য আধ ডলার ভাড়ায় একটা রিকশা নিয়ে রাস্তায় নামে।

দু চাকার এই নড়বড়ে কাঠের বাহন টানতে টানতে তার মনে হয়; দুনিয়ার সবাই তাকে হয়তো টিটকারি দিচ্ছে। হালে প্রথম জোয়াল-দেওয়া বলদের মতন রিকশাদণ্ডের মাঝখানে তাকে কেমন কিম্ভূতকিমাকার মনে হয়। রিকশা নিয়ে সে হাঁটতেই পারে না। অথচ পেটের খোরাকি জোগাড় করতে হলে তাকে রিকশা নিয়ে ছুটতে হবে। রিকশাওয়ালারা তো দৌড়েই রিকশা টানে। সে একটা সংকীর্ণ নির্জন গলি আবিষ্কার করে, সেখানে সে রিকশা টানা শিখতে আরম্ভ করে। কিছুতেই যেন হচ্ছে না; এর চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ঢের ভালো।

হঠাৎ একটা দরজা খুলে শিক্ষকের পোশাক-পরা চশমাধারী একজন বয়স্ক ভদ্রলোক তাকে ডাক দেয়।

প্রথমত ওয়াঙ লোকটাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, সে কাঁচা-রিকশাওয়ালা; ছুটতে পারবে না; কিন্তু লোকটা কালা। তাই তার কোনো কথাই লোকটার কানে ঢোকে না। সে ওয়াঙকে রিকশাটা নোয়াতে ইশারা করে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় ওয়াঙ অগত্যা রিকশাটা নিচু করে। লোকটা রিকশায় চড়ে হুকুম দেয়, "কনফ্যুসিয়াসের

মন্দির," বলেই লোকটা গম্ভীর হয়ে বসে। তার গাম্ভীর্য দেখে আর কিছু বলার সাহস পায় না ওয়াঙ। কনফ্যুসিয়াস-মন্দিরের অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ওয়াঙ অন্য রিকশাওয়ালাদের দেখাদেখি এগুতে থাকে।

চলতে চলতে সে মন্দিরের অবস্থান সম্বন্ধে লোকদের জিজ্ঞেস করে নেয়। একটা বড় রাস্তা বেয়ে সেখানে যেতে হয়। রাস্তায় অসম্ভব ভিড়। পণ্যের পশরা মাথায় ফেরিওয়ালাদের আনাগোনা চলছে, মেয়েরা বাজারে যাচ্ছে; নানারকমের যানবাহন চলছে, সবগুলোর নামও ওয়াঙ জানে না। একটার সাথে আর একটার ঠোকাঠুকি হচ্ছে। এ রাস্তায় রিকশা চালানো ওয়াঙের পক্ষে অসম্ভব। সে যথাসাধ্য দ্রুত হেঁটে চলে। কিন্তু পিছনের বোঝাটার ঝাঁকুনি সম্বন্ধে সে সচেতন। পিঠে বোঝা বইবার অভ্যাস তার আছে, কিন্তু বোঝা টানেনি সে কোনোদিন। মন্দিরে পৌঁছার আগেই তার দু'বাহু ব্যথায় টনটন করে, হাতে ফোস্কা পড়ে। তার চাষাড়ে হাতে অবশ্য ফোস্কা পড়ার কথা নয়, তবে রিকশার ঘষা এমন জায়গায় লাগছে যেখানে নিড়ানির ঘষা লাগেনি। তাই ফোস্কা পড়ছে।

মন্দিরের ফটকে এসে বুড়ো-মাস্টার রিকশা থেকে নেমে জামার গলায় হাত গলিয়ে একটা ছোট রুপোর মুদ্রা বের করে দিয়ে বলে :

"আমি এর চেয়ে বেশি দেই না, নালিশ করে লাভ হবে না।"

নালিশের চিন্তাও ওয়াঙ করে না; এমন মুদ্রা সে কোনোদিন চোখেও দেখেনি। এটা ভাঙিয়ে ক'টা পেনি মিলবে তা-ও জানা নেই। একটা ভাতের হোটেলে গিয়ে সে মুদ্রাটি ভাঙিয়ে নেয়; হোটেলওয়ালা তাকে ছাব্বিশটা পেনি গুনে দেয়। এদেশে পয়সা উপার্জন এত সহজ! সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। আর একজন রিকশাওয়ালা তার পয়সা গোণা দেখে বলে,

"মাত্র ছাব্বিশ পেনি? বুড়োকে কোত্থেকে নিয়ে এলি?"

ওয়াঙ লাঙ তাকে সব কথা খুলে বলতেই রিকশাওয়ালা রেগে ওঠে, "বেটা তো বড় কিপটে। বেটা তোকে অর্ধেক ভাড়া দিয়েছে। কত ভাড়া ঠিক করেছিলি?"

"দরদস্তুর করিনি। ডাকতেই চলে এলাম।" ওয়াঙ বলে।

সহানুভূতি-ভরা দৃষ্টিতে রিকশাওয়ালা ওয়াঙের পানে তাকায় :

"এমন গেঁয়ো ভূত না হলে কি অমন লম্বা টিকি হয়!" সে পাশের লোকদের ডেকে শোনায়। "কে একজন ডাকতেই এই উজবুকের বেটা উজবুক সুড়সুড় করে চলে এল; ভাড়ার কথা জিজ্ঞেসও করল না। আরে বেটা হাঁদা, কেবল বিদেশি সাহেবদেরই দরদস্তুর না করে রিকশায় ওঠানো চলে, তারা রগচটা হলেও মোটের ওপর বোকা। দরদস্তুর বোঝে না। পকেট থেকে পানির মতো ডলার বের করে দেয়।" শ্রোতার দল হেসে ওঠে।

এই শহুরে লোকদের সামনে ওয়াঙ মিইয়ে পড়ে। সে নীরবে রিকশা নিয়ে সরে পড়ে।

"যাক, কাল ছেলেমেয়েদের ভাতের জোগাড় হবে তো!" সে আপনমনে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। সাথে সাথে তার মনে পড়ে রিকশার মালিকের ভাড়ার কথা। চুক্তির ভাড়ার অর্ধেকও তো এখন পর্যন্ত হল না!

সকালবেলায় আর একটা যাত্রী মেলে। এবার ওয়াঙ ভাড়া ঠিক ক'রে নেয়। বিকালে আরও দুটো ভাড়া মিলে যায়, কিন্তু রাতের বেলায় অর্জিত সব পয়সা গুনে দেখে, রিকশা-ভাড়া চুকিয়ে মাত্র একটা পেনি তার হাতে থাকে। তিক্ত মনে সে তার কুঁড়েতে ফিরে যায়। সারাদিন ক্ষেতে খাটনির চেয়ে বেশি খেটে পেল কিনা একটা পেনি! পিছনে ফেলে আসা মাটির স্মৃতি-বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আজকের এই বিচিত্র দিনে একবারও তার ও-কথা মনে পড়েনি। সুদূরে ফেলে আসা তার প্রতীক্ষমাণা সুফলা-মাটির স্মৃতি তার মনে নিবিড় প্রশান্তি এনে দেয়।

কুঁড়েতে ফিরে এসে দেখে, ওলান সারাদিন ভিক্ষে করে পাঁচ পেনির মতো পেয়েছে। ছেলেদুটোও সামান্য কিছু পেয়েছে। যাক, সব মিলে কালকের খোরাকটা হয়ে যাবে। ছোটছেলের অর্জিত পয়সাটা অন্য পয়সার সাথে মেশাতে গেলেই সে চেঁচিয়ে ওঠে। সে তার অর্জিত ধন হাতছাড়া করতে চায় না। হাতের মুঠোতে সে পয়সা নিয়েই ঘুমোয়। সকালবেলা ভাত কেনার সময় সে তার পয়সা বের করে দেয়।

বুড়োর ভাগ্যে কিছুই জোটেনি, সে সারাদিন সুবোধ ছেলের মতো পথের ধারে কাটিয়েছে, কিন্তু কারো কাছে হাত পাতেনি। সে জেগে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে সারাটা দিন। চোখের সামনে যা পড়েছে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাই দেখেছে। দেখে দেখে ক্লান্তিতে আবার তার চোখের পাতা ঘুমে বুজে গেছে। মুরুব্বি বলে তার অকৃতকার্যতায় কেউ তাকে কিছু বলে না। সারাদিন একটা পয়সাও পায়নি দেখে সে আপন মনেই বলে :

"এই হাতে লাঙল ধরে, বীজ বুনে ফসল তুলে অন্ন-সংস্থান করেছি; ভিক্ষে করিনি কোনোদিন। আমার ছেলে-নাতিরা থাকতে আমি ভিক্ষে করব কেন?"

তার ছেলে-নাতিরা থাকতে সে না-খেয়ে মরবে না, এই তার শিশুসুলভ বিশ্বাস।

বারো

ওয়াঙ লাঙের জীবনে অনাহারের পালা শেষ হয়ে গেছে। ছেলেদের পেটে রোজই দানা পড়ে। প্রতি সকালে ভাত মেলে। তার পরিশ্রম আর ওলানের ভিক্ষালব্ধ উপার্জনে ভাতের দাম তারা নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছে। নতুন জীবনের তীব্র অনুভূতি কমে গেছে। ওয়াঙ লাঙ শহরের জীবনধারার সাথে পরিচিত হতে আরম্ভ করে।

সারাদিন শহরময় ছুটাছুটি করে সে শহরের কতকটা পরিচয় পেয়েও গেছে; এর দু-একটা রহস্যও তার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সে আবিষ্কার করেছে, সকালবেলা মেয়ে-আরোহীরা তার রিকশায় চড়ে যায় বাজারে আর পুরুষেরা যায় স্কুলে বা সওদাগরি অফিসে। কিন্তু স্কুলগুলোর ধরনধারণ তার জানার উপায় নেই।

সে স্কুলের নাম শুনেছে 'মহা-প্রতীচ্য বিদ্যায়তন' বা 'মহা-চীন বিদ্যায়তন'; এর বেশি নয়। বিদ্যায়তনগুলোর ফটকের অভ্যন্তরে যাওয়ার অধিকার তার নেই। ভিতরে গেলে সে অনধিকার প্রবেশের দায়ে নাজেহাল হবে। অফিসগুলো সম্বন্ধেও তার জ্ঞানের পরিধি এই পর্যন্ত। সে যায়, পয়সা পায়, চলে আসে।

রাতের বেলা সে আরোহীদের নিয়ে যায় বিরাট সব চা-খানায় আর স্ফূর্তির আড্ডায়। অবাধ স্ফূর্তি চলে সেখানে। সে স্ফূর্তির প্রবাহ বাইরে ভেসে আসে গান-বাদ্যের সুরে-ঝঙ্কারে। চা-খানায় চলে অবাধ জুয়াখেলা। এসব জুয়া আর স্ফূর্তি চলে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে। এ স্ফূর্তি ওয়াঙের জানা নেই, কারণ সে এসব জায়গার দোরগোড়াও পার হতে পারে না। এসব জায়গায় ফটক পর্যন্ত তার গতিসীমা। ধনীগৃহের ইঁদুরের মতন এ শহরে তার বাস। ইঁদুর লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে সে বাড়ির ঝরতি-পড়তি খেয়ে বাঁচে; সে-বাড়ির জীবনধারার সাথে এর কোনো সত্যিকার সম্বন্ধ নেই।

এ শহরে ওয়াঙের জীবনও ঠিক এমনি ধরনের। তার জন্মভূমি থেকে এই স্থানের দূরত্ব মাত্র একশো মাইলের; তা-ও জলপথে নয়, স্থলপথে। এ দূরত্ব এমন কিছুই নয়। তবু এই শহরে সে সপরিবারে প্রবাসী। এখানকার লোকদের চুল আর চোখ তাদেরই চুল-চোখের মতন কালো; এখানকার লোকদের ভাষাও চেষ্টা করলে বোঝা যায়; তবু ওয়াঙ নিজকে এখানে প্রবাসী বলেই মনে করে।

আনহুই আর কিয়াংশু এক নয়, ওয়াঙের জন্মভূমি আনহুইয়ের ভাষা মন্থর, গভীর আর কণ্ঠোৎসারী; কিন্তু এই কিয়াংশু-বাসীদের কথাগুলো যেন ওষ্ঠ আর জিভের ডগা থেকে বেরোয়। তার দেশের মাটি স্বচ্ছন্দ মন্থরতায় বছরে দুবার গম, ধান, ভুট্টা, বিন আর রসুন ফলায়; আর এখানকার লোকেরা পূতিগন্ধময় বিষ্ঠার সার দিয়ে জোরজবরদস্তি করে জমিতে শাক-সবজি আর ফসল ফলায়।

ওয়াঙের দেশে ভালো গমের রুটির সাথে এক-কোয়া রসুন হলেই দিব্যি একবেলা খাওয়া হয়। কিন্তু এখানে গোশ্‌ত, বাঁশের কোড়, নানাবিধ পাখির গোশ্‌ত আরও কত রকমের তরিতরকারির বাহার! এখানকার কোনো ভদ্রলোকের নাকে রসুনের গন্ধ ঢুকলে তিনি নাক সিটকিয়ে চেঁচিয়ে বলবেন, "এ নিশ্চয়ই কোনো টিকিওয়ালা উত্তুরে ভূতের কাণ্ড।" রসুনের গন্ধ পেলে এখানকার কাপড়ওয়ালারা কাপড়ের দর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়, বিদেশিদের কাছেও তারা এমনি চড়া দর হাঁকে।

প্রাচীর-সংলগ্ন বস্তিটার জীবনধারা এই শহর আর শহরতলী থেকে আলাদা। একদিন ওয়াঙ দেখে, কনফ্যুসিয়াস-মন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে এক যুবক সমবেত লোকদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছে—সাহস থাকলে যে-কেউ সেখানে বক্তৃতা দিতে পারে। বক্তা বলছে, চীনদেশে বিপ্লবের মহাপ্রয়োজন, এ বিপ্লব ঘৃণিত বিদেশিদের বিরুদ্ধে। ওয়াঙ লাঙ ভয়ে পালিয়ে আসে। তার ধারণা, সে বিদেশি আর তার মতো বিদেশিদের বিরুদ্ধেই বক্তা এই উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিচ্ছে। আর একদিন অন্য এক যুবককে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে দেখে ওয়াঙ। এ শহরে

অনেক যুবক বক্তা আছে—সে বলছে, চীনবাসীদের একতাবদ্ধ হতে হবে, শিক্ষিত হতে হবে। এ বক্তৃতা শুনেও ওয়াঙের ধারণা হয় না যে, বক্তা যাদের উদ্দেশে একথা বলছে, সে-ও তাদেরই একজন।

পরে একদিন তার ধারণা বদলে যায়। তার প্রতীতি হয় যে, এই শহরে তার চেয়েও বিদেশি মানুষ আছে। সেদিন সে বাজারে আরোহীর আশায় ঘুরছে, এমন সময় এক অদ্ভুত জীব সহসা তার সামনে এসে হাজির। এমন জীব আগে সে কোনোদিন দেখেনি। মেয়ে কি পুরুষ তা-ও সে ঠাহর করতে পারে না। জীবটার গড়ন দীর্ঘ; পরিধানে কালো মোটা কাপড়ের দীর্ঘ পোশাক, গলায় জড়ানো কী একটা মরা জন্তুর স-লোম চামড়া। জীবটা তাকে থামিয়ে রিকশাটা নিচু করতে ইশারা করে। রিকশাটা নিচু করতেই সেই জীব রিকশায় উঠে বসে। অভিভূত ওয়াঙ দাঁড়াতেই সে জীবটা ভাঙা-ভাঙা ভাষায় তাকে ব্রিজ স্ট্রিটে যেতে নির্দেশ দেয়, সে ছুটতে আরম্ভ করে। পথে অন্য একজন রিকশাওয়ালাকে আরোহীর পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই রিকশাওয়ালাটা জওয়াব দেয় :

"ও বিদেশি, আমেরিকান মেম সাহেব—তোর বরাত ফিরেছে।"

রিকশায় বসা অদ্ভুত জীবটির ভয়ে ওয়াঙ প্রাণপণে ছুটতে থাকে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ক্লান্তিতে তার গা বেয়ে ঘাম ঝরতে থাকে।

মেমসাহেব রিকশা থেকে নেমে ভাঙা-ভাঙা ভাষায় বলে, "এমনি করে পড়ি কি মরি হয়ে ছোটার কোন প্রয়োজন ছিল না।" এ বলে তার হাতে দুটো রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে চলে যায়, এটা ন্যায্য ভাড়ার দ্বিগুণ।

ওয়াঙ লাঙ এবার উপলব্ধি করে, এই মেমসাহেব সত্যি বিদেশি—এ শহরে তার চেয়েও বিদেশি। কালো চুল আর কালো চোখওয়ালা সব মানুষ তাহলে একজাতের, আর কটা চোখ কটা চুলওয়ালা সব আলাদা জাতের মানুষ। সে নিজে পুরোপুরি বিদেশি নয়।

মেমসাহেবের দেওয়া মুদ্রাদুটো নিয়ে ঘরে ফিরে সে ওলানকে সব কথা বলে। ওলান জওয়াব দেয়, "আমি ওদের দেখেছি। আমি ওদের দেখলেই হাত পাতি; ওরাই খুচরো তামার পয়সা না দিয়ে রুপোর মুদ্রা দেয়।"

এদের ধারণা, এই বিদেশিদের রুপোর মুদ্রা দান তাদের হৃদয়ের উদারতা নয়, নির্বুদ্ধিতা। ভিখারিদের তামার পয়সা দিতে হয়, এই বিদেশিরা তা জানে না।

যাক, সেই যুবক-বক্তা যা তাকে শেখাতে পারেনি, ওয়াঙ তা আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখে নেয়। সে উপলব্ধি করে কালোচুল কালো চোখওয়ালাদের জাত অভিন্ন।

এই ঐশ্বর্যময়ী নগরীর প্রান্তটুকু আঁকড়ে ধরে ওয়াঙ বুঝতে পারে, খাদ্যের অভাব এখানে কোনোদিন হবে না। ওদের দেশে মানুষ মরে আহার্যের অভাবে; সেখানে অগ্নিক্ষরা আকাশের নিচে বসুন্ধরা বন্ধ্যা হয়ে যায়; ফসল ফলে না। কেনার মতন কিছু পাওয়া যায় না বলে অর্থও সেখানে অর্থহীন হয়ে পড়ে।

এ শহরের সর্বত্র আহার্যের প্রাচুর্য। মেছোবাজারে প্রকাণ্ড সব মাছের ঝুড়ি সারি-সারি সাজানো। রাতের বেলায় নদীতে ধরা মাছ, গামলায় গামলায় পুকুরে জাল দিয়ে ধরা কুঁচো-মাছ। হলদে কাঁকড়ার স্তূপ বিস্ময়ে বিরক্তিতে দাঁড়া উঁচিয়ে নড়ছে। ধনীলোকের বিলাস-ভোজের যোগ্য উপাদান বাইন-মাছ মোচড় খাচ্ছে। শস্যের বাজারে এত প্রকাণ্ড সব শস্যের ঝুড়ি যে একটা মানুষ তাতে তলিয়ে মরতে পারে; চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সাদা ধবধবে চাউল, বাদামি হলদে, হালকা সোনালি গম, হলদে সয়াবিন, আর লাল সবুজ চওড়া বিন। আর কত রঙ-বেরঙের শস্য! গোশতের বাজারে পেট-চেরা লালচে গোশ্‌ত আর থলো-থলো চর্বি-বের-করা গোটা জানোয়ার ঝুলছে। হাঁসের দোকানে ঝুলছে খেকা হাঁসের সারি, সাদা হাঁসের নোনা শুঁটকি! কত রকম পাখির গোশ্‌ত।

সবজি—মানুষ মাটির খোশামোদ করে যতরকম সবজি জন্মাতে পারে সব সেখানে আছে। মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির সব উপাদান রয়েছে সেখানে। ফেরিওয়ালার দল মিঠাই, ফল, পেস্তা, বাদাম ইত্যাদি নানারকম খাদ্যদ্রব্য ফেরি করছে। শহুরে ছেলেরা মুঠো মুঠো পেনি নিয়ে ফেরিওয়ালাদের কাছে ছুটে যায়, কেনে আর খায়। তাদের হাত-পা মুখ তেলে আর রসে চটচটে হয়ে যায়।

সত্যি, এমন শহরে অনাহারে কাউকে থাকতে হয় না। তবু প্রত্যহ রাত পোহাবার একটু পরেই ওয়াঙ সপরিবারে তার কুঁড়ে থেকে ভাতের বাটি আর খাদ্যের কাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারা এই বস্তির অন্য বাসিন্দাদের মিছিলে মিশে লঙ্গরখানায় সারি বেঁধে যায় এক পেনি দিয়ে একবাটি ভাতের মণ্ডের আশায়, তাদের নামমাত্র বস্ত্রাবৃত দেহ শীতের কুয়াশায় আর কনকনে হাওয়ায় বেঁকে যায়। ওয়াঙের রিকশার মজুরি আর ওলানের ভিক্ষালব্ধ উপার্জনে তাদের রোজ রান্না করার সাধ্যি হয় না। লঙ্গরখানায় মণ্ড কিনে এক-আধটা পেনি বাঁচলে এদিয়ে তারা সামান্য কপি কেনে। কপির তরকারি রান্নার হাঙ্গামাও কম নয়। ছেলেদুটোকে ঘুরে-ঘুরে কাঠ-খড় কুড়িয়ে আনতে হয়। ওলানকে দুটো ইট দিয়ে উনুন তৈরি করতে হয়। যেসব ঘাস-খড় বোঝাই গাড়ি চাষিরা শহরে নিয়ে যায়, সেসব গাড়ি থেকে ছেলেদুটো টেনেটুনে চুরি করে দু-এক মুঠো নিয়ে আসে। মাঝে মাঝে ছেলেরা ধরা পড়ে বেশ মারও খায়। একদিন ভীরু-লাজুক বড়ছেলেটা এক কৃষকের মারের চোটে একটা চোখ ফুলিয়ে বাড়ি ফেরে। ছোটছেলেটা কিন্তু ইতিমধ্যেই চৌর্যবৃত্তিতে ভিক্ষাবৃত্তির চেয়েও পাকা হয়ে উঠেছে।

এতে ওলান কিছু মনে করে না। ছেলেরা যদি ভিক্ষা করতে না পারে, তবে চুরি করেই পেটের বন্দোবস্ত করুক। ওলান কিছু বলতে পারে না, কিন্তু ছেলেদের এই চৌর্যবৃত্তিতে ওয়াঙের মন তিতিয়ে বিষিয়ে ওঠে। এ কাজে বড়ছেলেটার অপটুতার জন্য সে তাকে দোষ দেয় না। শহর-প্রাচীরের ছায়াতলের এই জীবন ওয়াঙের মনঃপূত নয়। তার জন্য তার মাটি পথ চেয়ে আছে। বারবার এ-কথাই তার মনে হয়।

একদিন ওয়াঙ রাত করে বাড়ি ফেরে। ক্ষেতে বসে সে লক্ষ করে যে, কপির ঝোলে বেশ বড় একটুকরো গোশ্‌তও রয়েছে। তাদের নিজেদের বলদ জবাই'র পর এই তাদের প্রথম গোশ্‌ত জুটল। ওয়াঙ খুশি হয়ে ওঠে।

"নিশ্চয়ই কোনো বিদেশি এই টুকরোটা ভিক্ষে দিয়েছে।" সে ওলানকে শুধায়। স্বল্পভাষিণী ওলান কথার জওয়াব দেয় না। কিন্তু ছোটছেলে তার কৃতিত্ব আর চাতুর্যের গর্বে বলে ফেলে :

"আমি এনেছি এই গোশ্‌ত; এ গোশ্‌ত আমার। কেমন করে আনলাম, বলছি শোনো। কসাই এই টুকরোটা দোকানের সামনে রেখে অন্যদিকে তাকিয়েছে এমন সময় আমি এক বুড়ি খদ্দেরের বগলের তলা দিয়ে গিয়ে টুকরোটা নিয়ে চম্পট দিলাম। পাশের গলিতে ঢুকে এক বাড়ির পেছনে কতক্ষণ লুকিয়ে রইলাম। তারপর বড়ভাইকে নিয়ে দুজনে বাড়ি ফিরলাম।"

একথা শুনে ওয়াঙ ভয়ানক চটে ওঠে, "আমি গোশ্‌ত খাব না। গোশ্‌ত খেতে হলে কিনে বা ভিক্ষে করে আনব। চুরি-করা গোশ্‌ত নয়। আমরা ভিখিরি হয়েছি বলে চোর নই।" এই বলে হাঁড়ি থেকে গোশ্‌তের টুকরোটা উঠিয়ে ছুড়ে ফেলে। ছোটছেলের চিৎকারে কান দেয় না।

ওলান নির্বিকার ভঙ্গিতে উঠে এসে গোশ্‌তের টুকরোটা উঠিয়ে আনে। একটু পানি দিয়ে ধুয়ে টুকরোটা আবার হাঁড়িতে রেখে দিয়ে শান্তকণ্ঠে বলে, "চোরাই বলে কি গোশ্‌ত আর-একটা কিছু হয়ে গেল? গোশ্‌ত গোশ্‌তই।'

ওয়াঙ কিছু না বলে ক্রোধে গুমরাতে থাকে। তার বুকে ভয়, তার ছেলেরা এই শহরে বাস করে চোর বনছে! তারই চোখের সামনে ওলান গোশ্‌তের টুকরোটা কেটে কেটে তার বাপ আর ছেলেদের ভাগ করে দেয়, মেয়ের মুখে একটু দিয়ে নিজেও খায়।

কপির তরকারি দিয়ে ওয়াঙ তৃপ্তির সাথে খেয়ে নেয়। আহারান্তে সে ছোটছেলেকে রাস্তায় ডেকে নিয়ে যায়। ওলান শুনতে না পায়, এমন জায়গায়। ছেলের মাথাটা বগলে চেপে সে ছেলেকে বেদম মারতে আরম্ভ করে। ছেলের বুকফাটা আর্তনাদেও সে থামতে চায় না। সে মারে আর বলে, "চোরের এই শাস্তি।"

ছাড়া পেয়ে ছেলেটা বাড়ি ফেরে। ওয়াঙ আপনমনে ভাবে, "এবার আপন মাটির কোলে ফিরতেই হবে। আর এখানে নয়।"

তেরো

দারিদ্র্যের ভিত্তির ওপর গড়া এই শহরের ঐশ্বর্যের মাঝখানে থেকেও ওয়াঙ লাঙের দারিদ্র্য ঘোচে না। এখানকার বাজারে আহার্যের অপচয়; রাজপথের দুইধারে রেশমি বস্ত্রের বিপণিতে লাল, কালো, জরদ রঙের রেশমি ধ্বজায় পণ্যসম্ভারের ঘোষণা; সাটিন, মখমল, রেশমি পোশাক পরিহিত ধনীসম্প্রদায়ের আনাগোনা।

তাদের দেহ কোমল পেলব; আলস্যে সুন্দর আর সুরভিত তাদের হস্তদ্বয়। এই রাজকীয় নগরের যে-অংশে ওয়াঙ লাঙরা থাকে; সেখানে সর্বনাশী ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্যের অভাব; কঙ্কাল-দেহের নগ্নতা ঢাকার জন্য বস্ত্রের অনটন।

এই দরিদ্র বস্তির পুরুষেরা সারাদিন রুটি-কেকের কারখানায় ধনীদের ভোজন-বিলাসের উপকরণ তৈরি করে; বালকেরা ভোর থেকে রাতদুপুর পর্যন্ত অবিশ্রান্ত খেটে অবসন্ন চর্বি-চটচটে ময়লাদেহে খড়কুটো বিছানো মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলা আবার চোখে ঘুম নিয়ে তারা উনুন ধরায়। পরের ভোগের জন্য তারা যে খাদ্যসম্ভার তৈরি করে তার এককণা কিনে খাওয়ার মতো সামর্থ্য তাদের নেই। তারাই স্ত্রী-পুরুষেরা মিলে শীত-গ্রীষ্মের উপযোগী ফার-কোট ব্রোকেড আর মনোরম চকচকে রেশমি-পরিচ্ছদ তৈরি করে ধনিক-গোষ্ঠীর জন্য। আর ধনীরা নির্লিপ্ত ঔদাস্যে তা উপভোগ করে। অথচ এই হতভাগ্য শ্রমিকের দল কোনোরকমে মোটা নীল কাপড়ের টুকরো একত্র জোড়া দিয়ে তাদের দেহের নগ্নতা ঢাকে।

পরের জন্য খাটিয়ে এসব লোকদের সাথে বাস করে ওয়াঙ কত বিচিত্র কথা শোনে, কিন্তু কান দেয় না। তাদের মধ্যে বয়স্করা কথা বলে না। তারা নীরবে রিকশা টানে। কয়লা আর কাঠকয়লা আর পণ্যবোঝাই ঠেলাগাড়ি ঠেলে পিঠ তাদের ব্যথায় টনটন করে, মাংসপেশি দড়ির মতো ফুলে ওঠে। সামান্য আহার যা জোটে; তা তারা হিসাবে করে খায় আর রাতের সংক্ষিপ্ত সময়টুকু গভীর ঘুমে কাটিয়ে দেয়। ওলানের মতো মূক আর অভিব্যক্তিহীন তাদের মুখে দু-একটা কথা যদিও-বা শোনা যায় তা হয় খাবার, নয় পয়সা সম্বন্ধে। টাকাকড়ির ব্যাপারে তারা পেনির ওপরে কিছু ভাবতে পারে না। রুপোর মুদ্রার কথা তাদের মুখে বড় একটা শোনা যায় না; কারণ রুপোর মুদ্রা তাদের হাতে পড়ে না।

বিশ্রামরত অবস্থায়ও এদের মুখ এমন কুঞ্চিত হয়ে থাকে যে, দেখলে মনে হবে, এদের মেজাজ বিগড়ে আছে। আসলে তা রাগের অভিব্যক্তি নয়, বহু বছর ধরে সাধ্যাতিরিক্ত ভারী বোঝা টানার পরিশ্রমে এদের উপরের ঠোঁট উঠে গিয়ে দাঁতের পাটি কুশ্রীভাবে বেরিয়ে আছে। পরিশ্রমের আধিক্যে তাদের চোখ-মুখের চারদিকে গভীর বলিরেখা পড়েছে। এককালে তাদের কেমন চেহারা ছিল এখন নিজেরাই তা ভুলে গেছে। একদিন মাল-বোঝাই একটা গাড়ির আয়নায় নিজের চেহারা দেখে এদের একজন চেঁচিয়ে উঠেছিল এই বলে, কী বিকট চেহারা এ লোকটার। অন্যান্যরা তার কথায় হেসে উঠতেই, সে-ও বিষণ্ন হাসি হাসে। সে তাদের হাসির কারণ ধরতে না পেরে, কোনো অপরাধ ফেলেছে কি না, অপ্রতিভ দৃষ্টি মেলে তাই ভাবে।

যে দরিদ্র বস্তিতে ওয়াঙ লাঙরা থাকে সেখানে অসংখ্য কুঁড়েঘর। একটার উপর আরেকটা যেন স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে—এমনি ঘন-সন্নিবেশিত এই ঘরগুলো। সেখানকার পুরুষেরা বাইরে খাটে আর মেয়েরা ঘরে বারবার সন্তান প্রসব করে। পুরুষেরা বাইরে বেরিয়ে গেলে মেয়েরা ছেঁড়া কপড়ের ফালি জোড়া দিয়ে দিয়ে তাদের সন্তানদের দেহাবরণের জন্য জামা তৈরি করে, কারো ক্ষেত থেকে দু-একটা কপি বা

বাজার থেকে দু'মুঠো চাউল চুরি করে আনে, পাহাড় থেকে সারাবছর ঘাস-পাতা কুড়িয়ে আনে। ফসল-তোলার মওসুমে তারা মুরগির মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জনমজুরদের অনুসরণ করে মাটি থেকে দানা কুড়োয়। এই দরিদ্র কুৎসিত বস্তি-জগতে অসংখ্য শিশুর আনাগোনা। এরা জন্মায় মরে, আবার জন্মায়, আবার মরে। শেষপর্যন্ত এদের বাপ-মা হিসাবে খেই হারিয়ে ফেলে। তারা খবরও রাখে না কয়জন জীবিত আছে, আর কয়জন মরেছে। বাপ-মায়ের কাছে তারা হয়ে পড়ে দায় মাত্র।

এই নারী-পুরুষ আর তাদের সন্তানেরা বাজারে দোকানে আর শহরতলীতে ঘুরে বেড়ায়। পুরুষেরা নামমাত্র মজুরিতে এটা-ওটা করে, আর নারী ও শিশুর দল চুরি করে, ভিক্ষা করে, অন্যের জিনিস কেড়ে আনে। ওয়াঙ লাঙ, তার স্ত্রী আর শিশুরা এই সম্প্রদায়েরই জীব।

বুড়োরা এই জীবনধারা মেনে নেয়, কিন্তু শিশুরা একদিন শৈশব-কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পৌঁছে, তখন এই জীবনধারার প্রতি তাদের মনে অতৃপ্তি জাগে। তাদের ভাষায় প্রকট হয়ে ওঠে মানসিক উত্তেজনা আর বিদ্রোহের ক্রোধবহ্নি। কালে এরা জৈব-প্রয়োজনে বিয়ে করে, জৈব নিয়মে তাদের সন্তান জন্মে, ক্রমবর্ধমান সন্তানসংখ্যা দেখে তাদের মন হতাশায় ভেঙে পড়ে, যৌবনের ক্রোধ-বহ্নি নৈরাশ্যের ভস্মে ঢেকে যায়। একমুঠো ভাতের জন্য তারা সারাজীবন পশুর চেয়েও কঠোর পরিশ্রম করে। তাদের মনের অব্যক্ত বিদ্রোহ গুমরে মরে। এক সন্ধ্যায় এমনি আলাপের ফাঁকে ওয়াঙ জানতে পারে তাদের কুঁড়েসংলগ্ন প্রাচীর অভ্যন্তরের রহস্য।

শীতের শেষের এমনি এক দিনান্তে প্রকৃতির বুকে বসন্তের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বরফ গলে বস্তির মাটিতে কাদা জমেছে, পানিতে ঘর তাদের ভেসে গেছে। মেঝেতে পেতে শোবার জন্য বস্তিবাসীরা খুঁজে কুড়িয়ে আনে খানকয়েক ইট। পিঠের তলায় সিক্ততার অস্বাচ্ছন্দ্যেও রাতের বাতাসে স্নিগ্ধতার অনুভূতি। এই অনুভূতি ওয়াঙকে চঞ্চল করে তোলে, তার চোখে ঘুম আসে না। সে নির্ঘুম চোখে রাস্তায় বেরিয়ে অনড়-অলস দাঁড়িয়ে থাকে।

এই এখানেই তার বুড়ো বাপ রোজ মাটিতে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকে। বুড়োর সাথে আজকাল তার নাতনিটি টলতে টলতে চলে। বুড়ো তার নাতনির কোমরে বাঁধা ছেঁড়া-কাপড়ের ফালির একটা দিক ধরে রাখে। ভিক্ষে করার সময় শিশুটা আর তার মায়ের বুকে পড়ে থাকতে চায় না। নাতনিটাকে আগলিয়ে বুড়োর দিন কাটে। তাছাড়া ওলান আবার অন্তঃসত্ত্বা। তাই বাইরে থেকে এই বড়শিশুটার চাপ মা আর সহ্য করতে পারে না।

খুকি ওঠে, পড়ে, আবার টলতে টলতে ওঠে—আবার পড়ে। বুড়ো খুকির কোমরে বাঁধা কাপড়ের ফালির একটি কোণ ধরে আছে; ওয়াঙ দাঁড়িয়ে তাই দেখে। তার মুখে বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শ লাগে, সঙ্গে সঙ্গে ফেলে-আসা মাটির কামনায় বুক তার উদ্বেল হয়ে ওঠে।

সে বাপকে বলে, "এমন দিনেই তো ক্ষেত চাষ করে গম বুনতে হয়; না বাবা?"

বুড়ো শান্তকণ্ঠে জওয়াব দেয়, "হ্যাঁ বাপ! তুই কী ভাবছিস তা আমি বুঝি রে। জীবনে দু-বার আকালে পড়ে আমি এমনি করে দেশত্যাগ করেছি। ক্ষেতে বোনার বীজ পর্যন্ত ছিল না।"

"আবার তো ফিরে গেছ বাবা!"

"হ্যাঁ বাবা! মাটির টানে ফিরে গেছি।" বুড়ো সংক্ষেপে জওয়াব দেয়।

ওয়াঙ আপনমনে বলে, সে-ও দেশে ফিরবে, এ বছর না হোক আসছে বছর। তারও মাটি আছে। বসন্তের বৃষ্টি-রস-সমৃদ্ধ প্রতীক্ষমাণা মাটির স্মৃতি তার মনে আকুল কামনা জাগিয়ে দেয়।

ঘরে ফিরে সে ওলানকে কর্কশকণ্ঠে বলে, "বিক্রি করার মতো কোনোকিছু হাতে থাকলে তা বিক্রি করে দেশের মাটিতে ফিরে যেতাম। বুড়োকে নিয়েই যত ল্যাঠা, নইলে উপোসপেটেই পায়ে হেঁটে রওনা হতাম। বুড়ো আর এই ছোটমেয়েটা একশো মাইলের পথ যাবে কেমন করে? তার ওপর তোমারও এই দশা।"

ধোয়া বাটিগুলো ওলান ঘরের এককোণে রেখে স্বামীর পানে তাকিয়ে বিষণ্নকণ্ঠে বলে, "এই খুকিটা ছাড়া বেচার মতো আর কিছুই নেই।"

ওয়াঙ লাঙ গর্জে ওঠে, "না, মেয়ে আমি কিছুতেই বেচব না।"

ওলান ধীরে ধীরে বলে, "আমাকেও এক জমিদারবাড়িতে বেচে আমার মা-বাপ পথের কড়ি জুটিয়েছিল।"

"তাই বলে কি তুমিও মেয়ে বেচবে?" ওয়াঙ প্রশ্ন করে।

"শুধু আমার কথা হলে মেয়েটাকে গলা টিপে মারতাম। এই মেয়েটাকে বেচে তোমাকে আমি তোমার দেশে তোমার মাটির বুকে নিয়ে যাব।" ওলানের কণ্ঠে আবেগ কেঁপে ওঠে।

"মেয়ে বেচে আমি দেশে ফিরব না, বরং সারাজীবন এই বিভুঁয়ে পড়ে থাকব।" ওয়াঙ বলে।

বাইরে গিয়ে ওলানের ইঙ্গিত তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার মনকে লোভানি দেয়। মেয়ের নিঃশঙ্ক মুখখানা তার মনের মুকুরে ভেসে ওঠে।

দাদুর হাতের দড়ির বন্ধনে টলে টলে চলার অধ্যবসায় এই বেচারির। বেশ একটু মোটাসোটাও হয়েছে। কথা বলতে এখনো শেখেনি কিন্তু মুখে হাসির ছোঁয়া লেগেই থাকে। তার চোখে চোখ পড়লে মেয়েটা কী খুশিই-না হয়।

"মেয়েটা আমার কোলে বসে এমনি করে না হাসলে ওকে বেচেই দিতাম।" ওয়াঙ আপনমনে বলে।

মাটির স্মৃতি তাকে আবার আকুল-উন্মাদ করে তোলে, সে আর্তনাদ করে ওঠে :

"তবে কি মাটির মায়ের মুখ আর দেখতে পাব না? এই হাড়ভাঙা পরিশ্রম, হীন ভিক্ষাবৃত্তিতে যে পেট চলছে না।"

অন্ধকারের বুক চিরে একটা রুক্ষ কণ্ঠধ্বনি তার জিজ্ঞাসার জওয়াব দেয় :

"তুমি একলাই নও, বন্ধু! তোমার মতো অসংখ্য সর্বহারা এই শহরে রয়েছে।"

ছোট একটা বাঁশের নলে তামাক পুড়ে এগিয়ে আসে ওয়াঙের একজন প্রতিবেশী। দিনের বেলা লোকটা চোখে পড়ে না। দিনে ঘুমায় আর রাতে কাজ করে। পণ্যবোঝাই গাড়ি টানে। ঠেলাগুলো বিরাট বলে দিনের বেলা এগুলো নিয়ে রাস্তার ভিড় ঠেলে চলতে পারে না। ওয়াঙ মাঝে মাঝে তাকে রাত্রিশেষে ধুঁকতে ধুঁকতে ঘরে ঢুকতে দেখে। তার গ্রন্থিল কাঁধদুটো তখন ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ে।

ওয়াঙ তিক্তকণ্ঠে লোকটাকে প্রশ্ন করে :

"তা হলে কি চিরটাকাল এমনি চলবে?"

তামাকে বারকয়েক দম কষে থুতু ফেলে লোকটা জওয়াব দেয় :

"না, চিরকাল এমনিভাবে চলতে পারে না, ধনীদের ধনের আধিক্য আর দরিদ্রের চরম দারিদ্র্য, এ দুটোরও শেষ আছে। গেলবার দুটো মেয়েকে বেচে দিলাম। সে দুঃখও সহ্য করেছি। এবার যদি আর একটা জন্মে, দৈন্যের দায়ে ওটাকেও হয়তো বেচে দিতে হবে। ঘরে রয়েছে মাত্র একটা মেয়ে; বড়মেয়েটা। না-বেচেই-বা কী করব? খাওয়াব কোত্থেকে? না-বেচলে গলা টিপে মারতে হবে যে। কেউ কেউ আঁতুড়েই মেয়েদের গলা টিপে মেরে বালাই শেষ করে দেয়। গরিবদের দৈন্য লাঘবের এ-ও একটা উপায়। ঐশ্বর্যশালীদের ঐশ্বর্যাধিক্য লাঘবেরও একটা উপায় আছে, আমার বিশ্বাস সেদিন খুব দূরে নয়।" এই বলে সে মাথা দুলিয়ে হুঁকোর নলটা দিয়ে প্রাচীরের দিকে ইঙ্গিত করে বলে, "এই প্রাচীরের অভ্যন্তরে কী আছে দেখেছ?"

ওয়াঙ অবাক বিস্ময়ে লোকটার পানে তাকায়, লোকটা বলে যায়—

"আমার একটা মেয়েকে এর ভিতর বিক্রি করতে গিয়ে গিয়েছিলাম। এ বাড়ির সীমাহীন ঐশ্বর্যের ব্যাপার চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না। বাড়ির চাকরেরা পর্যন্ত রুপোর বাঁধানো আইভরির কাঠি দিয়ে ভাত খায়; বাঁদিরা পর্যন্ত কানে মুক্তো আর জেডের দুল পরে। মুক্তো-বসানো জুতো পায়ে দেয়, জুতোতে কাদার ছিটে লাগলে বা এতটুকু ফুটো হলে—মুক্তো-সুদ্ধ জুতো ফেলে দেয়।"

তামাকে একটা জোর দম দিয়ে সে বলে আর ওয়াঙ লাঙ হা করে শোনে, আর ভাবে, "তাহলে—এই প্রাচীরের অভ্যন্তরে তাহলে সত্যি এমন মানুষ আছে!"

"ধনীদের ধনদৌলতের যখন সীমা-পরিসীমা থাকে না—" বলে লোকটা খানিকক্ষণ চুপ থাকে, তারপর আগে যেন কোনো কথাই বলেনি এমনভাবে : সহসা বলে ওঠে, "যাও, কাজ করোগে।" বলেই অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

সে রাতে ওয়াঙের চোখে ঘুম আসে না। বিনিদ্র চোখে সে কেবল ভাবে এই প্রাচীরের ওদিকে কত সোনারুপা আর মাণিক্যের প্রাচুর্য; আর প্রাচীরের এপাশে তার নোংরা ছেঁড়া দেহাবরণ; শীতের লেপ নেই, পিঠের তলে পাতা মাদুরের নিচে আছে শুধু গোটাকয় ইট। তার মনে আবার মেয়েটাকে বেচে ফেলার প্রলোভন জাগে। সে আপনমনে ভাবে : মেয়েটাকে বেচেই ফেলা যাক কোনো বড়লোকের

বাড়িতে। প্রাণ ভরে খাবে, গা ভরে মণিমুক্তোর গহনা পরবে। বড় হয়ে চেহারাখানা সুন্দর হলে কর্তার নেকনজরে পড়লে তো কথাই নেই।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবে : বেচলে দামই-বা কী দেবে; মণি-মুক্তো তো আর দেবে না। দেশে যাবার খরচটা যদি মেলেই, দেশে গিয়ে চাষের বলদ, সাজসরঞ্জাম আর আসবাবপত্র কেনার পয়সা কোথায় পাবে? মেয়ে বিক্রি করে দেশে গিয়ে কি না-খেয়ে মরবে? জমিতে বোনার মতো বীজও তো হাতে নেই।

লোকটা যে বলে গেল উপায় আছে, সে উপায় কই? ওয়াঙ তো কোনো উপায়ই খুঁজে পায় না।

চৌদ্দ

ওয়াঙদের বস্তিতেও বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে। যারা এতদিন ভিক্ষে করে খেয়েছে, তারা এখন পাহাড়ের গা থেকে কচি শাকপাতা তুলে এনে খায়। চুরি করে তরিতরকারি আনার আর প্রয়োজন হয় না। একঝাঁক অর্ধ-উলঙ্গ নারী ও শিশু ভোর না-হতেই বাঁশের ঝুড়ি, টিনের টুকরো, ধারালো পাথর বা ভোঁতা ছুরি নিয়ে পাহাড়াঞ্চলে বেরিয়ে পড়ে। খুঁজে খুঁজে তারা বিনাপয়সায় বিনাভিক্ষায় শাকসবজি আহরণ করে। ওলানও তার দুই ছেলেকে নিয়ে এই দলের সাথে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু পুরুষেরা কাজ করে যায়। ওয়াঙও আগের মতো কাজ করে। কিন্তু সুদীর্ঘ প্রখর দিন, সূর্যের তাপ আর আচমকা বৃষ্টিপাতের উৎপাতে তাদের মন বিরক্তি আর অতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। শীতের মওসুমে তারা পায়ে ঘাসের জুতো পরে বরফের তীব্রতা সহ্য করে নীরবে কাজ করেছে; সাঁঝের আঁধারে ঘরে ফিরে বাড়ির মেয়েদের ভিক্ষা আর তাদের পরিশ্রমে যা জোটাতে পেরেছে, তাই নীরবে গলাধঃকরণ করেছে; গভীর ঘুমে রাত কাটিয়ে অপর্যাপ্ত খাদ্য আর অমানুষিক পরিশ্রমে ক্ষতিগ্রস্ত জীবনীশক্তির কিছুটা ক্ষতিপূরণ করেছে।

কিন্তু বসন্তের আগমনে বস্তিবাসীরা মুখর হয়ে ওঠে। বিলম্বমান গোধূলিতে তারা সবাই কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে জটলা পাকায়। শীতের মওসুমে যেসব প্রতিবেশীদের ওয়াঙ লাঙ দেখতে পায়নি, তাদের সাথে এখন তার দেখাশোনা হয়। বস্তির কোনো খবর ওয়াঙ রাখে না। ওলান স্বল্পবাক, না হলে পাড়ার কে বউকে ঠ্যাঙায়, কুষ্ঠরোগে কার গাল-মুখ ক্ষয়ে গেছে, কে চোরের সর্দার—এসব খবর ওলানের মুখেই শোনা যেত। ওলান এমনি স্বল্পবাক যে, প্রশ্ন না করে তার কাছে কোনো কথার আশা করা বৃথা। ওয়াঙ এই জটলার এককোণে দাঁড়িয়ে এদের কথা শোনে।

এদের মধ্যে বেশির ভাগেরই দিনমজুরি আর ভিক্ষাবৃত্তি একমাত্র অবলম্বন। ওয়াঙ এ সম্বন্ধে সদা-সচেতন যে, সে তাদের কেউ নয়। কারণ সে জমির মালিক। তার জমি তার পথ চেয়ে আছে। আর অন্যদের ভাবনা, আগামীকাল কেমন করে

একটু মাছ খেতে পারবে, কেমন করে বিনাকাজে একটা দিন কাটিয়ে দেবে বা কেমন করে দু'এক পেনি দিয়ে একটু জুয়ার আনন্দ উপভোগ করবে। এরা এদের দৈন্য আর অনটন-ভরা একঘেয়ে জীবনে বেপরোয়া হয়ে একটু আনন্দ উপভোগ কামনা করে।

কিন্তু ওয়াঙ কামনা করে তার মাটির স্পর্শ। সে তার ফেলে-আসা মাটির স্বপ্নে বিভোর হয়ে কত কী ভাবে, তার নৈরাশ্যে মর্মাহত মন তার মাটির বুকে ফিরে যাওয়ার উপায় খোঁজে। এই ধনী-গৃহসংলগ্ন আঁস্তাকুড়ের জীব সে নয়। সে মাটির ছেলে; পায়ের তলায় মাটির স্পর্শে তার জীবনের পূর্ণতা। সে বসন্তে নিজহাতে লাঙল ধরে মাটি চষবে, নিজহাতে কাস্তে দিয়ে ফসল কাটবে; তবে তো তার জীবনের সার্থকতা। তাই সে দূরে থেকে সবার কথা শোনে; তাদের অন্তরঙ্গ হতে পারে না; কারণ তার মনের গহনে রয়েছে মাটির স্বত্বাধিকারের চেতনা—তার বাপ-দাদার উর্বর গমক্ষেত হোয়াঙ-পরিবার থেকে কেনা তার দু'ফালি সুফলা ধানক্ষেত।

তার প্রতিবেশীদের মুখে কেবল টাকাপয়সার কথা। কে কত পেনিতে একটুকরো কাপড় কিনল, আঙুলের মতো ছোট একটা মাছ কে কত দিয়ে কিনল, কার কত দৈনিক উপার্জন—এমনি ধরনের সব কথা। প্রতিদিন তাদের আলোচনা এসে দাঁড়ায়—প্রাচীরের ওপাশের ধনীগৃহের সব ধন হাতে এলে তারা এ দিয়ে কী করবে এই নিয়ে। আলোচনার শেষে প্রত্যেকে বলে :

"তার সঞ্চিত সব সোনা-রুপো আর তার উপপত্নীদের গায়ের মণিমুক্তো আমার হাতে পড়লে—"

এ সমস্যার সমাধানে কেউ বলে, প্রাণভরে মন যা চায়, তাই খাবে। কেউ বলে, এ ধন বুকে নিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে। কেউ বলে, সে প্রাণভরে জুয়া খেলবে। কেউ বলে, সুন্দরী মেয়েমানুষ কিনে স্ফূর্তি করবে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কাজ তারা কেউ করবে না; কারণ ওপাশের বাড়ির মালিক কাজ করে না। পায়ের উপর পা তুলে দিব্যি বসে দিন কাটায়।

এদের কথা শুনে ওয়াঙ লাঙ সহসা বলে ওঠে :

"আমি এইসব সোনা-দানা, মণি-মুক্তো পেলে, এ দিয়ে জমি কিনব—সেই জমিতে ফসল ফলাব।"

সবাই মিলে তাকে তেড়ে আসে। গালি দিয়ে বলে :

"টিকিওয়ালা গেঁয়ো ভূতের কথা শোনো। এই চাষাড়ে বেটা শহরের হালচাল কী বুঝবে? এ বেটা চেনে জমি আর জানে বলদ আর গাধার লেজ মুচড়ে লাঙল চালাতে।" সবাই এমনি ভাব দেখায় যেন তারা প্রত্যেকেই ধনীগৃহের সঞ্চিত ধনলাভের যোগ্য অধিকারী। কারণ, অর্থের সদ্ব্যবহার তাদের জানা আছে।

কিন্তু এই কটুকথায় ওয়াঙের সঙ্কল্প টলে না। সে অন্যকে না-শুনিয়ে আপনমনে বলে :

"আমি সোনা-দানা, মণি-মুক্তো পেলে তা দিয়ে জমি কিনব।"

এরপর যে ভূমিসম্পদে ওয়াঙ সম্পদশালী সেই ফেলে-আসা সম্পদের জন্য মন তার দিনের-পর-দিন উতলা হয়ে ওঠে।

আত্মমগ্ন ওয়াঙের চোখে শহরের নিত্য-অনুষ্ঠিত বৈচিত্র্যময় ঘটনা স্বপ্নের মতো মনে হয়। এসব বৈচিত্র্য সে সহজমনে মেনে নেয়। কতকগুলো কাগজ কারা মাঝে মাঝে বিলি করে, তাকেও দেয়।

ওয়াঙ লাঙ লেখাপড়া শেখেনি কোনোদিন, তাই এইসব কাগজের বুকের কালো দাগগুলোর অর্থ তার কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। এসব কাগজ সে শহর-ফটকে সাঁটা দেখেছে, বিলি করতে বা বিক্রি করতেও দেখেছে। দু'বার সে এ-কাগজ পেয়েছে।

প্রথম দিন একজন বিদেশি তাকে একটা কাগজ দেয়। লোকটা দীর্ঘদেহ কৃশ; বাত্যা-বিধ্বস্ত বৃক্ষের মতো তার চেহারা। লোকটার নীল চোখ, মুখময় দাড়ি; লোমশ লালচে হাত, প্রকাণ্ড টিকলো নাক, নাকটা গালদুটো পেরিয়ে পাহাড়ের অগ্রভাগের মতো বেরিয়ে আছে। লোকটার অদ্ভুত চোখ আর বিকট নাক দেখে শঙ্কিত ওয়াঙ তার দেয়া কাগজটা গ্রহণে এবং প্রত্যাখ্যানে সমানভাবে ভয় পাচ্ছিল। তার হাতে কাগজটা গুঁজে দিয়ে লোকটা চলে গেলে, সে সাহস করে কাগজটা খুলে দেখে। এতে ফাঁসিতে ঝুলানো একটা সাদা মানুষের ছবি আঁকা। লোকটা মরা বলে মনে হয়, সামান্য একখানি কাপড় তার কোমরে জড়ানো, মাথাটা কাঁধের উপর এলিয়ে-পড়া, চোখদুটো বোজা। ছবিটা দেখে ওয়াঙ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। তার মনে যুগপৎ কৌতূহলও জাগে। ছবির নিচে কী যেন লেখা আছে, কিন্তু এ-লেখা তার পড়বার ক্ষমতাই নেই।

দিনের শেষে এ-ছবিটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাপকে দেখায়, তার বাপও তারই মতো মূর্খ। তারা দুজনে ছবিটার সম্ভাব্য অর্থ নিয়ে আলোচনা করে। তার দুই ছেলেও এসে এতে যোগ দেয়। ছেলেরা যুগপৎ আতঙ্কে আর আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে :

"দেখছ, কেমন ঝরনার মতো রক্ত ঝরছে।"

"লোকটা নিশ্চয়ই বদমায়েশ ছিল, তাই ফাঁসির কাঠে ঝুলছে।" বুড়ো বলে।

ওয়াঙ লাঙের আতঙ্ক দূর হয় না। সে ভাবতে থাকে, এই বিদেশি লোকটা এই কাগজ বিলি করছে কেন? হয়তো তারই ভাই এমন উৎপীড়ন সহ্য করেছে আর তার আত্মীয়স্বজন এই উৎপীড়নের প্রতিশোধ চাইছে। তাই দিনকয়েক ওয়াঙ যে-পথে এই বিদেশির দেখা পেয়েছিল সে-পথ এড়িয়ে চলে। কয়েকদিন পর সে এই কাগজটার কথা বেমালুম ভুলে যায়। কুড়িয়ে আনা অন্যান্য কাগজের সাথে ওলান এই কাগজটাও জুতোর সুখতলা মজবুত করার কাজে লাগিয়ে দেয়।

পরে অন্য একজন লোক ওয়াঙকে বিনাপয়সায় আর একখানা কাগজ দেয়। লোকটা এ শহরের বাসিন্দা, সুবেশ যুবক। তার চারদিকে লোক ভিড় করে। সে কাগজ বিলি করতে করতে চেঁচিয়ে কী যেন বলে। এবার যে কাগজ বিলি করছে

সে-কাগজও রক্তমাখা মৃত্যুর ভয়ানক ছবি আঁকা; কিন্তু মৃতব্যক্তি শ্বেতকায় নয়, ওয়াঙ লাঙের মতোই একজন কৃষ্ণকায়, কালো চুল আর মিটমিটে কালো চোখওয়ালা সাধারণ মানুষ। পরনে তার শতচ্ছিন্ন নীল রঙের পোশাক। মৃতদেহটার উপর দাঁড়িয়ে একজন বিপুলদেহ লোক ছোরা-হাতে মৃতদেহটার উপর আঘাত করছে। কী বীভৎস করুণ দৃশ্য! নিচের লেখা পড়ে এ ছবিটার অর্থ উপলব্ধির বাসনা জাগে ওয়াঙের মনে, পার্শ্বে দণ্ডায়মান লোকটাকে সে প্রশ্ন করে, "লেখাটা পড়ে এই ভয়ঙ্কর ছবিটার মর্ম আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারো?" লোকটা জবাব দেয় :

"শান্ত হয়ে নেতার কথা শোনো! উনিই তো সব কথা বুঝিয়ে দিচ্ছেন।" ওয়াঙ কান পেতে শোনে সেই অশ্রুতপূর্ব কথা :

"এই মৃতদেহটা তোমাদের নিজেদের।" যুবক বলে যায়, "এই জল্লাদ লোকটা, যে মৃতদেহে আঘাত হানছে, সে লোকটা হচ্ছে ধনিক আর পুঁজিপতি। মৃতদেহেও তাদের আঘাতের বিরাম নেই। তোমরা নিপীড়িত, নিগৃহীত পদদলিতের দল। তোমাদের এ দশা হচ্ছে তাদের নিষ্ঠুর শোষণের ফলে।"

নিজের দারিদ্র্য সম্বন্ধে ওয়াঙ অবহিত, তবে এতদিন সে এর জন্য দোষারোপ করেছে আকাশের অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টিকে। সময়মতো রোদ-বৃষ্টির দাক্ষিণ্যে মাটি সুজলা-সুফলা হলে, সে নিজেকে দরিদ্র বলে ভাবেনি। রোদ-বৃষ্টির অভাবেই তো আবার আকাল দেখা দিয়েছে। সে তাই মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায় এই অনাবৃষ্টির সাথে এই ধনপতিদের সম্পর্কের কথা। কিন্তু বক্তা এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলে না। ওয়াঙ সাহসে ভর করে প্রশ্ন করে :

"হুজুর! এমন কোনো উপায় আছে কি, যাতে এই অত্যাচারী ধনপতিরা আমাদের মাঠে বৃষ্টিধারা বহাতে পারে, যাতে চাষাবাদ করা চলে?"

একথায় তরুণ বক্তা ঘৃণব্যঞ্জক কণ্ঠে জওয়াব দেয়, "মূর্খ কোথাকার! ইয়া লম্বা টিকি ঝুলছে। বৃষ্টি আপনি না হলে কার সাধ্যি বৃষ্টি নামায়? আমাদের সাথে বৃষ্টির সম্পর্কটা কী? ধনপতিরা যদি তাদের ধন আমাদের সাথে ভাগাভাগি করে খায়, তবে বৃষ্টি হোক, না হোক আমাদের অর্থ আর খাদ্যের অভাব হবে না।"

বক্তার সাথে শ্রোতার দলও চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু ওয়াঙ তার প্রশ্নের সদুত্তর না-পেয়ে অতৃপ্ত চিত্তে ফিরে যায়। তবু তার বুকে গোপন গর্ব রয়েছে—তার জমি আছে। টাকা খরচ করলে ফুরিয়ে যায়, খাদ্য খেলেই শেষ হয়ে যায়। অনাবৃষ্টি হলেই আবার দুর্ভিক্ষ, আবার অনাহার। অবশ্য সে স্বেচ্ছায় কাগজটা নিয়ে যায়, কারণ জুতোর সুখতলার জন্য ওলানের কাগজ চাই। সে ঘরে ফিরে ওলানকে কাগজটা দিয়ে বলে, "এই নাও তোমার জুতো তৈরির উপকরণ।"

সান্ধ্যসভায় সমবেত বস্তিবাসীদের অনেকেই অতি-আগ্রহে তরুণ বক্তার বক্তৃতা শুনেছে। তাদের আগ্রহাতিশয্যের কারণ, প্রাচীরের ওপাশেই রয়েছে একটা টাকার কুমির। তাদের আর সেই ধনপতির মধ্যে রয়েছে গোটাকয়েক ইটের ব্যবধান

মাত্র। তাদের মোটা লাঠির কয়েকটা ঘায়ে এ ব্যবধান নিশ্চিহ্ন করে দেয়া খুব কঠিন নয়। তাদের বোঝা বইবার বাঁকগুলোতেই হবে।

বসন্তের বাতাসে বিক্ষোভ ছড়িয়ে দেয় এই যুবকের দল; এই বিক্ষোভের আঁচ বস্তিবাসীদের মনেও এসে লাগে। তাদের বঞ্চিত করে অন্যেরা অন্যায়ভাবে তাদের প্রাপ্য ভোগ করছে, এই তাদের বিক্ষোভের হেতু। তারা দিনের-পর-দিন গোধূলির আসরে এ নিয়ে আলোচনা করে। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করেও তাদের দু'বেলা আহার জুটছে না। বস্তির তরুণদের মনে ফুলে-ওঠা নদীর তরঙ্গময় প্রবাহের মতো একটা দুর্দমনীয় হিংস্র প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।

ওয়াঙ এসব দেখে ও শোনে। অদ্ভুত এক অসোয়াস্তি নিয়ে তাদের ক্রোধবহ্নির উত্তাপ তার দেহে অনুভব করে; কিন্তু তাদের সঙ্গে এক হয়ে মিলতে পারে না। সে ফিরে পেতে চায় আপন মাটি, আর একমাত্র কামনা তার, দূরে-পড়ে-থাকা মাটি- মায়ের স্নিগ্ধ কল্যাণস্পর্শ।

এ শহরে নিত্যনৈমিত্তিক কত বিচিত্র ঘটনা ঘটে। সেদিন তার চোখের সামনে এমনি এক ঘটনা ঘটে যায়; কিন্তু সে এর তাৎপর্য বুঝতে পারে না। সে রাস্তায় আরোহীর অপেক্ষায় রিকশা নিয়ে বসে আছে। সহসা একদল সশস্ত্র সিপাই একটা লোককে ধরে ফেলে। লোকটা প্রতিবাদ করতেই সিপাইরা ছোরা উঁচু করে তাকে মারতে উদ্যত হয়। বিস্মিত ওয়াঙের চোখের সামনেই তারা আরও কয়েকটা লোককে পাকড়াও করে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ওয়াঙের একজন প্রতিবেশীও আছে।

বিস্ময় কেটে গেলে সে সহসা লক্ষ করে যে ধৃত ব্যক্তিরা তারই মতো খেটে-খাওয়া অজ্ঞ-মূর্খ। ধরা পড়ার কারণ নিরীহ বেচারারা জানে না। শঙ্কিত ওয়াঙ পাশের একটা গলিতে রিকশাটা ঠেলে দিয়ে ছুটে একটা গরম পানির দোকানে ঢোকে, গুঁড়িসুড়ি মেরে একটা পানির গামলার আড়ালে লুকিয়ে থাকে; পাছে সিপাইরা তাকেও ধরে নেয়। সিপাইরা চলে গেলে ওয়াঙ দোকানিকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করে। বুড়ো দোকানি উদাসকণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"কোথাও হয়তো লড়াই চলছে। কেন যে এসব লড়াই হয়, কে জানে। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, একটা-না-একটা লড়াই চলছেই; আমার মৃত্যুর পরও চলবে।"

"কিন্তু সিপাইরা আমার প্রতিবেশীটাকে ধরল কেন? সে নিরীহ লোকটা তো আমারই মতো। লড়াইর খোঁজখবরও রাখে না।" ভীতি-বিহ্বল ওয়াঙ প্রশ্ন করে।

"এই সিপাইরা কোথাও যুদ্ধে যাচ্ছে। ওদের বিছানাপত্র, বন্দুক, রসদ বয়ে নেবার লোক চাই। তাই তারা তোমাদের মতো কুলি-কাবারিদের জোর করে এ কাজে লাগাচ্ছে। তোমার দেশ কোথায় হে? এ শহরে এমন ঘটনা তো আকসার হচ্ছে।"

ওয়াঙ হাঁপাতে হাঁপাতে আবার প্রশ্ন করে, "তারপর—তারা মজুরি দেবে না?"

"মজুরি-টজুরি দেবে না। দেবে হয়তো দু'টুকরো রুটি। পুকুরের পানি আঁজলা ভরে খাও আর রুটি চিবোও। তারপর ভেগে পড়ো, অবশ্য ভেগে পড়ার মতো তাকৎ পায়ে থাকলে।" নির্লিপ্ত কণ্ঠে বুড়ো জওয়াব দেয়।

"কিন্তু এ লোকটার যে স্ত্রী-পরিবার আছে।" ওয়াঙ আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

একটা হাঁড়ির ঢাকনা উঠিয়ে পানি ফুটছে কি না দেখতে দেখতে বুড়ো তাচ্ছিল্য-ভরা কণ্ঠে জওয়াব দেয়, "এ দিয়ে ওদের কী মাথাব্যথা?" একরাশ বাষ্পের জালে বুড়োর বলিবহুল মুখ অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাষ্পের জাল কেটে গেলেই সিপাইরা আবার পথে দেখা দেয়। তারা আরও শক্তসমর্থ লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে। পথটা ইতিমধ্যে জনপ্রাণহীন হয়ে পড়েছে। দয়ালু বুড়ো ওয়াঙকে বলে, "মাথাটা আরও নিচু করে রাখো; সিপাইরা আবার এসেছে।"

ওয়াঙ মাথা নিচু করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রাখে। সিপাইরা খট্‌খট্‌ করে পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলে ওয়াঙ দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে খালি রিকশা নিয়ে নিজের কুঁড়েঘরে পালিয়ে আসে।

শাকপাতা কুড়িয়ে ওলানও সবেমাত্র ঘরে ফিরে রান্নার জোগাড় করছে। ওলানকে সব কাহিনীটা হাঁপিয়ে বলে ওয়াঙ। কী বাঁচাটাই সে আজ বেঁচেছে। একথা বলতেই তার বুক আবার দুরুদুরু কেঁপে ওঠে। যদি সত্যি আজ তাকে ধরে লড়াই'র ময়দানে নিয়ে যেত, তবে তার পরিবারসুদ্ধ সবাই না-খেয়ে মরত। সে নিজেও হয়তো লড়াইয়ের ময়দানে মারা যেত, তার দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটত। তা হলে মাটি-মায়ের মুখদর্শন তার ভাগ্যে আর হত না। বিষাদ-কাতর চোখে স্ত্রীর পানে চেয়ে সে বলে :

"এবার মেয়েটাকে বেচে দেশে যাওয়ার সত্যি লোভ হচ্ছে।"

ওলান তার কথা শুনে কিছুক্ষণ ভেবে তার স্বভাব-নির্বিকার কণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"আর কটা দিন সবুর করো। চারদিকে অদ্ভুত সব কথা হচ্ছে।"

যা হোক, এরপর ওয়াঙ দিনের বেলায় আর ঘর থেকে বেরোয় না। বড়ছেলেটাকে দিয়ে রিকশাটা মালিকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকারে সে শহরের ব্যবসাকেন্দ্রে গিয়ে কুলির কাজে লাগে, সারারাত বিশাল বিশাল বাক্স-বোঝাই গাড়ি টেনে আগের অর্ধেক পয়সা উপার্জন করে। রেশমি কাপড়, সূতি কাপড়, দামি মদ আর সুগন্ধি তামাকে এসব বাক্সগুলো ভর্তি। কাঠের ফাঁক দিয়ে সুগন্ধ নাকে এসে লাগে।

সারারাত সে অন্ধকার পথে রজ্জুতে-বাঁধা গাড়ি টানে; তার নগ্নদেহ থেকে অবিরল ধারায় ঘাম ঝরে, নগ্ন পা ভিজে রাস্তায় পিছলে যায়। কুলিদের আগে আগে এক ছোকরা হাতে মশাল নিয়ে চলে। এই মশালের আলোতে কুলিদের ঘর্মসিক্ত মুখ আর দেহ সিক্ত প্রস্তরমূর্তির মতো চকচক করে।

সূর্যোদয়ের আগেই ওয়াঙ ধুঁকতে ধুঁকতে ঘরে ফিরে আসে। কিছু মুখে দেবার রুচি বা শক্তি তার থাকে না। সে অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের প্রখর আলোতে সিপাইরা যখন পথে-পথে মজুরের খোঁজ করে বেড়ায়, তখন ওয়াঙ তার কুঁড়ের এককোণে খড়ের গাদার আড়ালে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়।

কেন লড়াই হচ্ছে, কারা লড়াই করছে, এ খবর ওয়াঙের জানা নেই। ধীরে ধীরে সারা শহরটা অস্থির আতঙ্কে থমথমে হয়ে ওঠে। সারাদিন শহরের ধনীরা তাদের মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, মণি-মুক্তো আর সুন্দরী স্ত্রীলোকদের নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে নদীর তীরে যায়। সেখান থেকে জাহাজে চড়ে তারা দেশ-বিদেশে পাড়ি দেয়। ওয়াঙ দিনের বেলায় ঘরের বাইরে যায় না; তার ছেলেরা বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে গল্প শোনায় :

"একটা লোক দেখলাম, মন্দিরের দেবতার মতো বিরাট তার দেহ; গায়ে তার হলদে রেশমি পোশাক; তার আঙুলে একটা সোনার আঙটি; আঙটিতে মস্তবড় নীলরঙের পাথর বসানো। দেহখানা ভালো খেয়ে আর তেল মেখে তুলতুলে, চকচকে করে রেখেছে।"

আর একটা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে :

"কত অগুনতি প্রকাণ্ড সব বাক্স-পেটরা নিয়ে যেতে দেখলাম। এগুলোতে কী আছে একজনকে জিজ্ঞেস করতে লোকটা বললে, সোনা-রুপোয় ভর্তি এসব বাক্স-পেটরা। তবে ধনীরা তো আর সবগুলো নিয়ে যেতে পারে না। একদিন এগুলো আমাদেরই হবে। তার একথার অর্থ কী বাবা?" জিজ্ঞাসু-চোখে ছেলেটা বাপের মুখের দিকে তাকায়।

"এই নিষ্কর্মা শহুরে লোকটার কথা আমি বুঝব কেমন করে?" ওয়াঙের এই সংক্ষিপ্ত জওয়াবে ছেলেটা ব্যগ্রকণ্ঠে বলে ওঠে :

"এগুলো আমাদের হলে, এখনই গিয়ে নিয়ে আসতে আমার ইচ্ছা হয়। একটা কেক খেতে আমার বড্ড মন চাইছে। তিলের দানা ছিটানো মিষ্টি কেক আমি কখনো খাইনি।"

একথা কানে যেতেই বুড়ো যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠে আপনমনে বলে, "ফসল ভালো হলে হেমন্ত-উৎসবে আমরা এমন কেক খেয়েছি। পিঠের জন্যে তিল রেখে তবে আমরা তিল বেচেছি।"

নববর্ষ উৎসবে ওলানের পিঠে তৈরির কথা ওয়াঙের মনে পড়ে। চালের গুঁড়ো, চর্বি আর চিনি দিয়ে কী চমৎকার পিঠে বানিয়েছিল ওলান! পিঠের কথা মনে হতেই তার জিভে পানি ওঠে; হারানো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্মৃতিতে বুক তার ব্যথায় টনটন করে ওঠে।

"যদি দেশে ফিরতে পারতাম।" সে অস্ফুটকণ্ঠে বলে।

সহসা ওয়াঙের মনে হয়, আর একটা দিনও এই কুৎসিত কুঁড়েঘরে সে শুতে পারবে না। খড়স্তূপের আড়ালে সে তার পা দুটো পর্যন্ত লম্বা করতে পারে না। একটা রাতও আর সে পশুর মতো পরিশ্রম করতে পারবে না। কোমরে দড়ি বেঁধে সামনে ঝুঁকে পাথুরে রাস্তা দিয়ে এতবড় ভারী বোঝা টানা তার পক্ষে অসম্ভব! দড়িটা যেন তার কোমরের চামড়া কেটে গোশ্‌তে ঢোকে। পথের প্রতিটি পাথরের টুকরো তার দুশমন। চাকার দাগগুলোই তার দোস্ত। এই দাগগুলোতে পা দিয়েই

সে পথের দাঁত-বের-করা পাথরের আঘাত থেকে বাঁচে। অন্ধকার রাত্রে, বিশেষ করে বৃষ্টিভেজা পথে চলতে চলতে সময় সময় তার মনের পুঞ্জীভূত ঘৃণা পায়ের তলার এই পাথরগুলোর উপর পড়ে। এই পাথরগুলোই যেন এই অমানুষিক বোঝার সাথে ষড়যন্ত্র করে বোঝাগুলোকে আরও দুর্বহ করে তোলে।

"হায়, আমার সোনার মাটি!" বলে সে সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। এ দেখে ছেলেরা ভয় পায়; বিস্ময়-বিমূঢ় বুড়ো ছেলেকে দেখে কাতর-চোখে এদিক-ওদিক মুখ মোচড়ায়, মায়ের কান্না দেখে সন্তানের যেমন করে।

এবারও ওলান তার ব্যঞ্জনাহীন কণ্ঠে বলে :

"আর ক'টা দিন স্থির থাকো। একটা কিছু ঘটবে। সবখানে সেসব কথাই হচ্ছে।"

খড়ের গাদার পিছনে লুকিয়ে ওয়াঙ পথচলা সৈন্যদের পদধ্বনি শোনে। চাটাইটা সামান্য একটু সরিয়ে সে ফাঁক দিয়ে দেখে, জুতোপট্টি পায়ে অন্যান্য সৈন্যের সারি তালে তালে পা মিলিয়ে চলছে। রাতের বেলায় কর্মরত অবস্থায় ওয়াঙ মশালের ক্ষণিক আলোতে কতবার এ সৈন্যদের তার পাশ দিয়ে যেতে দেখে আঁতকে উঠেছে। তাদের সম্বন্ধে কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করার সাহসও সে পায়নি। মোহাচ্ছন্নের মতো নীরবে গাড়ি ঠেলেছে; বাড়ি ফিরে একবাটি ভাত মুখে গুঁজে বিকারগ্রস্তের মতো দিনভর খড়-গাদার আড়ালে ঘুমিয়েছে। সারা শহর আতঙ্কগ্রস্ত। যে যার কাজ চটপট সেরে ঘরে গিয়ে দোরে আগল দিয়ে বসে থাকে।

বস্তির সান্ধ্য-আসর আর জমে না। বাজারের দোকানে পণ্যসম্ভার নেই; রেশমি পোশাকের দোকানদারেরা বিজ্ঞাপনের ধ্বজা গুটিয়ে দোকানের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। দুপুরবেলা মনে হয়, শহরটা যেন একটা ঘুমন্তপুরী।

চারিদিকে কানাকানি চলে, শত্রুসৈন্য এসে পড়েছে। সম্পদশালীরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বস্তিবাসী এতে ঘাবড়ায় না; তাদের ঘাবড়াবার কোনো হেতু নেই। তারা জানে না, এই শত্রু কে। হারাবার মতো বিত্ত তাদের নেই। তাদের জীবনেরও কোনো দাম নেই। শত্রুরা আসে আসুক। তাদের বর্তমান অবস্থার চেয়ে দুরবস্থা তো আর হতে পারে না। সবাই আপনমনে চলে; কেউ মন খুলে কারো সাথে আলাপ করে না।

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা মজুরদের জানিয়ে দেয় যে, তাদের মাল টানার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সুতরাং তাদের আর আসতে হবে না। ওয়াঙ লাঙ বেকার হয়ে বাড়িতে বসে থাকে। প্রথমদিকে সে খুশিই হয়েছিল। যাক, শরীরটা এবার বিশ্রাম পাবে, সে মরার মতো পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কিন্তু বেকার বসে থাকলে পেট চলে না। দু-একদিনের মধ্যেই তাদের স্বল্প-সঞ্চয় ফুরিয়ে যায়। ওয়াঙ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মরার ওপর খাঁড়ার ঘা, লঙ্গরখানাগুলোও দরজা বন্ধ। যশ আর পুণ্যলোভী যারা এতদিন দুস্থের সেবা করেছিলেন, তারা ভয়ে আপন বাড়িঘরে খিল এঁটে বসে রইলেন। দুস্থের দল এখন বেকার আর অন্নহীন। নির্জন পথে ভিক্ষাবৃত্তি অচল।

ওয়াঙ মেয়েটাকে কোলে নিয়ে মেয়েটার চোখে চোখ রেখে আদর-সোহাগ করে। বলে, "জাদুমণি! যাবি তুই প্রাচুর্যভরা বাড়িটাতে? পেট ভরে খাবি! নিত্যনতুন জামা পরবি।"

অবোধ শিশু হাসে আর কচি হাত বাপের নিষ্পলক চোখে বুলোয়। বাপের চোখ ফেটে পানি বেরোয়। ওলানকে ডেকে বলে :

"আচ্ছা, হোয়াঙ-পরিবারে যখন ছিলে, তখন কি তারা তোমাকে মারধোর করত?

"রোজ!" ওলান নির্বিকার কণ্ঠে জওয়াব দেয়।

"কী দিয়ে মারত? কাপড়ের ফালি দিয়ে? লাঠি দিয়ে না রশি দিয়ে?" ওয়াঙ ভীত-ব্যাকুল কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে।

ওলান আবার তার স্বভাবসুলভ নির্বিকার কণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"খচ্চর-মারা চাবুক দিয়ে। চাবুকটি সবসময় বাবুর্চিখানার দেয়ালে ঝোলানোই থাকত।"

ওয়াঙ জানে, ওলান তার মনের কথা বুঝতে পেরেছে; তবু সে তার শেষ আশায় বুক বেঁধে আবার প্রশ্ন করে :

"আমাদের মেয়েটা তো এখনই দেখতে বেশ ফুটফুটে। আচ্ছা, সুন্দরী বাঁদিরাও কি মার খায়?"

ওলান তেমনি নির্বিকার জওয়াব দেয় :

"নির্যাতন ভোগ করা আর শয্যাসঙ্গিনী হওয়া সাহেবদের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভর করে। একজনের শয্যাসঙ্গিনী নয়, সে-রাতে যে তার সঙ্গ কামনা করে তারই। সাহেব-তনয়রা একে নিয়ে দর-কষাকষি আর ভাগাভাগি করে, আজ রাত তুমিই নাও, কাল রাতে কিন্তু আমি। সাহেবদের সাধ মিটে গেলে, তাদের উচ্ছিষ্ট নিয়ে চাকরদের মধ্যে কাড়াকাড়ি দর-কষাকষি চলে। শৈশব পার হলেই সুন্দরী বাঁদিকে নিয়ে এই কাড়াকাড়ি, দর-কষাকষি।"

ওয়াঙ মেয়েকে বুকে জড়িয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। বন্যার আবর্তে পড়া অসহায় মানুষের মতো তার মন আর্তনাদ করে, "আর উপায় নেই।" —উপায় নেই।

হঠাৎ একটা আকাশ-ফাটা প্রচণ্ড ধ্বনি শুনে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সবাই উঁচু হয়ে মাটিতে মাথা গুঁজে থাকে। মনে হয়, এই বীভৎস ধ্বনিটা বুঝি তাদের সবাইকে চুরমার করে দেবে। ওয়াঙ লাঙ আপনহাতে মেয়ের মুখ ঢেকে রাখে। সে জানে না, এই ভীষণ গর্জন থেকে কী একটা সাংঘাতিক বিপদ ঘনিয়ে আসবে। বুড়ো ওয়াঙের কানে কানে বলে, "এমনি বিকট ধ্বনি আমি জীবনে শুনিনি।" ছেলেদুটোও ভয়ে চেঁচাতে থাকে। গর্জনটা থামতেই ওলান মাথা তুলে বলে :

"যে কথা এতদিন শুনছিলাম তাই হল। দুশমনেরা শহরের ফটক ভেঙে ঢুকছে।" তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মানবকণ্ঠের একটা ভীষণ কোলাহল শোনা যায়। প্রথমটা বহুদূর থেকে ছুটে আসা ঝড়ের চাপা শোঁ শোঁ ধ্বনি। ধ্বনিটা

আসতে আসতে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আরও কাছে এসে সেই ধ্বনি মানুষের উন্মত্ত চিৎকারে পরিণত হয়। এ চিৎকার শহরের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

ওয়াঙ সরীসৃপের মতো সোজা হয়ে বসে। এক অদ্ভুত শঙ্কা তার দেহ জড়িয়ে ধরে। তার প্রতি লোমকূপে যেন এই সরীসৃপটি কিলবিল করে। তার দেখাদেখি সবাই সোজা হয়ে বসে এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। কেবল চিৎকার—সমবেত মানবকণ্ঠের চিৎকার।

প্রাচীরের গায়ের বিরাট ফটকটা যেন মোচড় খেয়ে আর্তনাদ করে খুলে যায়। এমনি সময় সেই লোকটা, যে একদিন সন্ধ্যায় তামাক খেতে খেতে বলেছিল যে, সবকিছুর একটা উপায় হবে, ওয়াঙের কুঁড়ের ভিতর গলা বাড়িয়ে বলে ওঠে :

"এখনও এখানে বসে আছ? সময় এসেছে। ধনকুবেরের বাড়ির ফটক আমাদের জন্যে খুলে গেছে।" কোনো মন্ত্রশক্তি বলে ওলান লোকটির বগলতলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ওয়াঙ স্বপ্নাবিষ্টের মতো ধীরে ধীরে ওঠে, মেয়েটাকে মাটিতে বসিয়ে বেরিয়ে যায়। বড় বাড়িটার ফটকের সামনে ক্ষুব্ধ-চিৎকারোন্মত্ত অসংখ্য দিনমজুরের জনতা। ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করতে করতে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। ওয়াঙ উপলব্ধি করে, আজ প্রতি ধনীগৃহের ফটকে এমনি বঞ্চিত-ক্ষুধিত, উৎপীড়িত নরনারীর উন্মত্ত জনতা ভিড় করেছে। আজ ক্ষণকালের জন্য তারা ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি করে ফটকের ভিতর ঢুকছে। পিছনের লোকদের ধাক্কায় ওয়াঙও এই জনতায় মিশে গিয়ে জনতার সাথে এগিয়ে চলে। সে জানে না, সে কেন যাচ্ছে; বিস্ময়ের ঘোর তার এখনও কাটেনি।

এমনি করে সে ফটকের সামনে পৌঁছে যায়। লোকের চাপে মাটিতে তার পা ছোঁয় না। উন্মত্ত পশুর অবিরাম গর্জনের মতো উন্মত্ত জনতার চিৎকার বাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মহলের পর মহল জনতার বন্যায় ভেসে ওয়াঙ অন্দরমহলে পৌঁছে। বাড়ির অধিবাসী পুরুষ-নারীর কেউ নেই। মনে হয়, মৃত্যুপুরী; শুধু বাগানের কৃত্রিম পাহাড়ে পদ্ম আর গাছে গাছে বাসন্তী-ফুল ফুটে আছে। খাবার টেবিলে খাবার সাজানো রয়েছে, বাবুর্চিখানার উনুন এখনও জ্বলছে। জনতা বাড়ির প্রতিটি মহলের অবস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানে। তারা দাসদাসীদের মহল ছেড়ে অন্দরমহলে চলে যায়। এটাই বাড়ির সাহেব আর বেগমদের খাসমহল। এখানে রয়েছে অজস্র বিলাস-উপকরণ, মূল্যবান আসবাব আর পোশাক-পরিচ্ছদ। উন্মত্ত জনতা এইসব ঐশ্বর্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; যা-কিছু পায় তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করে : যা নিতে পারে না, তা তছনছ করে দেয়।

এই গোলমালের মধ্যে ওয়াঙ লাঙ কোনোকিছুতে হাত দেয় না। জীবনে সে কোনোদিন পরের দ্রব্য স্পর্শ করেনি। সে জনতার ধাক্কা খেয়ে অতিকষ্টে পাশে চলে আসে। এবার সে নদীতীরের ক্ষীণস্রোতের মতো ধীরে ধীরে জনতার সাথে এগিয়ে যায়।

এমনিভাবে সে যেখানে এসে পৌঁছে, সেটা অন্দরমহলের অভ্যন্তর। বেগমদের বাসস্থান। খিড়কি-দরজাটা এখনও খোলা পড়ে আছে। কত শতাব্দী ধরে বাড়ির মালিকেরা বিপদে পলায়নের জন্য এ দরজাটা রেখে দিয়েছে। তাই এর নাম দিয়েছে 'শান্তি-দ্বার'। এই দরজা দিয়েই তারা সবাই আজ পালিয়ে শহরের এখানে-ওখানে আত্মগোপন করেছে। সেখান থেকে তারা শুনছে এই উন্মত্ত চিৎকার। কেবল একজন পালাতে পারেনি, তা তার দেহায়তনের জন্যেই হোক আর নেশার বুঁদে আছে বলেই হোক। সে একটা ফাঁকা ঘরে লুকিয়ে আছে। জনতার চোখ তার ওপর পড়েনি। লোকটা জনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে ভেবে পালাবার জন্যে বেরিয়ে আসতেই ওয়াঙের সাথে তার সাক্ষাৎ।

লোকটা প্রৌঢ়; তার দেহের মেদ-মাংসের অতিমাত্রায় বাহুল্য। নিশ্চয়ই কোনো সুন্দরী নারীকে শয্যাসঙ্গিনী করে অনাবৃত দেহে নিশি-যাপন করেছে। কারণ, তার দেহে জড়ানো বেগুনি রঙের অসম্বৃত সাটিন জামার ফাঁক দিয়ে তার দেহের নগ্নতা আত্মপ্রকাশ করছে। তার বুকে পেটে থলথলে হলদে গোশ্‌ত, তার দুই গালের পাহাড়ের পেছনে শুয়োরের চোখের মতো দুটো ক্ষুদ্র কুৎকুতে চোখ। ওয়াঙকে দেখে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এমনি চিৎকার করে ওঠে যে, কেউ যেন ছুরি দিয়ে তার দেহের গোশ্‌ত কেটে নিচ্ছে। নিরস্ত্র ওয়াঙের হাসি পায়। মোটা লোকটা তার সামনে জানু পেতে দরজায় মাথা ঠুকে কেঁদে কেঁদে বলে :

"বাঁচাও—বাঁচাও—আমাকে মেরো না। তোমাকে আমি টাকা দেব—অনেক টাকা।"

"টাকা"—এই একটিমাত্র কথায় ওয়াঙের মোহ কেটে যায়। এবার সবকিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। টাকা! হ্যাঁ, টাকা তার চাই। তার মন বলে, "টাকা—তার স্নেহাস্পদ কন্যা রক্ষা পায়—তার মাটি।"

বজ্রকণ্ঠে সে বলে ওঠে, "তা হলে বের করো টাকা।" তার বুকে এমন কঠোরতা আছে, সে তা আগে জানত না।

লোকটা উঠে দাঁড়ায়। কাঁপতে কাঁপতে পকেটে হাত দিয়ে দু-মুঠো সোনার মোহর তুলে ওয়াঙের কোটের কোণে ঢেলে দেয়।

"আরও দাও।" ওয়াঙ আবার চেঁচিয়ে উঠে।

লোকটা আবার দু'মুঠি ভরে মোহর ওয়াঙকে দেয়। কেঁদে কেঁদে বলে :

"আর আমার কিছু নেই, এই হতভাগ্য প্রাণটা ছাড়া।" তার দু-গাল বেয়ে তেলের মতো অশ্রু ঝরতে থাকে।

এই ক্রন্দনরত লোকটার প্রতি সহসা ওয়াঙের বুকে ঘৃণা জাগে। সে চেঁচিয়ে ওঠে :

"বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে, নইলে গুবরেপোকার মতো পিষে মেরে ফেলব।"

এই সেই কোমলহৃদয় ওয়াঙ যে একদিন তার বলদটা জবাই করতে পারেনি। লোকটা খেঁকি কুকুরের মতো তার সামনে থেকে পালিয়ে যায়।

ওয়াঙ এবার একা। হাতে তার বিপুল ঐশ্বর্য। সে মোহরগুলো না-গুনেই পকেটে পুরে খিড়কি-দুয়ার দিয়ে সোজা আপন কুঁড়েঘরে ফিরে যায়।

মোহরগুলো শক্ত করে চেপে ধরে। পূর্ব মালিকের উষ্ণ-স্পর্শ এখনও লেগে আছে মোহরগুলোতে। সে বারবার আপনমনে বলে :

"আর দেরি নয়। কালই দেশে চলে যাব—ফিরে যাব মাটি-মায়ের কোলে।"

পনেরো

দু-একদিনের মধ্যেই ওয়াঙের মনে এমন এক প্রশান্তি নেমে আসে যে, তার মনেই হয় না যে, সে কোনোদিন তার জন্মভূমি ত্যাগ করে প্রবাসী হয়েছিল। সত্যি বলতে কী, তার মন কোনোদিন তার মাটি-মায়ের কোল ত্যাগ করেনি; তার দেহই কেবল প্রবাসী হয়েছিল। তিনটে সোনার মোহর দিয়ে সে দক্ষিণ থেকে কিনে এনেছে ভুট্টা, ধান আর গমের ভালো বীজ। পুকুরে লাগাবার জন্য পদ্মের বীজ, লাল মুলো আর সুগন্ধি বিনের বীজও এনেছে। এসবের চাষ আগে কোনোদিন করেনি সে।

পাঁচ মোহর দিয়ে সে কিনে এনেছে একটা বলদ। বলদটা দিয়ে জমি চষছিল এক চাষা। বাড়ি ফেরার পথে বলদটা তার চোখে পড়তেই ওয়াঙ সপরিবারে সেখানে থমকে দাঁড়ায়। বদলটার মজবুত গর্দান আর লাঙল টানার বলিষ্ঠতা ওয়াঙকে আকর্ষণ করে। সে চাষিকে বলে :

"বড় বাজে বলদটা তোমার! তবে আমার চাষের বলদ নেই। তাই যেরকমই হোক চাষবাসের জন্য একটা বলদ দরকার। কত চাও বলো তো?"

চাষি তার মুখের উপর জওয়াব দেয় :

"আমি বউ বিক্রি করতে পারি কিন্তু বলদ বিক্রি করব না। জোয়ান বলদ আমার, মাত্র তিন বছর বয়েস।" বলেই সে চাষ করতে থাকে।

ওয়াঙ দমে না। এই বলদটাই তার চাই। সে তার বাপ আর ওলানকে জিজ্ঞেস করে, "বলদটা কেমন মনে হচ্ছে?"

বুড়ো বলদটাকে ভালো করে দেখে বলে, "ভালোই তো মনে হচ্ছে।"

ওলান বুড়োর কথার সাথে যোগ দিয়ে বলে, "তবে লোকটা যা বলছে, বলদটার বয়েস এর চেয়ে এক বছর বেশি।"

তাদের কথায় ওয়াঙ কোনো জওয়াব দেয় না। সে বলদটার লাঙল-টানার বলিষ্ঠতা, মসৃণ হলদে রঙ আর কালো চোখ দেখে কেনার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প। এ বলদ দিয়ে সে জমি চাষ করবে, জাঁতায় জুতে গম পিষবে। বলদের মালিককে আবার বলে :

"আমি যথেষ্ট দাম দেব। আর একটা বলদ কিনেও তোমার টাকা বাঁচবে, এ বলদটা আমার চাই-ই।"

অনেক ঝগড়াঝাঁটি, কথা কাটাকাটি, দর-কষাকষির পর চাষা উচিত-মূল্যের দেড়গুণ পেয়ে বলদটা বেচতে রাজি হয়। কিন্তু আজ ওয়াঙের কাছে এই বলদের সামনে টাকা অতি অকিঞ্চিৎকর। সে অবলীলাক্রমে পাঁচটা মোহর চাষির হাতে দেয়। চাষি বলদটা খুলে তার হাতে দিলে সে বলদটার নাকে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে চলে। অধিকারের গর্বে তার বুক ফুলে ওঠে।

তার বাড়ি পৌঁছে দেখে, ঘরের কপাট, চালের খড় কিছুই নেই। চাষাবাদের যন্ত্রপাতিরও চিহ্ন নেই। শুধু পড়ে আছে ঘরের কড়ি-বর্গা আর মাটির দেয়াল। বৃষ্টি আর বরফে দেয়ালও নষ্ট হয়ে গেছে। প্রথম আকস্মিকতা কেটে যাওয়ার পর এসব ক্ষয়ক্ষতি তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। সে শহরে গিয়ে চাষাবাদের যন্ত্রপাতি আর ঘরের চালের জন্য চাটাই কিনে আনে। নিজেদের জমির খড় পেলে আবার দেখা যাবে।

সন্ধ্যাবেলায় ওয়াঙ ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে চোখ মেলে মাঠের বিস্তৃতির পানে তাকায়। তার জমি শীতের বরফ-গলা পানির রসে সমৃদ্ধ হয়ে বীজ-বোনার প্রস্তুতি আর ফসলের প্রতিশ্রুতি নিয়ে অপেক্ষা করছে। বসন্তের ভরা ডোবা থেকে ব্যাঙের একঘেয়ে ঝিমিয়ে-পড়া ডাক ভেসে আসছে। সন্ধ্যার বাতাসে বাড়ির কোণের বাঁশঝাড়ের পাতা দোল খাচ্ছে। গোধূলির আলো-আঁধারে চোখে পড়ে মাঠের ধারের পিচ আর উইলো গাছের সারি। পিচগাছে গোলাপি ফুলের সমারোহ; উইলো গাছে নবকিশলয়ের শ্যামলিমা। প্রতীক্ষমাণ মাটির বুক থেকে ওঠা জোছনাশুভ্র কুহেলিকা তরুবীথিকায় এসে মিশে গেছে।

দিনকয়েক ওয়াঙ কোনো মানুষের উপস্থিতি সহ্য করতে চায় না, সে চায় তার মাটির সঙ্গসুখ কৃপণের মতো একলা ভোগ করতে; মাটির রসে ডুবে থাকতে। সে কারো বাড়িতে যায় না। দুর্ভিক্ষের অত্যাচার সহ্য করে যারা টিকে আছে, তাদের কেউ তার সাথে দেখা করতে এলে সে মারমুখো হয়ে ওঠে। সে চেঁচিয়ে ওঠে এই ব'লে :

"কে আমার দরজা-কপাট চুরি করেছিস? কে আমার চাষের যন্ত্রপাতি চুরি করেছিস? কে আমার ঘরের চাল দিয়ে উনুন ধরিয়েছিস, বল্।"

প্রতিবেশীরা ভালোমানুষের মতো মাথা নাড়ে। কেউ বলে, "তোমার চাচাই এসব অপকর্ম করেছে।" কেউ বলে, "এই দুর্ভিক্ষ আর লড়াই'র দিনে কত চোর-ডাকাত অবাধে সারা দেশময় ঘুরে বেড়িয়েছে! কে বলবে, কারা এসব চুরি করেছে? পেটের জ্বালায়ই তো লোকে চুরি-ডাকাতি করে।"

একদিন প্রতিবেশী চিঙ কোনোমতে আপন দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে ওয়াঙের সাথে দেখা করতে আসে। সে বলে :

"সারাটা শীতকাল একদল ডাকাত তোমার বাড়িতে থেকে, সাধ্যিমতো চারদিকে চুরি করে বেড়িয়েছে। তোমার চাচা তাদের অনেককেই চেনে। কোনো সৎলোকেরই তাদের চেনার কথা নয়। সত্য-মিথ্যা বলতে পারি না। আমি ভালো করে না-জেনে কাউকে দোষ দিতে চাই না।"

চিঙ শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে। তার গায়ের চামড়া হাড়ের সাথে সেঁটে আছে; তার কেশবিরল মাথায় দু-একগাছা যা আছে তা-ও পেকে শাদা হয়ে গেছে। বয়েস তার এখনও পঁয়তাল্লিশ হয়নি; কিন্তু এরই মধ্যে সে বুড়িয়ে জবুথবু হয়ে গেছে। ওয়াঙ তার পানে কতকক্ষণ চেয়ে থেকে করুণার্দ্র কণ্ঠে সহসা বলে :

"আমাদের চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট গেছে তোমার। কী খেয়ে দিন কাটিয়েছ বলো দেখি?"

একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চিঙ অনুচ্চ অস্ফুটস্বরে বলে :

"কী খাইনি, তাই বরং জিজ্ঞেস করো। শহরে ভিক্ষে করে কিছু পাইনি বলে, কুকুরের মতো যা পেয়েছি আস্তাকুঁড় থেকে তাই কুড়িয়ে খেয়েছি। মরা কুকুরের গোশ্‌ত পর্যন্ত খেয়েছি। মৃত্যুর আগে বউ একদিন কিসের গোশ্‌ত এনে সেদ্ধ করে দিল, কিসের গোশ্‌ত তা জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। কারণ জানতাম, কোনো জন্তু মারার মতো সাহস তার নেই। কোনো মরা জন্তু কুড়িয়ে আনা গোশ্‌ত হবে। তাই খেলাম। আমার মতন কঠিন প্রাণ তার নয়। সে দুঃখ-অনশন সইতে না-পেরে মরে গেল। তার মত্যুর পর মেয়েটাকে একটা সিপাই'র হাতে তুলে দিলাম। মেয়েটাও এমনি করে না-খেয়ে তিলে তিলে মরবে, তা চোখে দেখতে পারলাম না।" সে ক্ষণকাল থেমে আবার বলে, "সামান্য বীজ পেলে আবার চাষবাস করতাম; ঘরে একটা দানাও নেই।"

ওয়াঙ রুক্ষস্বরে "এসো" বলে চিঙের হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায়। দক্ষিণ থেকে আনা বীজ থেকে গম, ধান আর কপির বীজের সামান্য পরিমাণ তার ছেঁড়া কোটের এককোণে ঢেলে দিয়ে বলে,

"কাল আমি আমার বলদটা দিয়ে তোমার ক্ষেত চষে দেব।"

চিঙ সহসা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। ওয়াঙও নিজের চোখ মুছতে থাকে। আবেগভরা কণ্ঠে বলে ওঠে, "তুমি আকালের সময়ে যে একমুঠো বিন দিয়েছিলে সে-কথা কি আমি ভুলে গেছি ভাবছ?" চিঙ কোনো সাড়া না দিয়ে নীরবে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়।

চাচা গাঁয়ে নেই দেখে ওয়াঙ খুশি হয়। কোথায় আছে, কেউ ঠিক বলতে পারে না। কেউ বলে শহরে আছে, কেউ বলে স্ত্রী আর পুত্র নিয়ে সে কোনো দূরদেশে চলে গেছে। তার গাঁয়ের বাড়িটা এখন একদম ফাঁকা। তার মেয়েগুলোকে বিক্রি করে দিয়েছে শুনে ওয়াঙ রেগে আগুন হয়ে যায়। এমনকি বসন্তের দাগ-মুখো ছোটমেয়েটাকে পর্যন্ত এক সিপাই'র কাছে সামান্য কয় পেনি পেয়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

ওয়াঙ এবার নিজেকে ক্ষেতের কাজে জোর লাগিয়ে দেয়। খাবার-শোবার সময়টুকু নষ্ট করতেও তার মন চায় না। খানকয়েক রুটি আর গোটাকয় কোয়া-রসুন মাঠে নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোথায় কী বুনবে তাই ভাবে আর

খায়। এই তার ভালো লাগে। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লে সে চষাজমিতে গা এলিয়ে দেয়। মাটির উষ্ণস্পর্শ গায়ে লাগতেই তার চোখে ঘুম নেমে আসে।

ওলানও বাড়িতে অলস হয়ে বসে থাকে না। সে নিজের হাতে চাটাই দিয়ে চাল ছায়; মাঠ থেকে মাটি এনে গুলে দেয়াল মেরামত করে, এবড়ো-থেবড়ো মেঝেটা নিকোয়; নতুন করে মাটির উনুন বানায়।

একদিন ওলান স্বামীর সাথে শহরে যায়। দুজন মিলে বিছানাপত্র, একটা টেবিল, কটা বেঞ্চ, একটা বড় লোহার কড়াই কেনে। শখ করে তারা একটা ফুল-তোলা মেটে চা-দানি আর তার সাথে মিলিয়ে আধডজন চায়ের পেয়ালাও কিনে আনে। এসব কেনাকাটার পর তারা এক ধূপকাঠির দোকানে গিয়ে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটা কাগজের তৈরি ধন-দেবতার ছবি, একটা দস্তার শামাদান, একটা দস্তার ধূপদান, দেবতার সামনে জ্বালাবার জন্য গরুর চর্বি ও দুটো লাল মোমবাতি কেনে।

ওয়াঙ ক্ষেত্রদেবতার যুগলমূর্তির কথা ভোলে না। বাড়ি ফেরার পথে সে মন্দিরে উঁকি দেয়। কী করুণ-দৃশ্য। বৃষ্টির ঝাপটায় দেবতাযুগলের চোখ-কান-মুখ ধুয়ে গেছে, দেহের রঙ ধুয়ে মুছে মাটি বেরিয়ে পড়েছে। কাগজের পোশাক ছিঁড়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের বছরে কেউ এদের ওপর দৃষ্টি দেয় না। ওয়াঙ যুগলমূর্তির পানে তাকিয়ে তৃপ্তিতে চেঁচিয়ে ওঠে—দুষ্টু শিশুকে মা-বাপ যেমন বলে :

"বেশ জব্দ হয়েছ। মানুষর অকল্যাণ করলে এমন দশাই হয়।"

ওয়াঙের বাড়িটা আবার খুশিতে উপচে উঠে। দস্তার শামাদানে লাল মোমবাতি জ্বলে, টেবিলের উপর চা-দানি আর চায়ের পেয়ালা চকচক করে। ওয়াঙের শোবার ঘরের ঘুলঘুলিতে নতুন কাগজ সাঁটা হয়েছে, চৌকাঠের গায়ে নতুন কপাট বসেছে।

ওয়াঙের মন অজানা শঙ্কায় ভরে ওঠে। এত সুখ কি তার সইবে? ওলান আবার ভাবী-মাতৃত্বে সম্ভাবনাময়ী। তার ছেলেরা নাদুসনুদুস কুকুর-বাচ্চার মতো দাওয়ায়—আঙিনায় খেলার ছলে গড়াগড়ি-খায়; দক্ষিণ দেয়ালে হেলান দিয়ে বুড়ো স্মিতমুখে তৃপ্তিতে ঝিমোয়। ওয়াঙের ক্ষেতে কচিধানের অপূর্ব শ্যাম-সবুজ মাধুরী, সবুজ মুকুট-শোভিত মাটির বুক-ফোঁড়া বিন গাছের নীল আকাশের সাথে চোখ-ঠারাঠারি। হিসেব করে খরচ করলে হাতের টাকায় ফসল-তোলার মওসুম পর্যন্ত নাগাল পাবে। আকাশের তলে ক্রীড়ারত শুভ্র মেঘের পানে তাকিয়ে আর মাটির বুকে রৌদ্র-বৃষ্টির সুসমঞ্জস দাক্ষিণ্য অনুভব করে, ওয়াঙ লাঙের মুখ দিয়ে স্বতস্ফূর্ত বেরিয়ে পড়ে :

"মন্দিরের দেবতাযুগলের সামনে দুটো ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিতেই হবে। শত হোক, মাটির ওপর তাদের অসীম ক্ষমতা।"

ষোলো

কোনো এক রাতে শয্যাসঙ্গিনী ওলানের বুকের মাঝখানে ওয়াঙ শক্ত পুঁটলির মতো কী একটা অনুভব করে প্রশ্ন করে :

"কী রেখেছ এখানে?"

ওলান প্রথমটায় প্রচণ্ড উগ্রতায় সরে যায়, কিন্তু ওয়াঙ সজোরে তার বুক থেকে পুঁটলিটা ছিনিয়ে নিতে চায় দেখে ক্ষোভে-দুঃখে নিজেই পুঁটলিটা বের করে দেয়।

"এবার খুব দ্যাখো।" বলে সে ওয়াঙের হাতের ওপর পুঁটলিটা ছুড়ে ফেলে।

ওয়াঙ ছেঁড়া নেকড়ায় জড়ানো পুঁটলিটা খুলে ফেলে। পুঁটলি থেকে সহসা বেরিয়ে পড়ে একরাশি মণিমুক্তো। ওয়াঙ এগুলোর পানে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

এতগুলো মণিমুক্তোর একত্র সমাবেশ কেউ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। এ যেন কোলের ওপর সাতরঙা রামধনু, তরমুজের শাঁসের মতো লাল, পাকা গমের মতো সোনালি, বাসন্তী-কিশলয়ের মতো সবুজ ঝর্নাধারার মতো স্বচ্ছ—এগুলোর নাম ওয়াঙ জানে না। জীবনে হীরা-জহরতের নাম ওয়াঙ শোনেনি; হীরা-জহরত চোখেও দেখেনি সে কোনোদিন। কিন্তু তার রুক্ষকঠোর হাতের মুঠোয় ঘরের আবছা-আলোতে এগুলোর দীপ্তি দেখে, তার মনে হয়, সে মহা-ঐশ্বর্যের অধিকারী। বর্ণ-সুষমা আর গঠন-সৌকর্যের মহিমায় নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে সে এগুলো হাতের মুঠোতে ধরে রাখে। তারা দুজনে নির্নিমেষ চোখে অনেকক্ষণ ধরে মুঠো-ভরা ঐশ্বর্যের পানে চেয়ে থাকে। অবশেষে ওয়াঙ মৌনতা ভেঙে রুদ্ধশ্বাসে চুপি চুপি প্রশ্ন করে :

"কোথায়—কোথায় পেলে এসব?"

ওলান অনুচ্চকণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"সেই বড়বাড়িটায়। নিশ্চয়ই কোনো সাহেবের পেয়ারা বেগমের সম্পত্তি। দেয়ালের একটা জায়গায় একখানা আলগা ইট চোখে পড়ল, ধীর উদাসীনভাবে চুপি চুপি সেখানে গেলাম, যাতে অন্য কেউ দেখে আবার ভাগ না বসায়। ইটটা সরিয়ে ঝকঝকে জিনিসগুলো জামার হাতায় চট করে লুকিয়ে ফেললাম।"

সপ্রশংস দৃষ্টিতে সে ওলানের পানে চেয়ে প্রশ্ন করে, "সেখানে এসব লুকানো আছে, তা তুমি জানলে কেমন করে?"

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে ওলান জওয়াব দেয় :

"আমি বড়লোকের বাড়িতে থাকিনি নাকি? বড়লোকেরা স্বভাব-ভিতু। এক আকালের বছরে হোয়াঙ-মঞ্জিলে ডাকাতরা হানা দেয়, তখন বাঁদিরা, উপপত্নীর দল, এমনকি বড়বেগমকে পর্যন্ত ছুটাছুটি করে তাদের গয়নাগাঁটি এমনি গোপনস্থানে লুকিয়ে রাখতে দেখেছি, তাই আলগা ইটের তাৎপর্য আমি জানি।

তারা দুজন আবার স্তব্ধ অপলক চোখে মণিমুক্তোগুলোর পানে চেয়ে থাকে—অনেকক্ষণ পর ওয়াঙ দৃঢ়কণ্ঠে বলে :

"এমন দামি জিনিস ঘরে রাখা নিরাপদ নয়, হয় বিক্রি করে দিতে হবে, নয় কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে। তবে জমি কেনাই ভালো, এর চেয়ে নিরাপদ আর কিছু নেই। কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে, আমাদের বাঁচতে হবে না। ডাকাতরা আমাদের খুন করে এগুলো নিয়েই চম্পট দেবে, এ দিয়ে কালই জমি কিনতে হবে, নইলে দুর্ভাবনায় আমার ঘুম হবে না।"

পাথরগুলো পুঁটলি বেঁধে সে তার কোটের বুকপকেটে রাখতে যাচ্ছে এমন সময় অকস্মাৎ ওলানের মুখের উপর তার চোখ পড়ে, শয্যাপ্রান্তে ওলান নতমুখে বসে আছে, তার স্বল্পবাক নির্লিপ্ত মুখে অস্পষ্ট কামনার আবেগ। ঠোঁটদুটো আবেগে কাঁপছে।

"তোমার আবার হল কী?" সে ওলানকে প্রশ্ন করে।

"সবগুলোই কি বিক্রি করে দেবে?" ওলান ভাঙা-গলায় চুপি চুপি স্বামীকে শুধায়।

"কেন বেচব না? এই মেটে বাড়িতে এমন দামি জিনিস রেখে কী হবে?" ওয়াঙের কণ্ঠে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি।

"যদি দুটো মাত্র পাথর—ছোট্ট দুটো মুক্তো—রাখতে পারতাম!" কাকুতিভরা-কণ্ঠে ওলান জওয়াব দেয়।

"মুক্তো!" ওয়াঙের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

"আমি এগুলো পরব না—কাছে রেখে দেব মাত্র।" মিনতি ফুটে ওঠে ওলানের নিরীহ কণ্ঠে। কথা বলেই সে চোখ নামিয়ে বিছানায় একটা আলগা সুতোয় পাক দিতে দিতে ওয়াঙের উত্তরের প্রতীক্ষা করে।

ওয়াঙ কিছু না-ভেবে একমুহূর্ত এই বুদ্ধিহীনা জীবটির পানে তাকায়। এ জীবটি সারাজীবন মুখ বুজে খেটেছে; কোনোদিন পুরস্কার পায়নি। বড়লোকের বাড়িতে বাঁদি হয়ে অন্যের দেহে এ মূল্যবান মণিমুক্তোর চাকচিক্য দেখেছে। ওগুলো ছুঁতে পারেনি; চোখে দেখেছে মাত্র।

"মাঝে মাঝে হাতে নিয়ে দেখতে পারতাম!" ওলান আগের কথার জের টেনেই যেন আপন মনে বলে।

এক অজানা দরদে ওয়াঙের বুক ভরে ওঠে, নীরবে পুঁটলিটা খুলে ওলানের হাতে তুলে দেয়, ওলান তার রুক্ষ কঠিন হাতদুটো আলতো করে দীর্ঘক্ষণ পাথরগুলো হাতড়ে মুক্তোদুটো বের করে পুঁটলিটা আবার বেঁধে স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দেয়। এবার সে নিজের কোটের একটা কোণ ছিঁড়ে মুক্তোদুটো জড়িয়ে বুকে লুকিয়ে রেখে তবে স্বস্তি অনুভব করে।

বাকি পাথরগুলো দিয়ে কী করবে, তাই ভেবে শেষপর্যন্ত ওয়াঙ মনস্থির করে ফেলে যে, হোয়াঙ-মঞ্জিলে খোঁজ নিয়ে দেখবে, কেনার মতো জমি আর তাঁদের আছে কি না।

তাই করে। হোয়াঙ-মঞ্জিলের ফটকে এখন আর কোনো দরোয়ান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঁচিলের চুলে পাক দেয় না। বাড়ির ভিতরে ঢুকবার অধিকারহীনদের পানে অবজ্ঞাভরে তাকায় না। ফটক বন্ধ, ওয়াঙ ফটকে আঘাত করে কিন্তু সাড়া পায় না। পথচারীরা তাকে বলে :

"সারাদিন ধাক্কিয়ে মরো, কোনো লাভ হবে না। বুড়ো সাহেব জেগে থাকলে আসতে পারে। আর কোনো বাঁদি থাকলে হয়তো কৃপা করে ফটক খুলতে পারে।"

ওয়াঙ আঙিনায় পায়ের শব্দ শুনতে পায়; এলোমেলো শব্দ, ফটকের খিল খুলে কে যেন ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করে :

"কে?"

বিস্মিত ওয়াঙ বেশ জোরেই সাড়া দেয়, "আমি ওয়াঙ লাঙ।"

বিরক্ত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করে, "ওয়াঙ লাঙ বেটা আবার কে?"

এই গালাগালির বহরেই ওয়াঙ বুঝতে পারে, এ বুড়ো জমিদার স্বয়ং। আজীবন চাকর-বাঁদিকে গালাগালি করে গালাগালিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। ওয়াঙ বিনয়নম্র কণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"হুজুর! একটু কাজে এসেছিলাম। হুজুরকে বিরক্ত করতে আমি আসিনি; আপনার গোমস্তাকে পেলে তার সাথেই কাজটা সেরে নিতে পারতাম।"

ফটকটা আর ফাঁক না করেই জমিদার তিক্তকণ্ঠে জওয়াব দেয়, "সেই জাহান্নামি বেটার কথা বলছ? কুকুরটা অনেকদিন আগে এখান থেকে পালিয়েছে!"

উত্তর শুনে ওয়াঙ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কোনো লোক মারফত ছাড়া কর্তার সাথে সরাসরি জমি বেচাকেনার কথা বলা অসম্ভব। কিন্তু দামি পাথরগুলো যে তার বুকে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। সে এগুলো থেকে নিষ্কৃতি চায়। জমিরও তার প্রয়োজন। যে বীজ তার হাতে আছে, সে বীজ দিয়ে তার যে-পরিমাণ জমি আছে, সে-জমির দ্বিগুণ জমি চাষাবাদ চলে। তাই হোয়াঙদের উর্বর জমি তাকে পেতেই হবে।

সঙ্কোচ-জড়িত কণ্ঠে সে বলে :

"সামান্য টাকা-পয়সা হাতে ছিল—"

সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো জমিদার দরজা বন্ধ করে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, "না, না, এ বাড়িতে টাকা নেই। সেই জাহান্নামি চোর গোমস্তা বেটা—সে বেটার গোষ্ঠী জাহান্নামে যাক—আমার সব লুটে নিয়ে গেছে, দেনা পরিশোধের পয়সা এ বাড়িতে নেই।"

"না না," ওয়াঙ তাড়াতাড়ি বলে, "আমি টাকা দিতে এসেছি, আদায় করতে আসিনি।"

এবার তীক্ষ্ণ স্ত্রী-কণ্ঠ কানে আসে। একজন স্ত্রীলোক ফটকের বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বলে :

"এমন মধুর কথা অনেকদিন শুনিনি—টাকা দেওয়ার কথা!" ওয়াঙ দেখতে পায় এক সুন্দরী নারী—মুখে তার শয়তানির ছাপ—তার পানে চেয়ে ডাকছে, "ভিতরে এসো বাছা।" সে ফটকটা খুলে দেয়, অবাক ওয়াঙ ভিতরে ঢুকতেই সে আবার ফটক বন্ধ করে দেয়।

বুড়ো জমিদার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে খকখক করে কাশে। একটা পুরনো-ময়লা সাটিনের জামা তাঁর পরনে; জামাটার কানায় কানায় ঝুলছে অতীত ঐতিহ্যবাহক পশুলোমের ছিটেফোঁটা। জামাটা একদিন দামি ছিল; জামার কাপড়টা এখনও বেশ মোটা আর মসৃণ, যদিও এখানে-ওখানে দাগ আর অতিব্যবহারে কুঁচকে আছে মনে হয়। মনে হয়, অধুনা শয়ন-বাসরূপেই এটা

ব্যবহৃত হয়। শঙ্কা-বিজড়িত কৌতূহল নিয়ে ওয়াঙ এবার জমিদারের পানে তাকায়। সারাজীবন এ বাড়ির লোকদের সে ভয় করে এসেছে। যে পরাক্রান্ত জমিদারের কাহিনী সে এতদিন শুনেছে, এই জরাজীর্ণ বুড়োই সেই জমিদার। অবিশ্বাস্য! ওয়াঙের বুড়ো বাপের চেয়ে তো ভীষণ নয় এই নির্জীব বুড়ো। তাঁর দৈহিক অতি-স্থূলত্বের সাক্ষ্য রয়েছে তার থলথলে অতি-শিথিল দেহ-ত্বকে, জীর্ণ কঙ্কাল-খোলসে। কতদিন সে গোসল করেনি; কামায়নি। বারবার চিবুকে হাত বুলোবার সময় তার পীতবর্ণ হাতখানা কেঁপে কেঁপে ঝুলে-পড়া ঠোঁটে লাগে।

স্ত্রীলোকটা কিন্তু অন্যরকম। বেশ ছিমছাম, কিন্তু স্নিগ্ধতা নেই কোথাও। তার কঠোর-প্রখর মুখাবয়বে শিকারি বাজপাখির টিকলো নাক, কালো কুচকুচে চোখ, পাণ্ডুর চামড়া হাড়ের সাথে সেঁটে-বসা; তার রক্তিম গণ্ডদেশ আর ঠোঁটে অদ্ভুত কাঠিন্য। তার কালো চিকন মসৃণকেশে মুকুরের প্রতিফলন-ক্ষমতা। কিন্তু তার ভাষা ও ভঙ্গিতে আভিজাত্যের অভাব প্রকট; মনে হয়, সে এ বাড়ির কেউ নয়, বাঁদি মাত্র। কর্কশ কণ্ঠস্বর; রসহীন রসনা। অতীতের বহুজন-অধ্যুষিত মহলে বর্তমানে এই দুই প্রাণী—এই নারী আর বৃদ্ধ জমিদার ছাড়া আর কেউ নেই।

"এবার লেনদেনের কথা।" স্ত্রীলোকটা বিরস-কণ্ঠে বলে ওঠে। কিন্তু ওয়াঙ বুড়ো জমিদারের সামনে কথা তুলতে সঙ্কোচ বোধ করে। চতুরা স্ত্রীলোকটা বুঝতে পারে। কোনোকিছু চট করে বুঝে ফেলার ক্ষমতা অসাধারণ। সে বুড়ো জমিদারকে আদেশের সুরে বলে, "তুমি সরে পড়ো দেখি!"

বুড়ো জমিদার নীরবে পুরনো মখমলের জুতোপায়ে কাশতে কাশতে বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রীলোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওয়াঙ কী বলবে ঠিক করতে পারে না। বাড়িটার নিঝুম পরিবেশ তার মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। সে ভিতর-মহলের পানে তাকায়। সেখানেও নির্জন স্তব্ধতা বিরাজমান। বাড়িটার চারদিকে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, মনে হয় বহুদিন ধরে এ বাড়িতে ঝাঁট পড়েনি।

"ওহে কাঠ-বোকা!" স্ত্রীলোকটা সহসা বলে ওঠে। এই অপ্রত্যাশিত কর্কশ কণ্ঠের আপ্যায়নে ওয়াঙ চমকে লাফিয়ে ওঠে—"কী কাজ বলে ফ্যালো, টাকা-পয়সা সঙ্গে থাকলে বের করো দেখি।"

ওয়াঙ সাবধান হয়ে যায়, "না, টাকা-পয়সা সঙ্গে এনেছি তা তো আমি বলিনি। আমি বলেছি, কাজ আছে।" ওয়াঙ জওয়াব দেয়।

"কাজ। কাজ অর্থই টাকা!" স্ত্রীলোকটা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, "টাকা হয় আসবে নয় বেরিয়ে যাবে, তবে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার মতো টাকা নেই।"

"কিন্তু লেনদেনের কথা তো আর স্ত্রীলোকের সাথে চলে না?" ওয়াঙ মৃদু আপত্তি জানায়। পরিস্থিতিটা সে এখনও বুঝতে পারছে না, তাই বোকার মতো চারদিকে তাকায়।

"তা কেন চলবে না?" কড়া মেজাজে স্ত্রীলোকটা জওয়াব দেয়, তারপর সহসা চিৎকার করে ওঠে, "জানিস না বেআক্কেল, এ বাড়ি আর জনপ্রাণী নেই?"

ওয়াঙ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে স্ত্রীলোকটার পানে চায়, স্ত্রীলোকটা আবার চেঁচায়, "আমি আর এই বুড়ো ছাড়া এখানে আর কোনো প্রাণী নেই।"

"কোথায় গেল তাহলে?" ওয়াঙ সভয়ে শুধায়।

"বড়বেগম মারা গেছেন।" স্ত্রীলোকটা তার স্বাভাবিক বিরস-কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে। "কানের মাথা খেয়ে শুনিসনি, এ বাড়িতে ডাকাত পড়ে দাসী-বাঁদি, ধন-দৌলত যা ছিল নিয়ে গেছে? তারা বড়সাহেবকে দুই পায়ের বুড়ো আঙুলে বেঁধে ঝুলিয়ে মারধোর করেছে, বড়বেগমকে চেয়ারের সাথে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে রেখেছিল যাতে চিৎকার করতে না পারে। দেখে সবাই যে যেখানে পারল পালাল। আমি পালাইনি। একটা ঢাকা চৌবাচ্চায় লুকিয়েছিলাম। ডাকাতেরা চলে গেলে বেরিয়ে দেখি, বড়বেগম বন্দি অবস্থায় মরে আছেন। তাকে অবশ্য ডাকাতেরা স্পর্শও করেনি। তিনি ভয়ে পটল তুলেছেন। শরীরে তো তাঁর আফিম খেয়ে খেয়ে কিছুই ছিল না, তাই ভয়ের ধাক্কা সামলাতে পারেননি।"

"চাকর-দাসী? দরোয়ান?" ওয়াঙ ভয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করে।

"তাদের কথা বলছ? তারা তো অনেক আগেই পালিয়েছিল। অবশ্য পালাবার মতো শক্তি যাদের ছিল। গত শীতের মাঝামাঝি বাড়িতে খাবার আর টাকা কোনোটাই ছিল না।" তারপর কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে স্ত্রীলোকটি বলে, "আসলে এই চাকরদের মধ্যে অনেকেই ডাকাতদলের সঙ্গে এসেছিল। ঐ দরোয়ান কুকুরের বাচ্চাকে তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি। সে বেটাই তো ডাকাতদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল! অবশ্য বুড়ো সাহেবের সামনে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তাকে চিনতে কি আমার ভুল হয়? তার আঁচিলের চুল তিনটে ফেলবে কোথায়? আর জানাশোনা লোক না হলে এ বাড়ির কোথায় কী আছে জানবে কে? পুরনো গোমস্তাও যে এতে ছিল না, তা আমি বলব না, তবে সে এ বাড়ির দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়।"

এই বলে স্ত্রীলোকটা নীরব হয়ে যায়, চারদিকে মৃত্যুপুরীর নীরবতা নেমে আসে। স্ত্রীলোকটা আবার বলতে থাকে :

"এ অবস্থা তো একদিনে হয়নি! বুড়ো জমিদার আর তার বাপের আমল থেকেই এ বাড়ির অধঃপতন শুরু হয়েছে। জমিদার নিজে জমিদারি দেখাশোনা ছেড়ে দিয়ে গোমস্তার হাতে দিলেন। গোমস্তা তাদের টাকা দেন আর তারা দুহাতে পানির মতো তা নিঃশেষ করেন। এই তো অবস্থা। হাল আমলে একখানা দুখানা করে জমি বিক্রি শুরু হল।"

"জমিদারের ছেলেরা কোথায়?" ওয়াঙ রূপকথার অবাক-শ্রোতার মতো সহসা প্রশ্ন করে।

"এখানে-ওখানে রয়েছেন।" নির্লিপ্ত উদাস-কণ্ঠে স্ত্রীলোকটা জওয়াব দেয়। "কপাল ভালো, দুটো মেয়ের বিয়ে আগেই হয়ে গেছল। দুর্ঘটনার খবর শুনে বড়ছেলে বাবাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিলেন, আমিই যেতে দেইনি। এই নির্জন পুরীতে কে থাকবে? আমি মেয়েমানুষ এখানে একলা থাকব কেমন করে?"

এই কথাগুলো বলার সময় তার ঠোঁটের কোণে ভক্তির রেখা দেখা দেয়। সে অবনত-দৃষ্টিতে কতকক্ষণ চুপ করে আবার বলে, "তা ছাড়া আমি এই বুড়ো সাহেবের অনেক কালের সেবাদাসী, আমার অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।"

ওয়াঙ তার পানে একবার তীক্ষ্ণচোখে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে আসল ব্যাপারটা উপলব্ধি করে। এই মরণযাত্রী বুড়োকে আঁকড়ে ধরে থাকার উদ্দেশ্য, তাঁর মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ।

ওয়াঙ এবার ঘৃণাব্যঞ্জক সুরে বলে :

"তুমি দেখছি এ বাড়ির একজন বাঁদি, তোমার সাথে লেনদেন করব কেমন করে?"

একথায় স্ত্রীলোকটা জওয়াব দেয়, "আমি যা বলব, বুড়োসাহেব তাই করবেন।"

ওয়াঙ এ সম্বন্ধে খানিকক্ষণ গভীর চিন্তা করে। জমি যখন আছে, সে না কিনুক অন্য কেউ এই মেয়েটার মারফতেই এ জমি কিনবে।

"কত জমি আর আছে?" ওয়াঙ অনিচ্ছায় মেয়েটাকে প্রশ্ন করে।

তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মেয়েটা জওয়াব দেয়, "সত্যি যদি জমি কিনতে চাও, তবে বিক্রির জমি যথেষ্ট আছে। পশ্চিমদিকে শ-খানেক একর আর দক্ষিণদিকে দুশো একর! একখানে নেই; জায়গায় জায়গায় রয়েছে।"

হিসাবটা এমন অবলীলাক্রমে দিয়ে দেয় যে, ওয়াঙের বুঝতে দেরি হয় না যে, বুড়ো জমিদারের সম্পত্তির কড়া-ক্রান্তির হিসাব মেয়েটার কাছে আছে। তবু বিশ্বাস করে মেয়েটার সাথে লেনদেনটা করতে তার মন চায় না।

"ছেলেদের মত না নিয়ে তো বড়সাহেব পরিবারের সব সম্পত্তি বেচতে পারেন না।" ওয়াঙ মেয়েটাকে শুধায়। মেয়েটা বলে :

"ছেলেরা তাকে জমি বিক্রি করতে বলে দিয়েছে। এখানে ছেলেরা কোনোদিন বসবাস করতে আসবে না। বিশেষ করে দুর্দিনে চোর-ডাকাতের যা উপদ্রব! ছেলেরা জমি-বিক্রির টাকার ভাগ পেলেই খুশি।"

"কিন্তু টাকাটা আমি দেব কার হাতে?" ওয়াঙ আবার প্রশ্ন করে।

"বড়সাহেবের হাতে ছাড়া আর কার হাতে?" মেয়েটা সহজকণ্ঠে জওয়াব দেয়। কিন্তু ওয়াঙ বোঝে, বড়সাহেব হাতে নিলেও শেষপর্যন্ত এই মেয়েটার হাতেই পড়বে।

ওয়াঙ মেয়েটার সাথে আর কথা না বলে অন্য সময় আসবে বলে বেরিয়ে পড়ে। মেয়েটা তার সাথে ফটক পর্যন্ত এসে পিছন থেকে তাকে বলে, "কাল এমনি সময় বা আজ বিকেলবেলায় যে-কোনো সময় আসতে পারো।"

মেয়েটার কথার জওয়াব না দিয়ে ওয়াঙ পথে বেরিয়ে পড়ে। মাথাটা তার ঘুলিয়ে গেছে। একটু ভেবে দেখা প্রয়োজন। সে ছোট চা-খানায় গিয়ে চায়ের হুকুম দেয়। চা-খানার ছোকরা চটপট চা দিয়ে দামটা হাতে নিয়ে বাজাতে বাজাতে উদ্ধতভাবে সরে পড়ে।

ওয়াঙ ভাবনায় ডুবে যায়। সে যতই ভাবে ততই তার কাছে শহরের এই অতি পুরাতন-বুনিয়াদি ও পরাক্রান্ত জমিদার-পরিবারের অধঃপতন অবিশ্বাস্য ও ভয়ঙ্কর মনে হয়।

বড় বেদনার্ত চিত্তেই তার মনে হয়, "মাটির সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করেই এ পরিবারের এ দশা হয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেদুটোর কথা তার মনে পড়ে। ছেলেদুটো বসন্তের নব-অঙ্কুরিত বাঁশের কোঁড়ের মতো বেড়ে চলেছে। সে সঙ্কল্প করে যে, আজ থেকেই ছেলেদুটোকে খেলাধুলা ছাড়িয়ে ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দেবে। ছোটবেলায়ই তাদের হাড়ে শক্ত মাটির অনুভূতি লাগুক; নিড়ানি ধরে তাদের হাত শক্ত হোক।

হীরা-জহরতগুলো সর্বক্ষণ তার দেহ দাহন করছে; তার বোঝা হয়ে আছে। তার ভয় লাগে, এগুলোর ঔজ্জ্বল্য তার ছেঁড়া কাপড়ের আবরণ ভেদ করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কেউ হয়তো চেঁচিয়ে উঠবে :

"দেখ, এই গরিব লোকটা সম্রাটের ধনভাণ্ডার বয়ে বেড়াচ্ছে।"

এই ঐশ্বর্য মাটিতে রূপান্তরিত না-করা পর্যন্ত তার বুক যেন অশান্তির আর অধৈর্যের আগুনে জ্বলতে থাকে। দোকানির হাতে কাজ নেই দেখে সে দোকানিকে ডেকে বলে :

"এখানে এসে বসো ভাই! একসঙ্গে বসে চা খাই, তোমার মুখে শহরের খোঁজখবর শুনি। গত শীতকালে প্রবাসে ছিলাম কি না তাই কিছু জানি না। চায়ের দামটা আমিই দেব।"

অন্যের পয়সায় নিজের দোকানের চা খেয়ে গালগল্প করাটা দোকানদার খুবই পছন্দ করে। সে ওয়াঙের পাশে বসে পড়ে। বেজির মতো মুখ, বাঁ চোখটা আবার টেরা। পরনে মোটা কোট আর পায়জামা, পোশাকের সামনের দিকটা তেল-চর্চিত, চা ছাড়াও স্বহস্তে রান্না করে সে আহার্য বিক্রি করে, কাপড়ের দাগগুলো তারই সাক্ষ্য। "ভালো বাবুর্চির জামায় দাগ"—এ প্রবাদটা সে প্রায়ই সবাইকে শোনায়। এই নোংরা বেশ সে প্রয়োজনীয় মনে করে। বাবুর্চির এ অঙ্গভূষণ। বসেই সে গল্প জুড়ে দেয় :

"হাজার হাজার গরিব-গরবা গত আকালে মারা গেল, অতি মামুলি খবর। সবচেয়ে বড় খবর হল, এই হোয়াঙদের বাড়িতে ডাকাত-পড়া।"

এই খবরই তো ওয়াঙ জানতে চায়। দোকানি বেশ রসিয়ে রসিয়ে ডাকাতির কাহিনীটা বিশদভাবে বলে যায়। কেমন করে চাকর-দাসীরা ভয়ে চেঁচাল, কেমন করে কয়েকটা দাসীকে ডাকাতরা নিয়ে গেল, আর উপপত্নীদের ডাকাতরা কীভাবে বলাৎকার করে তাড়িয়ে দিল। ফলে এ বাড়িতে এখন আর কেউ থাকতেই সাহস পায় না। "আছে কেবল বুড়ো জমিদার আর তার উপপত্নী কোকিলা মাগীটা। ঐ মাগীটাই তো বুড়ো জমিদারকে পোষাপাখির মতো করে রেখেছে। মাগীটা কি অন্য কোনো মেয়েমানুষকে তিষ্ঠুতে দিল! কত মেয়েমানুষ

এল-গেল, কিন্তু কোকিলা মাগী এ বাড়িটা যক্ষের মতো আগলে বসে আছে।"—দোকানি গল্প শেষ করে।

ওয়াঙ মনোযোগ দিয়ে গল্প শোনে, "তাহলে বুড়ো জমিদার এ মাগীর হাতের মুঠোয়?"

"বর্তমান অবস্থা তাই দাঁড়িয়েছে, যা পাচ্ছে তাই লুটছে, কিন্তু বেশিদিন এ চলবে না। জমিদারের ছেলেরা বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরলেই মাগীকে পাততাড়ি গোটাতে হবে। বাইরের সবকিছু গোছগাছ করেই তারা ফিরবে। তার মিঠেকথায় ছেলেদের মন ভিজবে না। কিন্তু যা বানাবার বানিয়ে নিয়েছে। একশো বছর বসে বসে খেতে পারবে।"

"জমি-জমা?" আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে ওয়াঙ প্রশ্ন করে।

"জমি-জমা?" দোকানি অর্থহীন কণ্ঠে কথাটা আওড়ায়, তার কাছে জমি-জমার কোনো দাম নেই।

"জমি-জমা বিক্রি হবে না?" অসহিষ্ণু কণ্ঠে ওয়াঙ শুধায়।

"ও, জমির কথা!" দোকানি উদাসকণ্ঠে জওয়াব দেয়। ইতিমধ্যে একজন গ্রাহক এসে হাজির হয়। দোকানি তার কাছে যেতে যেতে বলে, "তাদের পারিবারিক গোরস্তানটা ছাড়া সব জমিই নাকি বেচবে শুনছি।"

যা শুনতে এসেছিল, তা শোনা হয়ে গেছে। ওয়াঙ ওঠে। আবার জমিদারবাড়ির ফটকে দাঁড়াতেই সেই মেয়েমানুষটা ফটক খুলে দেয়।

ভিতরে না-ঢুকেই ওয়াঙ তাকে প্রশ্ন করে,

"আমাকে প্রথম এই কথাটা বলো তো, বিক্রির দলিলে বুড়ো জমিদার তাঁর মোহর মারবেন তো?"

মেয়েটা তার পানে চেয়ে সাগ্রহে জওয়াব দেয়, "দেবে—দেবে, আমার মাথার দিব্যি, দেবে।"

ওয়াঙ তাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে, "জমির দামটা কি সোনা-রুপোয় চাও, না হীরা-জহরতে?"

মেয়েটার চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে ওঠে। সে বলে, "আমি হীরা-জহরতই চাই।

সতেরো

ওয়াঙের এখন যা জমি, একটা বলদ আর একজন মানুষে কুলোয় না। তার যা ফসল ওঠে, তা-ও একজন মানুষে কেটে শেষ করতে পারে না। তাই সে বাড়িতে আর-একটা ঘর বাড়িয়ে নেয়, আর একটা গাধাও কিনে ফেলে। পড়শি চিঙকে বলে :

"তোমার ফালি-জমিটা আমার কাছে বিক্রি করে দিয়ে নির্জন-বাড়িটা ছেড়ে আমার বাড়িতে চলে এসো, এখানেই থাকবে আর চাষাবাদে আমাকে সাহায্য করবে।"

চিঙ খুশিমনেই ওয়াঙের কথা মেনে নেয়।

ঠিক সময়মতো বৃষ্টি হয়েছে; ধানের চারাও বেশ বড় হয়ে গেছে, প্রচুর পরিমাণে গম তোলা হয়ে গেল, তারা দুজনে মিলে জলে-ভাসা ক্ষেতে ধানের চারা লাগিয়ে দেয়। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে শুকনো ক্ষেত এখন ধান লাগাবার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে, তাই ওয়াঙ এবার অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশি জমিতে ধানের আবাদ করে। ধানের মওসুমে এত ধান হল যে ওয়াঙকে আরও দুজন লোক লাগিয়ে ধানকাটা সারতে হল।

হোয়াঙদের কাছ থেকে কেনা জমিতে কাজ করতে করতে ওয়াঙের বারবার অধঃপতিত হোয়াঙ-পরিবারের কুঁড়ে জমিদার-তনয়দের কথা মনে পড়ে। তাই সে তার দুই ছেলেকে রোজ সকালে তার সাথে মাঠে নিয়ে আসে; ছোট্ট হাতের উপযুক্ত কাজে দুজনকে লাগায়। তারা গাধা আর গরুটার দেখাশোনা করে। তাদের দিয়ে কঠিন কাজ না হোক, তারা অন্তত রোদের তাপ আর চষা মাঠ দিয়ে চলাফেরার কষ্ট সহ্য করতে শিখুক।

কিন্তু ওলানকে সে আর মাঠে কাজ করতে দেয় না; সে তো এখন আগের মতো দরিদ্র নেই, ইচ্ছা করলে সে এখন জনমজুর খাটিয়ে কাজ করতে পারে। ফসলও এবার হয়েছে প্রচুর, বাধ্য হয়ে এবার তাকে বাড়িতে আরও একটা ঘর বাড়াতে হয় শস্য রাখার জন্য। নইলে বাড়িতে পা ফেলার জায়গা থাকে না। তিনটে শুওর আর একঝাঁক মুরগিও ওয়াঙ কিনে ফেলে। বাড়িতে যা নষ্ট হয়, তাতেই এগুলোর চলে যাবে।

ওলান বাড়িতে বসে স্বামী-সন্তানের জন্য নতুন জামা-জুতো তৈরি করে, প্রত্যেক বিছানার জন্য তৈরি করে ফুল-তোলা চাদর আর প্রত্যেক লেপের জন্য নতুন ওয়াড়। এবার পোশাক-পরিচ্ছদে বিছানা-বালিশেও তারা অভিজাত হয়ে ওঠে।

কিছুদিন পর ওলান আবার সন্তানের জন্ম দেয়। এবারও ওলান আঁতুড়ে একাই থাকে। ইচ্ছা করলেই যে-কোনো দাই আনতে পারে কিন্তু সে তা চায় না।

এবার প্রসব-বেদনায় ওলান খুব কষ্ট পায়। বিকেলবেলা মাঠ থেকে ফিরে এসে ওয়াঙ দেখে, তার বুড়ো বাপ দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছে। তাকে দেখে তার বাপ হেসে বলে :

"এবার এক ডিমে দুই কুসুম।"

ভিতরের ঘরে ঢুকে ওয়াঙ দেখতে পায়, ওলান সদ্যোজাত যমজ-বাচ্চা পাশে নিয়ে শুয়ে আছে—ছেলে একটা, মেয়ে একটা। দুটো দেখতে হুবহু একরকম—একই শস্যের দুটো দানার মতো। ওলানের কাণ্ড দেখে সে তো হেসেই অস্থির। তার একটু হাসি-তামাশা করতে ইচ্ছা হয়, সে ওলানকে হেসে বলে :

"এজন্যেই বুঝি তুমি একজোড়া মুক্তো বুকে রেখেছিলে।" এই রসিকতায় সে নিজেই আবার খুব হাসে। তার আনন্দ দেখে ওলানের ঠোঁটেও ধীর করুণ হাসি ফুটে ওঠে।

ওয়াঙ লাঙের জমজমাট সংসারে এখন আর দুঃখ-অভাব নেই, একমাত্র দুঃখ, তার বড়মেয়েটা এখনও কথা বলতে শিখল না। বয়স-সুলভ চাঞ্চল্য তার দেহমনে জাগল না। বাপের চোখে চোখ পড়লে শৈশবের সেই হাসিটুকু হাসে। এমন হল কেন? মেয়েটার জীবনের প্রথম বছরের সেই বেঁচে থাকার মহাসংগ্রাম আর অনাহারই কি এর কারণ? ওয়াঙ প্রতীক্ষা করে, কবে এই বোবা-শিশুর কচি ঠোঁট দিয়ে অস্ফুট 'বা-বা' বুলি বেরুবে। কিন্তু মেয়ের ওষ্ঠে কথা ফোটে না। ফোটে কেবল শূন্য মধুর হাসির রেখা। মেয়েটার উপর চোখ পড়তেই তার কণ্ঠ থেকে চাপা গোঙানি বেরিয়ে আসে। তার বুকের মধ্যে শুধু গুমরে মরে, "হতভাগীটাকে তখন বেচে দিলে, এতদিনে তারা তাকে মেরে ফেলত!"

বেচারি মেয়েটার জীবনের শূন্যতাকে পূর্ণ করতেই হয়তো ওয়াঙ মেয়েটাকে নিয়ে আদরের বাড়াবাড়ি করে। মাঝে মাঝে মেয়েটাকে নিয়ে সে মাঠে যায়। মেয়েটা নীরবে বাপের পিছনে পিছনে চলে; বাপের কথার জওয়াবে একটুখানি হাসে।

এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকে। তাই এখানকার অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের সময় দেশ ছেড়ে চলে যায়। দুর্ভিক্ষের অবসানে আবার ফিরে আসে। কিন্তু ওয়াঙ তার সংসারে এমনি সুবন্দোবস্ত করে নেয়, যাতে ভবিষ্যতে কোনো দুর্ভিক্ষে দেশ না-ছেড়ে আগেকার সঞ্চয়েই সে দুর্দিনটা কাটিয়ে দিতে পারে। দেবতারাও তার সহায়, পর পর সাতবছর ক্রমাগত ভালো ফসল ফলে। প্রতিবছর ওয়াঙ তার জনমজুরদের নিয়ে ফসল ঘরে তোলে, উদ্বৃত্ত ফসল সঞ্চিত হয়। পুরনো বাড়ির পিছনে তাকে একটা বাড়িও তৈরি করতে হয়। তিন-কামরাওয়ালা বাড়ি—একটা বেশ বড় কামরা আর দুটো ছোট কামরা। টাইলের চাল; মাটির দেয়াল, দেয়ালে চুনকাম করা। এ বাড়িতে সে সপরিবারে চলে আসে। চিঙের অধীনে অন্যান্য জনমজুরেরা পুরনো বাড়িতে থাকে।

ইতিমধ্যে ওয়াঙ লাঙ চিঙের সত্যিকার পরিচয় পেয়েছে। চিঙ লোকটা সৎ আর প্রভুভক্ত। সে চিঙকে লোকজন আর জমিজমার তত্ত্বাবধানের ভার ছেড়ে দেয়। তাকে মাইনেও বেশ ভালো দেয়। খাওয়া-থাকা বাদে মাসিক দু'ডলার। ওয়াঙ চিঙকে বেশি করে খাওয়াদাওয়া করতে কত বলে, কিন্তু কিছুতেই চিঙের শুকনো হাড়ে গোশ্‌ত লাগে না। সে কৃশ, দুর্বল ছোট-গভীর মানুষটিই থেকে যায়। তবে তার কাজে ফাঁকি নেই, সকাল থেকে সন্ধ্যা খুশিমনে কাজ করে যায়। প্রয়োজনবোধে আস্তেধীরে কথা কয়; কথা বলতে না হলেই সে বেশি খুশি হয়। সারাদিন কাজে লেগে থাকে; সকাল-সন্ধ্যা বালতিভরা পানি আর সার বয়ে ক্ষেতে ঢালে।

কিন্তু ওয়াঙ ভালো করেই জানে, চিঙকে ফাঁকি দিতে কেউ পারে না। কোনো জন-মজুর কাজে গাফলতি করলে বা বরাদ্দ খাবারের চেয়ে বেশি খেলে বা ফসল কাটার সময় তার বউ-ছেলের মারফত কিছু শস্য পাচার করে দিলে, চিঙের চোখ তা এড়ায় না। বছরের শেষে মনিব আর জনমজুরদের যেদিন একসঙ্গে খানাপিনা

হয়, সেদিন চিঙ ওয়াঙের কানে কানে বলে দেবে যে, অমুক মজুরকে যেন আগামী বছর রাখা না হয়।

সেই একমুঠো মটর আর একমুঠো বীজের আদান-প্রদান যেন এই দুজনকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে ফেলেছে। তবে তাদের সম্বন্ধ এইরূপ দাঁড়িয়েছে যে, ওয়াঙ বয়সে চিঙের ছোট হলেও বড়ভাইয়ের স্থান অধিকার করেছে। চিঙ একথাও ভুলতে পারে না যে সে বেতনভোগী আর সে যে-বাড়িতে থাকে, সে বাড়িটা তার নয়, ওয়াঙের।

পঞ্চম বছরের শেষে ওয়াঙ আর নিজে বড় একটা মাঠে যায় না। সে এখন বিস্তর জমির মালিক, তাই তাকে নিজের জমির ফসলাদি বিক্রির কাজে সর্বক্ষণ বাইরেই থাকতে হয়। তাছাড়া কর্মচারীদেরও আদেশ-উপদেশ দিতে হয়। লেখাপড়া না-জানায় তাকে অসুবিধায় পড়তে হয়। ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে চুক্তিপত্র লেখা হলে তাকে যখন বাধ্য হয়ে বেপারিদের সামনে নিজের নিরক্ষরতার কথা স্বীকার করতে হয়, তখন তাকে রীতিমতো লজ্জিতই হতে হয়। সে আরও লজ্জায় পড়ে দলিলে নাম সই করার সময়, সামান্য কেরানিটা পর্যন্ত অবজ্ঞায় কুঁচকে তাড়াতাড়ি তুলিটা নিয়ে তার নামের অক্ষরগুলো টেনে যায়। অন্যান্যরা এ নিয়ে তাকে যখন বিশ্রী ঠাট্টা করে, তখন তার ভয়ানক লজ্জা হয়।

একদিন দুপুরবেলায় শহরে গিয়ে শস্যের হাটে তার ছেলেবয়েসী ছোকরা কেরানিদের হাসি-বিদ্রূপ শুনে ওয়াঙ ভয়ানক রেগে বাড়ি ফেরে।

"কোনো বেটার একচিলতে জমে নেই, অথচ আমি কাগজের উপরে তাদের তুলির আঁচড় পড়তে পারি না বলে তাদের কত গুমর। আমি কি তাদের হাসি-ঠাট্টার পাত্র!"ক্রোধ প্রশমিত হলে সে আপনমনে বলে, "লেখাপড়া জানি না, এ তো সত্যি লজ্জার কথা! বড়ছেলেটাকে মাঠের কাজ থেকে ছাড়িয়ে শহরের স্কুলে পড়তে দেব। সে লেখাপড়া শিখবে। ধান-চাউলের হাটে আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সে-ই আমার হয়ে ব্যবসা-সংক্রান্ত লেখাপড়ার কাজটা করবে। তখন আর কেউ আমাকে নিয়ে চাপা-হাসি হাসবে না; ঠাট্টা-তামাশা করবে না। এত জমিজমার মালিক আমি, আর আমাকে নিয়ে এমনি ঠাট্টা-বিদ্রূপ!"

চিন্তাধারার এই অভিনবত্ব তার বেশ লাগে। সেইদিনই সে তার বড়ছেলেকে ডেকে পাঠায়। বছর বারো বয়স, লম্বা দোহারা গড়ন; মায়ের মতো উঁচু চোয়াল আর বড় বড় হাত-পা, কিন্তু বাপের মতো তীক্ষ্ণ চোখ! ছেলে সামনে এসে দাঁড়াতেই ওয়াঙ বলে :

"আজই মাঠ ছেড়ে চলে এসো, মাঠে আর তোমাকে চাষাবাদের কাজ করতে হবে না। আমার একজন লেখাপড়া-জানা লোকের প্রয়োজন। সে আমার হয়ে ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে লেখাপড়ার কাজটা করবে। তা নইলে লজ্জা পেতে হয়।"

বাপের কথা শুনে ছেলের চোখ আনন্দে চকচক করে ওঠে, সে বাপকে বলে :

"আমারও গত দুবছর ধরে তাই ইচ্ছা, কিন্তু তোমাকে বলতে সাহস পাইনি।"

একথা শুনে মেজছেলেটাও প্যানপ্যান করতে করতে এগিয়ে আসে। এই তার স্বভাব, মুখে তার চেঁচামেচি আর নালিশ লেগেই আছে। ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে সবাই তাকে কম দিচ্ছে, এই তার নালিশ। সে বাপের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করে :

"তা হলে আমিও চাষের কাজ করব না, বড়ভাই দিব্যি আরামে লেখাপড়া শিখবে আর আমি তোমারই ছেলে হয়ে গাধার মতো খেটে মরব, তা হবে না।"

তার চেঁচামেচি ওয়াঙ সহ্য করতে পারে না, তাই সে তাড়াতাড়ি বলে দেয় :

"বেশ দুজনই যাও, ভালোই হবে, একজন মরলে আর একজন আমার হয়ে এ কাজ করবে।"

এবার ওয়াঙ ছেলেদের মাকে শহরে পাঠিয়ে দেয় ছেলেদের পোশাক-পরিচ্ছদের কাপড় কিনতে, আর নিজে যায় তাদের দোয়াত-কাগজ-তুলি আনতে। সে তো এসব ব্যাপারে একদম অজ্ঞ, তাই বড় মুশকিলে পড়ে যায় সে। লজ্জায় দোকানির কাছে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না অথচ দোকানিকে বিশ্বাসও করতে পারে না। অবশেষে ছেলেদের শহর-ফটকের কাছে এক ওস্তাদের কাছে দেবার সব বন্দোবস্ত হয়ে যায়। ওস্তাদজি নাকি কবে কোনো দরকারি পরীক্ষায় ফেল করে নিজের বসতবাটিতেই একটা পাঠশালা খুলেছে। সারাদিন পড়ুয়ারা পড়া মুখস্থ করে। পড়া না পারলে ওস্তাদজির হাতের পাখার বাঁট তাদের পিঠের উপর পড়ে।

বসন্ত আর গ্রীষ্মের দিনে ছেলেরা সামান্য বিশ্রামের সুযোগ পায়। দুপুরের খাওয়ার পর ওস্তাদজি ঝিমোতে ঝিমোতে ঘুমিয়ে পড়েন; ওর নাকের ডাকে ছোট ঘরখানা ভরে যায়। এই অবসরে ছেলেরা খেলায় মেতে ওঠে; তাদের মধ্যে কানাকানি চলে; তারা মজার ছবি আঁকে, ওস্তাদজির মুখগহ্বরে উড়ন্ত মাছিটা ঢুকবে কি না তা নিয়ে বাজি ধরে। হঠাৎ ওস্তাদের চোখ খুলে যায়—কখন যে চুপিচুপি তার চোখ খুলে যায় তা কেউ বলতে পারে না—ছেলেদের দুষ্টামি ধরা পড়তেই তিনি তার পাখার বাঁট দিয়ে ছেলেদের মাথায়-পিঠে চটাপট মারতে আরম্ভ করেন। ওস্তাদজির পাখার বাঁটের চটাপট শব্দ আর ছেলেদের চিৎকার শুনে পড়শিরা বলাবলি করে :

"ওস্তাদ বটে!" এই সুনামের জন্যই ওয়াঙ এই ওস্তাদ বেছে নিয়েছে।

একদিন ওয়াঙ ছেলেদের নিয়ে পাঠশালায় যায়। সে আগে আগে চলে আর ছেলেরা তার পিছনে। বাপের পাশাপাশি চলা বেআদবি। নীল রঙের একটা রুমালে বেঁধে কয়েকটা টাটকা ডিমও ওয়াঙ ওস্তাদজির জন্য নিয়ে যায়। বুড়ো ওস্তাদজির পিতলের ফ্রেমের চশমা, দীর্ঘ ঢিলে কালো চাপকান আর প্রকাণ্ড পাখাটা শীতের দিনেও হাতছাড়া হয় না—দেখে ওয়াঙ ভয়ে ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে; সে ওস্তাদকে ভক্তি-নত অভিবাদন জানিয়ে নিবেদন করে :

"হুজুর! এই আমার দুটো অযোগ্য সন্তান। মেরে-পিটে ওদের খুলিতে কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।" ছেলেদুটো বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বেঞ্চিতে বসা ছেলেগুলোর পানে তাকায়। তাদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হয়।

ছেলেদের পাঠশালায় রেখে বাড়ি ফিরে ওয়াঙের বুক গর্বে ফেটে পড়তে চায়। তার মনে হয়, পাঠশালার এতগুলো ছেলের মধ্যে তার ছেলের মতো লম্বা-চওড়া সুস্থ-সবল ও বাদামি-সুন্দর কেউ নেই। ফটক থেকে বেরিয়ে তার গাঁয়ের একজন লোকের সাথে দেখা হতেই লোকটার প্রশ্নের জওয়াবে ওয়াঙ বলে দেয় :

"ছেলেদুটোকে পাঠশালায় দিয়ে এলাম।"

লোকটার বিস্মিত-দৃষ্টির জওয়াবে সে অবজ্ঞাভরেই বলে যায়, "ওদের তো আর ক্ষেতে খাটবার প্রয়োজন নেই। কিছু লেখাপড়া শিখুক বরং।"

যেতে যেতে আপনমনে ভাবে, "বড়ছেলে কালে একজন মহাপণ্ডিত হলেও আমি অবাক হব না।"

সেদিন থেকে দুছেলের 'বড়ছেলে' 'ছোটছেলে' নামের পরিচয় ঘুচে যায়। ওস্তাদজি ছেলেদুটোর নাম রাখলেন নাঙ এন্ আর নাঙ ওয়েন। 'নাঙ' কথাটার অর্থ মাটির সম্পদে সম্পদশালী।

আঠারো

এমনি করে ওয়াঙ লাঙ তার সংসারের সৌভাগ্য বেঁধে নেয়। সপ্তম বৎসরে উত্তর-পশ্চিম কোণে অতিবৃষ্টি আর অত্যধিক তুষারপাতের ফলে উত্তরের মহানদী দুকূল ছাপিয়ে সে-অঞ্চল প্লাবনে ভাসিয়ে দেয়। এতে ওয়াঙ ঘাবড়ায় না, যদিও তার পাঁচভাগের তিনভাগ জমি কাঁধউঁচু পানিতে তলিয়ে বিরাট বিলে পরিণত হয়ে গেছে।

বসন্তের শেষ থেকে গ্রীষ্মের প্রথম পর্যন্ত পানি বাড়তে থাকে। চারদিকে অথই পানি, একটা নিস্তব্ধ সাগর যেন মধুর আলস্যে আকাশের ভাসমান মেঘ, চাঁদ, সারি-সারি নিমজ্জিত উইলো গাছ আর বাঁশঝাড়ের প্রতিবিম্ব বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। মাঝে মাঝে পরিত্যক্ত মেটে বাড়িগুলো দিনকয়েক এক-বুক পানির উপর দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে পানিতে ধসে পড়ছে। ওয়াঙের বাড়ির মতো যে ঘরবাড়ি টিলার উপর অবস্থিত সে বাড়ি ছাড়া অন্যান্য সব বাড়িগুলোরই এই দশা। এই টিলাগুলোকে এই সাগরের বুকে দ্বীপের মতো দেখাচ্ছে। মানুষেরা নৌকা, ভেলা ইত্যাদি চড়ে ভাসছে; কেউ কেউ অনাহারে মরছে।

কিন্তু ওয়াঙ লাঙ বেপরোয়া। ধান-চাউলের বাজারে তার টাকা খাটছে। গত দুবছরের উদ্বৃত্ত ফসলে তার গোলা ভরা রয়েছে। তার টিলার উপর অবস্থিত বাড়ি বন্যার ছোঁয়া থেকে বহু ঊর্ধ্বে বিরাজ করছে, ঘাবড়াবার কারণ তার নেই।

তার বহু জমি অনাবাদী আছে বলে ওয়াঙের এখন অফুরন্ত অবসর, এত অবসর সে জীবনে কোনোদিন পায়নি, প্রচুর সুখাদ্য খেয়ে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মন তার অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে। তা ছাড়া তার বাড়িতে বাৎসরিক বেতনে বহু জনমজুর রয়েছে, তারা অলস হয়ে বসে থাকবে আর সে মেহনত করবে এ-ও

তো বোকামি। তাই পুরনো বাড়ির চালটা মেরামত করা, নতুন বাড়ির টাইলগুলো ভালো করে বসানো, চাষাবাদের যন্ত্রপাতিগুলো ঠিকঠাক করা ও গরু-বাছুরগুলোকে জাবনা দেওয়া এবং রশি পাকানো—যে কাজ আগে সে স্বহস্তেই করত—এসব কাজের হুকুম জনমজুরদের দিয়ে সে একদম নিষ্কর্মা হয়ে যায়; কী যে করবে, তা ভেবে পায় না।

কিন্তু একটা লোক তো সারাদিন মাঠ-ভরা পানির দিকে শুধু তাকিয়ে থেকে কাটাতে পারে না, সারাদিন খেতে বা ঘুমোতেও পারে না, আহার-নিদ্রারও তো একটা সীমা আছে। বাড়িটা নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে; তার উদ্দাম-রক্তে এই নিস্তব্ধতা অসহনীয় হয়ে ওঠে। বুড়ো বাপ আরও দুর্বল হয়ে গেছে, চোখে কম দেখে, কানেও কম শোনে, বাপের সাথে কথা বলারও তার বড় একটা প্রয়োজন নেই, মাঝে মাঝে তার কুশল-প্রশ্ন আর খাওয়া-দাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করা ছাড়া। ওয়াঙের এই ভেবে অসহ্য মনে হয় যে, তার বুড়ো বাপ তার ঐশ্বর্যের পরিমাণটা বুঝতে পারে না, বুড়ো এখনও তার গরম পানিতে চায়ের পাতা দেখলে বিড় বিড় করে বলে, "একটু গরম পানি হলেই তো বেশ হয়; চা তো রুপোর মতো দামি জিনিস।" বুড়োকে কিছু বলা না-বলা সমান, বুড়োর যা ভোলা-মন। কিছু বললে একটু পরেই ভুলে গিয়ে আপনজগতে ডুব দেয়; যৌবনের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে আপন জরাজীর্ণতার কথা ভুলে যায়, চারদিকে যে কত পরিবর্তন ঘটেছে সেদিকে তার দৃষ্টি পড়ে না।

বড়মেয়েটার মুখ দিয়ে এখনও কথা ফুটল না, সে তার দাদুর পাশে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে একটা কাপড়ের ফালি বারবার পাকায় আর আপনমনে হাসে। এই বুড়ো আর এই জড়বুদ্ধি বোবা মেয়েটা সম্পদশালী আর কর্মশক্তিসম্পন্ন ওয়াঙের সাথে কী কথা বলবে। ওয়াঙ বাপকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দিয়ে মেয়েটার গালে হাত বুলিয়ে আদর করে, মেয়েটা এর বিনিময়ে বাপকে একটু শূন্য-মধুর হাসি উপহার দেয়। এ হাসির রেখা মুহূর্তে বিষাদের ছায়ায় রূপান্তরিত হয়ে মিলিয়ে যায়। দুটো দীপ্তিহীন ম্লান আঁখির তারা মাত্র পড়ে থাকে, বাপ তার বেদনার্ত চোখ মেয়ের দৃষ্টিপথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আঙিনায় ক্রীড়ারত যমজ-সন্তানের পানে তাকায়।

কিন্তু অবোধ শিশুর ক্ষণস্থায়ী অর্থহীন চাপল্যে কারো মন তৃপ্ত থাকতে পারে না। শিশু একটুখানি হাসির আভা ছড়িয়ে দিয়ে, একটু দুষ্টুমি করেই আবার আপনখেলায় মেতে ওঠে, একাকিত্বের তীব্র দহনে ওয়াঙ অস্থির হয়ে ওঠে। সে একবার ওলানের পানে তাকায়, কিন্তু তার দৃষ্টিতে কামনার লেশমাত্র নেই; পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই, ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় যে-নারীর সব রহস্য উদ্‌ঘাটিত, নারীর দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণরূপে জানা; সেই আট-পৌরে নারীর পানে পুরুষ যে-দৃষ্টি মেলে চায়, ওয়াঙের চোখেও সেই দৃষ্টি।

ওয়াঙের মনে হয়, জীবনে এই প্রথম সে ওলানকে দেখছে, যে-কোনো পুরুষ এ নারীকে স্থূলবুদ্ধি, বৈশিষ্ট্যহীন, অতিসাধারণ জীব বলেই মনে করবে—নীরবে আপনমনে চলে, অন্যেরা তার সম্বন্ধে কী ভাবে, সে-সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন। ওয়াঙের চোখে আজ প্রথম ধরা পড়ে, ওলানের মাথায় রুক্ষ পিঙ্গল জটাজাল, কর্কশ থ্যাবড়া লালিত্যহীন মুখাবয়ব, তার কেশবিরল চোখের ভ্রু অতিবিস্তৃত অতি-বিস্ফারিত; ঠোঁট বেমানান রকমের। বড় হাত-পা। ওয়াঙ কর্কশকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে :

"যে কেউ তোমাকে দেখে বলবে, তুমি একজন অতি-সাধারণ লোকের বউ; বিত্তশালী জোতদারের বউ নও।"

জীবনে এই প্রথম ওলান সম্বন্ধে ওয়াঙ মতামত প্রকাশ করে। এর প্রত্যুত্তরে ওলান তার বিষাদ-করুণ শান্ত দৃষ্টি তুলে ধরে। সে তখন বেঞ্চে বসে একটা লম্বা সুচ দিয়ে জুতোর সুখতলা সেলাই করছে। একথায় তার হাতের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সুচটা যে-অবস্থায় ছিল সে-অবস্থায় থেমে যায়, তার মুখটা হা হয়ে কালো দাঁত বেরিয়ে পড়ে। সে যেন সহজ বুদ্ধিবলে উপলব্ধি করে, তার স্বামী তার পানে আজ পুরুষের চোখে চেয়েছে। তার উঁচু গণ্ডদেশের উপর দিয়ে গাঢ় রক্তিম আভা খেলে যায়, সে অনুচ্চকণ্ঠে বলে :

"এই যমজ-সন্তান জন্মের পর শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না, ভিতরটা যেন সবসময় জ্বালা করে।"

ওয়াঙ বুঝতে পারে, ওলানের সরল মন ভেবেছে, সে তাকে তার সাত-বর্ষব্যাপী বন্ধ্যাত্বের জন্য দোষারোপ করছে। তাই সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রুক্ষকণ্ঠে বলে : "তুমি কি অন্য মেয়েদের মতো সামান্য তেলও কিনতে পারো না? কালো কাপড়ের একটা জামাও বানাতে পারো না? আর তুমি যে জুতো পরো, তা কোনো জোতদারের বউয়ের যোগ্য নয়, তুমি তো এখন জোতদারের বউ!"

ওলান স্বামীর কথার কোনো জওয়াব না দিয়ে ভীরুদৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে থাকে। কী করছে না-ভেবেই এক পায়ের উপর আর এক পা চাপা দিয়ে পা-দুটো বেঞ্চের নিচে লুকিয়ে রাখে। ওলানকে এতগুলো কটুকথা বলেছে বলে ওয়াঙ লজ্জিত হয়। এই নারী এতদিন প্রভুভক্ত কুকুরের মতো তার অনুসরণ করেছে, দুঃখের দিনে সে যখন ক্ষেতখামারে কাজ করেছে, তখন এ নারী সন্তান-প্রসবের পরেই আঁতুড় ছেড়ে এসে তাকে সাহায্য করতে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। একথা ওয়াঙ ভোলেনি। তবু সে তার বুকের ক্রোধ দমন করতে না পেরে, মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্দয়ভাবে বলে যায়,

"অনেক পরিশ্রম করে পয়সা করেছি, আমি চাই না আমার বউ এখনও চাষার বউয়ের মতো থাকুক। তোমার পা দুখানা—"

ওয়াঙ থেমে যায়। তার মনে হয়, ওলান অত্যন্ত কুৎসিত, সবচেয়ে কুৎসিত নীল কাপড়ের জুতোয় ঢাকা ওর পা দুখানা। সে রাগের জ্বালায় পায়ের পানে তাকায়, ওলান পা দুটো আরও ভিতরে টেনে নেয়। অবশেষে সে অস্পষ্ট অনুচ্চকণ্ঠে বলে :

"ছোটবেলায় বেচে দিয়েছিল বলে আমার মা আমার পা বাঁধতে পারেনি, ছোট মেয়েটার পা আমি ঠিক বেঁধে দেব।"

ওয়াঙ এবার লজ্জা পেয়ে হাল ছেড়ে দেয়। বেচারির উপর অমন রাগ করছে আর বেচারি কিনা উল্টো রাগ না করে ভয়ে মরে। এজন্যই তো তার রাগ আরও বেশি হয়। সে তার নতুন কালো চাপকানটা টেনে নিয়ে বিরক্তির সুরে বলে :

"চা-খানায় চললাম, নতুন কোনো খবরাদি শুনতে পাই কি না দেখি, একঘেয়েমি আর ভালো লাগছে না। বাড়িতে তো রয়েছে বোকা-হাবার দল, এক বুড়ো হাবড়া আর দুটো বাচ্চাশিশু।"

শহরে যেতে-যেতে তার মনে পড়ে, যে-হীরা-জহরত দিয়ে সে হোয়াঙের জমিগুলো কিনল, ওগুলো তো ওলানই সেই প্রাচীরের পাশের জমিদারবাড়ি থেকে এনেছিল। সে ওগুলো না আনলে বা ওলান তাকে ওগুলো না দিলে সে কি কোনোদিন এ জমি কিনতে পারত? একথা মনে হতেই তার রাগ আরও বেড়ে যায়। সে তার বিদ্রোহী মনকে সান্ত্বনা দেয় :

"কিন্তু ওলান তো জেনেশুনে এগুলো আনেনি!" সে নেহাত খেয়ালের বশেই এগুলো এনেছিল। শিশুরা যেমন লাল-নীল-সবুজ-মিঠাই দেখলে আনে। সে না দেখলে তো ওলান সারাজীবন ওগুলো বুকের মধ্যে এমনি করে লুকিয়ে রাখত। ওলান এখনও মুক্তোদুটো বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে কি না ওয়াঙ তাই ভাবে। আগে একথাটা তার মনে বিস্ময় জাগিয়েছে; তার মনে নানারকম কল্পনার উপাদান জুগিয়েছে কিন্তু এখন একথা ভাবতে গিয়ে তার দেহ-মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কারণ বহুসন্তানের স্তন্যদায়িনী ওলানের স্খলিত অসুন্দর দোদুল্যমান স্তনযুগলের ফাঁকে এই মুক্তোদুটো রাখা নিরেট বোকামি আর অর্থহীন।

কিন্তু ওয়াঙ লাঙ এখনও আগের মতো দরিদ্র চাষি থাকলে আর বন্যার প্লাবনে তার ক্ষেতখামার ডোবা না থাকলে, কোনো অঘটনই ঘটত না। সে এখন ঐশ্বর্যশালী; তার বাড়ির দেয়ালে টাইলের ফাঁকে, তার শোয়ার ঘরের বাক্সে, তাদের বিছানার তলে, আর তার কোমরের থলিতে অঢেল টাকা লুকানো রয়েছে। অর্থের তার অভাব নেই। তাই এখন পয়সা-খরচের বেলায় ক্ষতস্থানের রক্ত-ঝরার মতো তার যন্ত্রণা হয় না, এখন তার সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ে সার্থক; কোমরবন্ধের টাকায় হাত পড়লে হাত তার জ্বালা করে ওঠে। তাই সে এই অর্থ ব্যয় করতে চায়, সে এখন অর্থ সম্বন্ধে উদাসীন। কেমন করে নিরর্থক যৌবনকে সার্থক করা যায় সে ভাবনা এখন তার মনে বাসা বেঁধেছে।

আগে যেমন সবকিছুই ওয়াঙের ভালো লাগত, এখন আর তেমন লাগে না। আগের দিনে যে চা-খানায় পা দিতে গেঁয়ো ওয়াঙ সঙ্কুচিত হয়ে উঠত, আজ সেই চা-খানাই ওয়াঙের কাছে অতি নোংরা আর তার অযোগ্য বলে মনে হয়। আগে কেউ তাকে চিনত না। চা-খানার ছোকরারা তার সাথে উদ্ধত ব্যবহার করত; কিন্তু

এখন সে চা-খানায় ঢুকলে লোকদের মধ্যে তাকে নিয়ে কানাকানি শুরু হয়। সে শুনতে পায়, একজন আর একজনকে বলে :

"এই ওয়াঙ গ্রামের ওয়াঙ লাঙ। মস্ত বড়লোক। সেই আকালের বছর—যে বছর হোয়াঙদের বুড়ো জমিদার মারা গেলেন, ইনি হোয়াঙদের জমিদারি কিনে নেন!"

শুনে ওয়াঙ উদাসচিত্তে বসে থাকলেও গোপন গর্বে তার বুক স্ফীত হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ বউয়ের প্রতি কটুভাষা প্রয়োগ করে তার মন বিষিয়ে আছে। লোকের দেওয়া অযাচিত সম্মান তার আজ ভালো লাগে না। সে বিষণ্নমনে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয় আর ভাবে, জীবনটা তার বিফলেই গেল। তারপর সহসা আপন মনে বলে :

"আমি এই ট্যারা লোকটার দোকানে চা খাব কেন? আমার জনমজুরদেরও তো এর চেয়ে বেশি উপার্জন। আমি একজন জোতদার, আমার ছেলেরা পণ্ডিত। আমি কেন এখানে চা খাব?"

ওয়াঙ চট করে ওঠে, টেবিলের উপর দামটা ফেলে, কেউ কিছু বলার আগেই বেরিয়ে পড়ে। তার মন কী চায় বুঝতে না-পেরে পথে-পথে ঘুরে বেড়ায়। গল্পবুড়োর আড্ডার পাশ দিয়ে যাবার সময় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গল্প শোনে। তিন রাজ্যের পুরনো কাহিনী। সে-যুগের যোদ্ধারা কী সাহসী আর চতুর ছিল। কিন্তু গল্পে তার মন ভরে না, মনের অস্বস্তি দূর হয় না, অন্যান্য শ্রোতাদের মতো গল্পে সে মুগ্ধ হয় না। লোকটার অনবরত একটা পিতলের ঘণ্টা পেটানোর শব্দে তার বিরক্তি ধরে যায়, সে বেরিয়ে পড়ে।

দক্ষিণী একটা লোক শহরে একটা বড় রেস্তোরাঁ সম্প্রতি খুলেছে। এ ব্যবসা লোকটা ভালো জানে, আগে রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে ওয়াঙের দেহ ভয়ে শিউরে উঠত। কত পয়সা এখানে জুয়োয়, মদে আর মেয়েমানুষের পিছনে খরচ হচ্ছে, কিন্তু আজ তার অলসমনের অস্থির চাঞ্চল্য আর ওলানের প্রতি অন্যায় আচরণের আত্মগ্লানি তাকে রেস্তোরাঁটার পানে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সে নতুন কিছু দেখাশোনার কামনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। সে নতুন রেস্তোরাঁর দরজা পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। দক্ষিণে খোলা বিরাট আলোঝলমল ঘরখানা টেবিল-চেয়ারে সাজানো। সে তার মনের ভীরুতা চাপা দেওয়ার প্রয়াসে দৃপ্তভঙ্গিতে ঘরে ঢোকে। তার মনে পড়ে যায়, ক'বছর আগেও সে ছিল অতি দীন; দক্ষিণের এক শহরে পেটের দায়ে তাকে রিকশাও টানতে হয়েছে।

সে কারো সাথে কথা না বলে চা নিয়ে নীরবে চুমুক দেয় আর বিস্ময়-বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকায়। প্রকাণ্ড হলঘর। সোনার পানিতে কারুকার্য-ভরা ছাদ। দেয়ালে ঝুলানো শাদা রেশমি কাপড়ের উপর আঁকা কয়েকটা সুন্দরী নারীমূর্তি। ওয়াঙ অন্যের দৃষ্টির অগোচরে এই নারীমূর্তিগুলো গভীর মনোনিবেশে দেখে। তার মনে হয় এরা স্বপ্নচারিণী—ধ্যান-লোকবাসিনী, ধরণীতে এমন সুন্দরী নারী তার

চোখে পড়েনি কোনোদিন। প্রথমদিন সে ছবিগুলোর পানে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চা-পান শেষ করে সরে পড়ে।

বন্যার পানি নামে না। পরদিন চা-খানায় গিয়ে সে একটা কোণে বসে চা খায় আর নিষ্পলক চোখে নারীমূর্তিগুলোর পানে তাকিয়ে থাকে। অলস কর্মহীন তার জীবন; বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। তাই চা-খানায় তার অবস্থান ক্রমশ দীর্ঘতর হয়ে ওঠে। এই করেই হয়তো তার এখানে যাওয়া-আসার অবসান হত। কারণ এত ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও তার চেহারা থেকে গ্রাম্যতার ছাপ মুছে যায়নি। এই অভিজাত চা-খানায় একমাত্র তার পরিধানে সূতি-পোশাক, একমাত্র তারই মাথায় বিসর্পিল বেণি; কোনো শহরবাসীই আজকাল বেণি রাখে না।

কিন্তু এক অশুভ সন্ধ্যায় বিপর্যয় ঘটে যায়। রোজকার মতো ওয়াঙ হল-কামরার এককোণে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছে আর চারদিকে তাকাচ্ছে, এমন সময় প্রাচীরের গা বেয়ে দোতলার সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে কে একজন নেমে আসে।

প্যাগোডা ছাড়া এ শহরে এই চা-খানার বাড়িটাই মাত্র দোতলা। প্যাগোডা পাঁচতলা উঁচু, তবে প্যাগোডার উপরতলাগুলো ক্রমশ সংকীর্ণ কিন্তু এ বাড়িটার দোতলা একতলার মতো চতুষ্কোণ আর প্রশস্ত। রাতের বেলায়, বিশেষত নিশিরাতে নারীকণ্ঠের উচ্ছল সংগীত, তাদের তরল হাসির টুকরো, তাদের চম্পকাঙুলির কোমল সঞ্চালন ঝংকৃত বীণা-ঝংকার মিশ্রিত মধুর ধ্বনি উপরতলার বাতায়নপথে বেরিয়ে বায়ুপ্রবাহের সাথে শহরময় ভেসে বেড়ায়। ওয়াঙ লাঙ নিচে বসে সে ধ্বনি শুনতে পায় না। চা-পায়ী আর জুয়াড়িদের কোলাহল, পেয়ালার ঠুংঠাং, টেবিলের উপর ডাইস পতনের কটকট শব্দ—সব মিলে সংগীতধ্বনিকে ডুবিয়ে দেয়।

তাই পেছন-সিঁড়ি বেয়ে যে একটা মেয়ে নেমে আসে সে-শব্দও ওয়াঙ শুনতে পায় না, আর এখানে যে তার পরিচিত কেউ থাকতে পারে সে-ধারণাও তার নেই। কাঁধের উপর কার সংস্পর্শ অনুভব করে সে ভয়ানক চমকে ওঠে। চোখ তুলতে তার চোখে পড়ে ছিপছিপে সুন্দরী এক নারীর মুখ। কোকিলা! এই নারীর হাতেই সেদিন সে হোয়াঙদের জমির দাম হিসেবে হীরা-জহরতগুলো দিয়েছিল। আর বুড়ো জমিদার যখন বিক্রিনামায় কম্পিত হস্তে সই করছিল তখন এই নারীই তার কম্পিত হাত সোজা শক্ত করে ধরেছিল। ওয়াঙকে দেখে কোকিলা চাপা তীক্ষ্ণ হাসি হেসে ওঠে :

"তাই তো, ওয়াঙ চাষি যে! তোমাকে এখানে দেখব তা তো ভাবিনি!" ইচ্ছা করলেই শ্লেষের সাথে সে 'চাষি' কথাটা যেন টেনে টেনে বলে।

ওয়াঙ ভাবে, যেমন করেই হোক এই মেয়েলোকটাকে আজ বুঝিয়ে দিতে হবে যে সে আর গেঁয়ো চাষি নয়। হেসে উচ্চকণ্ঠে সে জওয়াব দেয় :

"কেন? আমার পয়সার দাম কি অন্যের পয়সার চেয়ে কম? আজকাল আমার দিনকাল ভালো যাচ্ছে, দুটো টাকা-পয়সারও মুখ দেখছি।"

কোকিলা থেমে যায়। তার চোখদুটো সাপের চোখের মতো জ্বলজ্বল করে ওঠে। যেন হাঁড়ি থেকে তেল বেয়ে পড়ছে, এমনি মোলায়েম কণ্ঠে বলে :

"এ সুখবর কে না জানে? দুটো পয়সা থাকলে আমোদ-আহ্লাদে খরচ করার এর চেয়ে ভালো জায়গা পাবে কোথায়? এখানে কত বড় বড় নওয়াব-জমিদারের ছেলেরা খানা-পিনা আমোদ-স্ফূর্তি করতে আসে! এখানকার মতো ভালো মদ আর কোথাও নেই। এখানকার মদ মুখে দিয়ে চেখে দেখেছ?"

"আমি এখানে কেবল চা খেয়েছি।" ওয়াঙ অর্ধলজ্জিত কণ্ঠে জওয়াব দেয়, "আমি মদ বা জুয়োর গুটি—কোনোটাই ছুঁইনি।"

"চা!" কোকিলা তীক্ষ্ণ কর্কশকণ্ঠে হেসে ওঠে, "কিন্তু আমাদের এখানে এত রকমারি সুস্বাদু সুপেয় মদ থাকতে, চা-খাওয়ার তোমার প্রয়োজনটা কী?"

এ-কথায় ওয়াঙ মাথা নত করলে কোকিলা চালাকি করে কণ্ঠে মধু ঢেলে বলে, "হয়তো আর কিছুই তুমি দ্যাখেনি, তাই না? ছোট সুন্দর হাত, সুরভি-মাখানো গণ্ডদেশ?"

ওয়াঙের মাথা আরও নত হয়ে পড়ে; লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। তার মনে হয়, আশেপাশের লোকেরা তার পানে বুঝি বিদ্রূপ-দৃষ্টি হানছে। সে সাহস করে চোখটা সামান্য উঠিয়ে দেখে, সবাই আপন কাজে ব্যস্ত। কেউ তাদের কথায় কান দিচ্ছে না। সে বিব্রত হয়ে কোকিলার কথার জওয়াব দেয় :

"না—না, কিছু দেখিনি—কেবল চা—"

কোকিলা আবার হাসে। দেয়ালে ঝুলানো নারীমূর্তি-আঁকা রেশমি পর্দাগুলোর পানে ইঙ্গিত করে বলে :

"এইসব তাদেরই ছবি। কাকে তুমি চাও, বেছে নাও। আমার হাতে টাকা ফ্যালো, আমি তাকেই এনে তোমার সামনে হাজির করছি।"

"তাদের!" ওয়াঙ বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলে, "আমি তো ভাবছিলাম এগুলো স্বপ্নপুরীর মেয়েদের ছবি। রূপকথার 'কুখেন-লুখেন'-পাহাড়বাসিনী দেবীদের প্রতিমূর্তি!"

"স্বপ্নপুরীর মেয়েদের ছবিই বটে।" বিদ্রূপ-মাখা রসিকতায় কোকিলা আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে জওয়াব দেয়—"কিন্তু নগদ টাকা পেলেই তারা রক্ত-মাংসের মানবী হয়ে উঠবে।" এই বলে সে পার্শ্বে দণ্ডায়মান পরিচারকদের চোখ টিপে ওয়াঙকে ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে আপন কাজে চলে যায়। সে যেন ইশারায় বলে যায়, "একটা গেঁয়ো ভূত এসেছে!"

এবার ওয়াঙ ছবিগুলোর পানে নতুন কৌতূহল নিয়ে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। তার মাথার ঠিক উপরেই ওপরতলার কামরায় এই ছবিগুলো রক্তমাংসের মানবী হয়ে বিরাজ করছে। পুরুষেরা—অবশ্য সে নয়—সেখানে যায়। সে যদি অন্যান্য পুরুষদের মতো হত! আচ্ছা, তার যদি ঘর-সংসার, স্ত্রী, ছেলে-পুলে না থাকত, তবে এ ছবিগুলোর মধ্যে কোন্‌টাকে সে পছন্দ করত! ছেলেমানুষের মতো

সে যেন মিছেমিছি একটা ছবি পছন্দ করছে। সে প্রত্যেকটা ছবি এমনি তীক্ষ্ণতা নিয়ে নিরীক্ষণ করে যেন এগুলো ছবি তার কাছে একই রকম সুন্দর মনে হয়েছে। কিন্তু এখন ছবিগুলোর সৌন্দর্যের তারতম্য তার চোখে ধরা পড়ে, তাদের মধ্যে কে অপরের চোখে সুন্দর। গোটা-কুড়ি ছবির মধ্যে তিনটে ছবি তার কাছে সবচেয়ে সুন্দরী মনে হয়। এই তিনজনের মধ্যে সে আবার বাছাই করে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে চূড়ান্তভাবে বেছে নেয়। ছোটখাটো ছিপছিপে গড়ন, বেণুর মতো লঘু, বিড়ালছানার মতো তীক্ষ্ণ ছোট মুখ; তার হাতে সবৃত্ত একটা পদ্মকলি; হাতখানায় নবোদ্গত ফার্ন-পুষ্পের কমনীয়তা।

ওয়াঙ নির্নিমেষ চোখে ছবিটার পানে চেয়ে থাকে, মদের মতো তীব্র দহন তার শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়।

সহসা তার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, "ঠিক যেন একটা কুইন্স ফুল।" নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই লজ্জিত শঙ্কিত হয়ে ওঠে, তাড়াতাড়ি উঠে পয়সাটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে সে অন্ধকারপথে বাড়িমুখো রওনা হয়।

জল-ভরা মাঠে জোছনার প্লাবন, বাইরে রুপালি কুয়াশার আবরণ আর তার দেহের ক্ষিপ্র রক্তধারায় গোপন-অগ্নির তীব্র দাহন।

উনিশ

এ-সময় ওয়াঙের জমি থেকে বন্যার পানি নেমে গেলে, রোদের তাপে বন্যার সিক্ত মাটি বাষ্পায়িত হয়ে গ্রীষ্মের তাপে আবাদের উপযুক্ত হয়ে উঠত। মাটিতেও চাষ-করা আর বীজ-বোনার ধুম লেগে যেত। তা হলে ওয়াঙ লাঙ হয়তো শহরের বড় চা-খানাটা আর মাড়াত না, অথবা ওয়াঙের কোনো সন্তানের অসুখ হলে বা বুড়ো বাপ হঠাৎ মরে গেলে ওয়াঙ কাজের ব্যস্ততায় সেই পটে আঁকা বেণুদেহীর সুন্দর মুখখানার কথা ভুলে যেত।

কিন্তু কোনোটাই হয় না। বন্যার পানিতে অনড় প্রশান্তি, বুড়ো বাপ দিব্যি ঝিমোয়। ছেলেদুটো সকালবেলা পাঠশালায় যায়, আর সন্ধ্যায় ফিরে আসে। ওয়াঙ অস্থির চাঞ্চল্যে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে; ওলান বেদনার্ত চোখে স্বামীর পানে তাকায়, ওয়াঙ সে দৃষ্টি এড়িয়ে চলে। ওলান চা করে দেয়, সে চায়ে ওয়াঙ চুমুক দেয় না। পাইপ ধরিয়ে দেয়, সে পাইপ এমনি পড়ে থাকে।

সপ্তম মাসের একদিন। দিনটা ওয়াঙের কাছে বড় দীর্ঘ মনে হয়। হ্রদের মৃদু হাওয়ায় মুখর বিলম্বমান গোধূলি তার আঙিনায় এসে দাঁড়ায়। সহসা ঘরে ঢুকে ওলানের তৈরি উজ্জ্বল কালো চাপকানটা গায়ে দিয়ে ওয়াঙ নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। পানির ধার বেয়ে শহরের অন্ধকার গেট পার হয়ে সে নতুন বড় চা-খানাটায় এসে পৌঁছায়।

আলো জ্বলছে, তেলে-জ্বলা বিদেশি আলো। আলো ঝলমল ঘরে লোকের ভিড়। কেউ মদ খাচ্ছে, কেউ গল্প করছে, কেউ সান্ধ্য-বাতাস উপভোগ করছে। অবিরাম পাখা চলছে। তাদের হাসির তরঙ্গ সংগীতধ্বনির মতো বাইরের পথে এসে ভেঙে পড়ছে। ওয়াঙ লাঙ তার চাষিজীবনে যে আনন্দ উপলব্ধি করতে পায়নি, সেই আনন্দ এই ঘরের বন্ধনে বন্দি হয়ে আছে। এই বিনাকাজের জায়গায় কেউ কাজ করতে আসে না; আসে স্ফূর্তি করতে, খেলায় মেতে থাকতে।

ওয়াঙ লাঙ দোরগোড়ায় এসে দ্বিধাজড়িত পদে থেমে যায়। খোলা দরজার পথ বেয়ে আসা অত্যুজ্জ্বল আলোতে সে দাঁড়িয়ে থাকে, যদিও তার দেহ রক্তের তীব্রবেগে শিরা-উপশিরায় হয়তো ফেটে পড়তে উদ্যত, তবু ভীরু ওয়াঙ হয়তো শেষপর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ফিরে যেত। এমন সময় একটা লোককে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক নারী অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে। এ নারী কোকিলা, এ বাড়ির দেহজীবিনীদের জন্য শিকার ধরা তার কাজ। এতক্ষণ সে অন্ধকার দরজায় অলসদেহ এলিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ওয়াঙকে দেখতে পেয়েই সে নাক সিঁটকে ওঠে :

"ও মা, এ যে চাষি গো।"

কোকিলার তাচ্ছিল্যভরা কথা তার মনে বেঁধে। সে রেগে যায়। এ রাগ তার মনে অভূতপূর্ব সাহস এনে দেয়। সে-ও বলে দেয় :

"তাতে হল কী? অন্যেরা আসে, আমি আসতে পারব না? অন্যেরা এখানে যা করে আমি তা করতে পারব না?"

কোকিলা আবার কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে বলে :

"অন্যের মতো পয়সার জোর তোমার থাকলে তুমিও আসতে পারো।"

ওয়াঙ দেখাতে চায় যে যা-খুশি তা করার মতো পয়সা তারও আছে, সে-ও বাজে লোক নয়। কোমর থেকে একমুঠো রুপোর টাকা বের করে কোকিলাকে বলে, "হবে তো, না আরো চাই?"

কোকিলা ওয়াঙের মুঠো-ভরা টাকার পানে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে কালবিলম্ব না করে বলে, "এসো, বলে দাও, কাকে চাই?"

নিজের অজ্ঞাতসারে ওয়াঙ অনুচ্চকণ্ঠে বলে ফেলে :

"তা, আমি কিছু চাই কিনা তা জানি না," কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার কামনার আগুন জ্বলে উঠে, সে চুপিচুপি বলে, "সেই ছোটটি—টিকলো থুতনি, ছোট কুইন্সফুলের মতো সুন্দর সুখ—হাতে পদ্ম-কুঁড়ি।"

কোকিলা মাথা দুলিয়ে ওয়াঙকে আসতে ইঙ্গিত করে টেবিলের মাঝখান দিয়ে পথ করে এগিয়ে যায়। ওয়াঙ তাকে দূর থেকে অনুসরণ করে। প্রথমটায় সে মনে করে, সবাই বুঝি তাকে লক্ষ করছে; কিন্তু একবার তাকিয়েই বুঝতে পারে যে, দু-একজন ছাড়া কেউ তার পানে তাকাচ্ছে না। সেই দু-একজন তাকে লক্ষ করে মন্তব্য করে,

"রাত কি এতই গভীর হয়ে গেল যে, এখনই মেয়েমানুষের কাছে ছুটতে হবে?" আর একজন বলে ওঠে, "কী কামুক পুরুষরে বাবা। সাঁঝ না হতেই উন্মাদ!"

ইতিমধ্যে তারা দুজন সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। সিঁড়ি বাইতে ওয়াঙের অসুবিধা হচ্ছে, কারণ আজ পর্যন্ত কোনো সিঁড়িওয়ালা বাড়িতে সে ওঠেনি। তবে উপরে উঠে তার মনে হয়, এ জায়গাটা মাটির সাথেই সংলগ্ন—একটু উঁচু, এই যা। কোকিলা তাকে একটা অন্ধকার হলঘরে নিয়ে গিয়ে হাঁক দেয় :

"এই নিয়ে এলাম আজ রাতের প্রথম নাগর।"

সহসা ঘরের দরজাগুলো খুলে যায়। ওখানে খোলা দরজার ফাঁকে পাতার ফাঁকে ফোটা কলির মতো ঘরের ফালি-ফালি আলোতে কতকগুলো মেয়েলোকের মুখ ইতস্তত দেখা যায়। কোকিলা নির্মমকণ্ঠে বলে :

"তোকে না—তোকে না—তোকে কে ডাকছে লা? সুচাওয়ের সেই লালমুখো বেঁটে পদ্মকে চায়।"

সারা ঘরে একটা অস্পষ্ট হাসির তরঙ্গ ওঠে, আনারের মতো রাঙামুখো একটি মেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে :

"পদ্মই নিক একে! এর গা থেকে চষা-মাঠ আর রসুনের যা সুগন্ধ বেরুচ্ছে!"

ওয়াঙ লাঙ কথাগুলো শোনে, কিন্তু প্রতিবাদ করে না। কথাগুলো ছুরির মতো তার বুকে বসে যায়। সত্যি তার চাষাড়ে চেহারা এখনও ঘোচেনি। ওয়াঙের ট্যাঁকে টাকা আছে, ভয় কী! সে বুক ফুলিয়ে চলে।

কোকিলা তাকে সঙ্গে নিয়ে এসে বন্ধ দুয়ারে ঘা দেয়। দুয়ার খুলতেই তারা ঘরে ঢুকে যায়। ফুল-তোলা লাল চাদরে ঢাকা একটা শয্যার উপর সেই পটে আঁটা মেয়ে—তার মানসী বসে আছে।

অবিশ্বাস্য ক্ষুদ্র মেয়েটার হাত; কচি হাড়, দীঘল চম্পকাঙুলি, পদ্মরাঙা নখ। অবিশ্বাস্য ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যমার সমান গোলাপি সাটিনের জুতোয় আবদ্ধ পদযুগল শয্যাপ্রান্তে দোল খাচ্ছে।

মেয়েটার পাশে বসে ওয়াঙ মুগ্ধচোখে তার পানে চেয়ে থাকে। ছবিটার মতো হুবহু মুখ। মেয়েটাকে এমনি দেখলেও ওয়াঙ চিনতে পারত। সবচেয়ে হুবহু মেয়েটার হাত দুখানা—তেমনি মনোরম ললিত আর দুগ্ধশুভ্র। লতানো পরস্পরসংলগ্ন হাত দুখানা মেয়েটার কোলের গোলাপি রেশমি জামার উপর পড়ে আছে। এ হাত স্পর্শ করা সম্ভব, ওয়াঙ তা স্বপ্নেও ভাবতে পারত না কোনোদিন।

যেরূপ মুগ্ধদৃষ্টিতে সে ছবির পানে তাকিয়েছিল, সেই দৃষ্টিতে সে আঁটসাঁট কাঁচুলি-আবৃত বেণুদেহী মেয়েটার পানে তাকায়, শাদা ফারের কলারের উপর ফুটে আছে পদ্মের মতো মুখখানা। এপ্রিকটের মতো সুগোল দুটো চোখ, রূপকথার প্রাচীনকালের এপ্রিকট-নয়না সুন্দরীদের রূপসুষমা এবার ওয়াঙের চোখে ধরা পড়ে। তার মনে হয় এ রক্তমাংসের মানবী নয়, পটে-আঁকা ছবি মাত্র।

মেয়েটা তার হস্ত-বল্লরী ওয়াঙের কাঁধে স্থাপন করে ধীরে ধীরে তার অনাবৃত বাহুতে ঝুলায়। এমনি কোমল পেলব লঘু স্পর্শ সে জীবনে কোনোদিন অনুভব করেনি। চোখে না-দেখলে হয়তো এ বিশ্বাসই করত না। তার চোখের সামনে হাতখানা নিচে নামে, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এ স্পর্শ তার দেহাবরণ ভেদ করে শিরা-উপশিরা দহন করে। হাতখানা ধীরে ধীরে ওয়াঙের আস্তিনের শেষপ্রান্তে এসে ক্ষণিক অভ্যস্ত দ্বিধায় তার মণিবন্ধে এগিয়ে পড়ে, তারপর ওয়াঙের অগৌর শক্ত হাতের শিথিল মুঠোতে ধরা দেয়, ওয়াঙের দেহ কাঁপে। কেমন করে স্বাগত জানাবে, সে তা ভেবে পায় না।

সহসা তার কানে হালকা দ্রুত-হাসির শব্দ ভেসে আসে। বাতাসের দোলায় প্যাগোডার রুপোর ঘণ্টা বেজে ওঠে যেন, হাসির মতো ক্ষীণ মধুর কণ্ঠে মেয়েটা বলে,

"কী বোকা তুমি। সারারাত কি এমনি করে বসে থাকব আর তুমি আমার দিকে চেয়ে থাকবে?"

ওয়াঙ তার দুই হাতের মধ্যে পদ্ম'র হাতখানা চেপে ধরে, কিন্তু অতি সাবধানে। পাতার মতো ভঙ্গুর শুকনো তপ্ত হাত। সে আত্মহারা হয়ে মিনতির সুরে বলে, "আমি কিছু জানি না—আমাকে শিখিয়ে নাও।"

পদ্ম তাকে শিখিয়ে নেয়।

ওয়াঙ এখন অসহ্য যন্ত্রণায় ভুগছে। সে জীবনে প্রচণ্ড রোদে প্রচণ্ড পরিশ্রমের যন্ত্রণা ভুগেছে, মরুভূমির শুকনো কনকনে শীতের যন্ত্রণা ভুগেছে, দুর্ভিক্ষের দিনে সে অনশনের যন্ত্রণা ভুগেছে, দক্ষিণের শহরে নিষ্ফল পরিশ্রমের নৈরাশ্যের যন্ত্রণা ভুগেছে, কিন্তু এই মেয়েটার এই ছোট হাতের এই যন্ত্রণার মতো অসহ্য যন্ত্রণা সে কোনোদিন ভোগেনি।

রোজ চা-খানায় যায়, পদ্ম তাকে না-ডাকা পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় প্রতীক্ষা করে; প্রতি রাত সে পদ্ম'র ঘরে প্রবেশ করে, প্রতি রাত সে গেঁয়ো চাষির মতো দুয়ারে দাঁড়িয়ে কাঁপে, জড়ের মতো মেয়েটার পাশে বসে তার হাসির ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করে। আদিম বুভুক্ষায় সে বাহুলগ্ন পদ্ম'র একটি একটি করে দল মেলা দেখে। আসে চরমক্ষণ, ফোটা-পুষ্পের চয়িত হওয়ার আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। পদ্ম ওয়াঙের নিষ্পেষণে নিজকে নিঃশেষ করে দেবার জন্য লুব্ধ আর উন্মুখ হয়ে ওঠে।

কিন্তু ওয়াঙ সম্পূর্ণরূপে পদ্মকে ধরতে পারে না, কোথায় যেন ফাঁক থেকে যায়। পদ্ম তার হাতে নিজকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দেয়, তবুও ওয়াঙ তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারে না। এই অতৃপ্তি তাকে ক্ষুধিত আর জর্জরিত করে রাখে। ওলানের বেলায় অমন ছিল না। ওলান যখন তার ঘরে আসে তখন তার রক্তেমাংসে ছিল স্বাস্থ্যের পূর্ণতা, কামাতুর পশু যেমন তার কাম-সঙ্গিনীকে প্রচণ্ড দৈহিক ক্ষুধায় উপভোগ করে, ওয়াঙও তাকে তেমনি ভোগ করে তৃপ্ত হয়েছে। ক্ষুধা মিটে গেলে তাকে ভুলে গিয়ে তৃপ্তচিত্তে আপনকাজে মন দিয়েছে। কিন্তু এই মেয়েটার প্রতি ভালোবাসায় সে-তৃপ্তি নেই, নেই তাকে তৃপ্ত করার মতো মেয়েটার

স্বাস্থ্য-সম্পদ। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে এই ক্ষীণ স্বাস্থ্যহীনা মেয়েটা তার দেওয়া টাকা বুকে লুকিয়ে তাকে দুহাতে ঠেলে দুয়ারে বার করে দেয়। তার দুর্বল হাত তখন সহসা সবল হয়ে ওঠে, ওয়াঙ অতৃপ্ত-কামনা নিয়েই ফিরে আসে। যে যেন লোনা সাগরের বুকে তৃষ্ণার্ত মানুষ, মরণোন্মুখ হয়ে সাগরের লোনা-পানি আঁজলা ভরে খায়। এ পানিতে তৃষ্ণা মেটে না। দেহ-রক্ত শুকিয়ে দিয়ে তৃষ্ণা বাড়িয়ে দেয় মাত্র। অবশেষে এ লোনা-পানিই তার মৃত্যু ঘটায়। এমনি করে সে পদ্মের কাছে বারবার যায়, আর বারবার অতৃপ্তমনে ফিরে আসে।

সারাটা গ্রীষ্মকাল মেয়েটাকে এমনি করে ভালোবেসেই কেটে যায়। মেয়েটা সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না, কোথায় ছিল, কেন এল, এ খবর সে রাখে না। মেয়েটার সাথে বড় একটা কথা বলে না; কেবল মেয়েটার অনর্গল কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে হাসির তরঙ্গ শুনে শুনেই তার সময় কেটে যায়। মেয়েটা যেন একটা শিশু। ওয়াঙ মেয়েটার মুখ, হাত আর দেহভঙ্গিমা দেখে, আয়ত চোখের অর্থ খোঁজে আর মেয়েটার দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে। মেয়েটা তার কাছে ধরা দিয়েও অ-ধরা অ-পাওয়া হয়ে থাকে। রাত্রিশেষে অতৃপ্ত-বুকে তন্দ্রালু চোখে সে স্বগৃহে ফিরে আসে।

দিন ফুরোয় না। আপনশয্যায় ওয়াঙ আর ঘুমোয় না, গরমের অজুহাতে বাঁশঝাড়ের তলায় মাদুর বিছিয়ে বিকারগ্রস্তের মতো শুয়ে থাকে। অতন্দ্র-চোখে বাঁশঝাড়ের ছায়ার পানে চেয়ে চেয়ে তার বুক অজানা সুখ-বিজড়িত ব্যথায় ব্যথিয়ে ওঠে।

কেউ কথা বলতে এলে, স্ত্রী হোক, ছেলেরা হোক—বা চিঙ এসে যদি বলে, "পানি শিগগিরই নেমে যাচ্ছে, কী বীজ ঠিক করব?" সে চেঁচিয়ে উঠে বলে :

"কেন আমাকে বিরক্ত করছ?"

অহোরাত্র তার বুকে এ কী দাহ! পদ্ম তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না; এ দহনে বুক যেন তার ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চায়।

সময় কেটে যায়, ওয়াঙ রাতের আশায় দিনের বেলা বেঁচে থাকে। ওলান বা ছেলেদের গম্ভীর মুখের পানে সে তাকায় না, তাকে দেখলেই ছেলেরা খেলা ছেড়ে সুশীল-সুবোধ হয়ে যায়। সে বুড়ো বাপের পানেও তাকায় না। বুড়ো বাপ উঁকি মেরে তার পানে চেয়ে বলে :

"তোর কী হয়েছে রে, যে, মেজাজটা এমন তিরিক্ষে আর গায়ের রঙ মেটে পাণ্ডুর হয়ে গেছে?"

রাতের বেলা ওয়াঙ পদ্ম'র হাতে গিয়ে পড়ে, পদ্ম তাকে নিয়ে যা-খুশি তাই করে। দিনের বেলা অনেক যত্ন করে ওয়াঙ তার বেণিটির প্রসাধন করে।

একদিন পদ্ম তার বেণিটি দেখে হেসে বলে, "আমাদের দক্ষিণদেশের লোকেরা মাথায় এমন বানরের লেজ রাখে না।" সে একথার কোনো জওয়াব না দিয়ে সকালে গিয়ে বেণিটি কাটিয়ে ফেলে। অথচ হাসি-বিদ্রূপ কিছুতেই কেউ কোনোদিন তাকে দিয়ে এ কাজটা করাতে পারেনি।

বেণিকাটা ওয়াঙকে দেখে ওলান ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে :

"এ কী সর্বনাশ করেছ?"

ওয়াঙ গর্জে ওঠে :

"আমি কি সারাজীবন সেকেলে ভূত হয়ে থাকব? শহরের তরুণেরা মাথার চুল ছোট করে কাটে।"

বেণিটা কাটার ভয় তবু তার বুক জুড়ে থাকে। পদ্মের কামনা সে পূর্ণ না করেও পারে না। তার কামনার ধন পদ্ম, যে নারী তার দেহে পুরুষের কাম্য সব সুষমা-সৌন্দর্যের উপাদান সাজিয়ে তার কামনা পূর্ণ করেছে।

সাধারণত ওয়াঙ গোসল করে না। তার ধারণা, পরিশ্রমে-ক্লান্তিতে ঝরা অজস্র নির্মল স্বেদধারাই এজন্য যথেষ্ট। কিন্তু এখন সে রোজ গোসল ক'রে দেহ নিরীক্ষণ করে, তার দেহটা অন্যের মতো পরিষ্কার হল কি না। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তার স্ত্রী বলে :

"রোজ এমনি করে পানি ঢাললে তুমি মরবে।"

ওয়াঙ দোকান থেকে লালরঙের সুগন্ধি বিদেশি পদার্থ—সাবান এনে, গায়ে ঘষে। কিছুতেই একটা রসুনের কোয়া মুখে দেবে না—যদিও এটা ছিল তার প্রিয় খাদ্য—পাছে পদ্ম'র সামনে দুর্গন্ধ বেরিয়ে পড়ে।

বাড়ির কেউ এসবের কারণ বুঝতে পারে না।

সে নতুন পোশাকের জন্য বাজার থেকে নতুন কাপড় কিনে আনে, ওলানই শক্ত-মজবুত ঢোলা-ঢালা করে এতদিন তার পোশাক সেলাই করে দিয়েছে কিন্তু এখন ওলানের তৈরি পোশাক আর তার পছন্দ হয় না। সে কাপড়গুলো শহরের এক দর্জিকে দিয়ে শহুরে লোকদের মতো হালকা ধূসরবর্ণের আঁটসাঁট চাপকান আর একটা হাতাহীন সাটিনের কোট তৈরি করিয়ে আনে। জীবনে সে এই প্রথম দোকানের তৈরি কালো মখমলের জুতো কিনে আনে। হোয়াঙ-মঞ্জিলের বুড়ো জমিদার এমনি জুতো পরত, কিন্তু সবার সামনে এই জামা-কাপড় হঠাৎ পরতে তার লজ্জা লাগে। তাই সে এগুলো কাগজে ভাঁজ করে একটা চা-খানার এক পরিচিত কেরানির কাছে রেখে দেয়। সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় ওঠার আগে পরে নেয়। তাছাড়া সে সোনার পানিতে ধোওয়া রুপোর আঙটিও কেনে, মাথায় সুগন্ধি ফুলের দামি তেল মাখে।

ওলান অবাক-বিস্ময়ে তার পানে চেয়ে থাকে; স্বামীর এই পরিবর্তনের কারণ সে খুঁজে পায় না। একদিন দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর সে স্বামীকে বলে :

"তোমাকে দেখে জমিদারবাড়ির এক তরুণ যুবার কথা আমার মনে পড়ছে!"

ওয়াঙ হো হো করে হেসে জওয়াব দেয় :

"দিনকাল ভালো হয়েছে; এখনও কি চাষার মতো হয়ে থাকব?"

ওলানের কথায় মনের গোপনে ওয়াঙ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে অনেকদিন পর সে আজ স্ত্রীর ওপর সদয় হয়ে ওঠে।

ওয়াঙের হাতের ফাঁক দিয়ে পানির মতো টাকা-পয়সা বেরিয়ে যেতে শুরু করে। পদ্মর সঙ্গভোগের দামই শুধু দিতে হয় না, তার মধুর আবদারও পূর্ণ করতে

হয়। তার দীর্ঘনিশ্বাসমাখা আবদার শুনে মনে হয় আবদার পূর্ণ না হলে তার বুক ভেঙে খানখান হয়ে যাবে।

আজকাল ওয়াঙ পদ্ম'র সামনে কথা বলতে শিখেছে। সে সোহাগভরা কণ্ঠে পদ্মকে বলে, "কী হয়েছে, প্রাণ?" পদ্ম জওয়াব দেয়, "পাশের ঘরের কালো মানিকের এক বাবু তাকে একটা সোনার চুলের কাঁটা দিয়েছে, আমার এই একটা রুপোর কাঁটা, কতদিন থেকে যে এটা পরছি!"

ওয়াঙ পদ্ম'র কোঁকড়ানো কালো চুলের গোছাটা কপাল থেকে সরাতে সরাতে সোহাগ-ঢালা সুরে না বলে পারে না—

"আমিও আমার মানিককে একটা সোনার কাঁটা কিনে দেব।"

শিশুকে যেমন বুলি শেখায়, তেমনি করে পদ্ম ওয়াঙকে এসব আদরের বুলি শিখিয়েছে। পদ্মকে এসব আদরের নামে ডাকবে বলেই সে ওয়াঙকে এগুলো শিখিয়েছে সত্য; কিন্তু তার চাষামুখে—যে-মুখে সে এতদিন বীজ-বোনা, ফসল-তোলা, বিষ্টি-রোদ উচ্চারণ করেছে—এসব আদরের নাম ভালো করে ফোটে না, এ নাম বলতে গিয়ে তার মুখে বেধে-বেধে যায়।

এমনি করে টাকা-পয়সা দেয়ালের ফোকর আর থলি থেকে উধাও হতে থাকে। আগের দিন হলে ওলান প্রতিবাদ করে বলত, "দেয়ালের ফোকর থেকে টাকা বের করছ কেন?" কিন্তু এখন কিছু বলে না, মনের দুঃখে দুচোখ মেলে নির্বাক চেয়ে থাকে শুধু। সে জানে, ওয়াঙ তার জীবন থেকে বহুদূরে নতুন জীবন গড়ে তুলছে। কিন্তু সে জীবনের রহস্য তার অজানা। যেদিন থেকে সে জেনেছে ওয়াঙ তার মধ্যে কোনো সৌন্দর্য খুঁজে পায় না, সেদিন থেকে সে ওয়াঙকে ভয় করে। সে কোনো কথা স্বামীকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। কারণ কোনো কথা জিজ্ঞেস করলেই ওয়াঙ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে, এমনি মারমুখো হয়ে আছে সে!

একদিন ওলান পুকুরে কাপড় কাচছে এমন সময় শহরফেরত ওয়াঙ তার পাশে এসে দাঁড়ায়, কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে সে রুক্ষকণ্ঠে ওলানকে বলে—মনের লজ্জা ঢাকার জন্যই এ রুক্ষতা—

"তোমার কাছে যে দুটো মুক্তো ছিল, সেগুলো কোথায়?"

ওলান কাপড়-কাচা থামিয়ে ভীরুচোখে পাড়ে দণ্ডায়মান স্বামীর পানে তাকিয়ে বলে :

"মুক্তোর কথা বলছ? আমার কাছেই আছে।"

ওয়াঙ তার মুখের পানে না-তাকিয়ে তার শিরাবহুল ভেজা হাতের পানে তাকিয়ে বলে :

"মিছেমিছি ঘরে মুক্তো রেখে কোনো লাভ নেই।"

ওলান ধীরকণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"ভাবছিলাম একসময় এ দিয়ে ইয়ারিঙ বানাব।" ওয়াঙ একথা শুনে হেসে উঠবে ভেবে সঙ্গে সঙ্গেই বলে, "ছোটমেয়েটাকে বিয়ের সময় দিতে পারতাম।"

ওয়াঙ তীক্ষ্ণ কঠোর কণ্ঠে জওয়াব দেয়,

"যা রঙের বাহার মেয়ের! ঐ মেটেরঙে মুক্তো পরে কী হবে? মুক্তো পরবে সুন্দরী মেয়েরা।" তারপর সহসা চেঁচিয়ে ওঠে, "ওগুলো আমাকে দিয়ে দাও, দরকার আছে।"

ওলান তার সিক্ত শিরাবহুল হাতখানা বুকে গলিয়ে দিয়ে ছোট একটা মোড়ক বের করে ওয়াঙের হাতে তুলে দেয়। ওয়াঙ মোড়কটা খোলে। হাতের তেলোয় মুক্তোদুটো জ্বলজ্বল করে উঠতেই ওয়াঙের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

ওলান আবার কাপড়কাচায় মন দেয়। তার চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রু ঝরে পড়ে, সে অশ্রু মোছে না সে। পাথরের উপর ছড়ানো ভিজে কাপড়গুলো কাঠের মুগুর দিয়ে আরও জোরে পিটতে থাকে।

বিশ

একদিন না-বলে-কয়ে হঠাৎ ওয়াঙের চাচা এসে উপস্থিত; নয়তো ওয়াঙ লাঙ নিঃস্ব না-হওয়া পর্যন্ত এই পথেই চলত। চাচা আগের মতোই শতচ্ছিন্ন নোংরা বোতামহীন জামা-কাপড় কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে হঠাৎ আসমান থেকে পড়ার মতো এসে উপস্থিত। চেহারায় বড় একটা পরিবর্তন নেই। রোদ-বিষ্টি আর বয়সের ছাপ পড়েছে এই যা। সবাই নাস্তা খেতে বসেছে এমনি সময়ে সে তার দুপাটি দাঁত বের করে এসে হাজির। ওয়াঙ লাঙ তাকে দেখেই বিস্ময়ে হতবাক। সে ভুলেই গিয়েছিল যে, তার চাচা এখনও বেঁচে। তার মনে হল তার চাচার প্রেতাত্মা যেন তাকে দেখতে এসেছে। ওয়াঙের বুড়ো বাপ চোখ পিটপিট করে আগন্তুককে চিনতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। তার চাচাই তখন বলে ওঠে :

"কী বড়ভাই, ওয়াঙ, নাতিরা, বৌমা, কেমন আছ তোমরা?"

ওয়াঙ হতাশমনে উঠে পড়ে, তবু বাইরের ভদ্রতা বজায় রেখে জিজ্ঞেস করে, "চাচা, তোমার খাওয়া হয়েছে?"

"না," সে জওয়াব দেয়, "তোদের সাথেই খেয়ে নেবখন।"

সে বসে পড়ে নিজেই বাটি-কাঠি টেনে। নিজের হাতেই ভাত, মাছ, গাজর, শুকনো বিন টেবিল থেকে নিয়ে পেট ভরে খায়। তার খাওয়ার রকম দেখে মনে হল, অনেকদিন তার পেটে দানা পড়েনি। তিন বাটি ভাতের মণ্ড, কড়মড় করে মাছের কাঁটা, একরাশ বিন না-খাওয়া পর্যন্ত কেউ কথা বলল না। আহারান্তে চাচা দাবির সুরে বলে :

"এবার আমার ঘুমোতে হবে, তিন রাত ঘুম হয়নি।"

হতবুদ্ধি ওয়াঙ বাধ্য হয়ে চাচাকে তার বাপের ঘরে নিয়ে যায়। সে লেপ উঠিয়ে দেখে চমৎকার বিছানা পাতা। ওয়াঙকে বলে :

"শুনেছিলাম অবশ্য, তোর টাকা-পয়সা হয়েছে। কিন্তু এত বড়লোক হয়েছিস সে ধারণাই আমার ছিল না।" এই বলে সে সটান বিছানায় শুয়ে লেপ মুড়ি দেয়। এমনি তার ভাবখানা যেন এ সবই তার নিজের। মুহূর্তে সে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ে।

বিস্ময়-বিহ্বল ওয়াঙ মাঝঘরে ফিরে আসে। এবার তার চাচাকে আর তাড়ানো সম্ভবপর নয়। দারিদ্র্যের অজুহাত সে আর মানবে না, সঙ্গে তার চাচির কথাও ওয়াঙের মনে উঁকি দেয়—তার চাচি আর গুণধর পুত্রটির আগমনও কেউ রোধ করতে পারবে না।

তাই শেষপর্যন্ত ঘটে। বিকেলবেলার দিকে ঘুম ভাঙতেই তার চাচা তিন-তিনটে হাই তুলে কাপড় সামলাতে সামলাতে বাইরে এসে বলে :

"এবার বউকে আর ছেলেটাকে গিয়ে নিয়ে আসি। তোমার এই বড় সংসারে আমাদের তিনজনকে খেতে পরতে দিলে টেরই পাবে না।"

নিরুপায় ওয়াঙ বিমর্ষকণ্ঠে চাচার কথায় সায় দেয়। তার এই সচ্ছল সংসারে আপন চাচাকে জায়গা না দিলে লোকে তার মুখে থুতু দেবে। গাঁয়ের লোকের কাছে তার তো মান-সম্ভ্রমও হয়েছে। সে জনমজুরদের সবাইকে পুরনো বাড়িতে সরিয়ে দিয়ে সদর-দরজার পাশের ঘরগুলো খালি করে ফেলে।

সেদিন সন্ধ্যায় তার চাচা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে চলে আসে। মনের গহনে ওয়াঙ জ্বলেপুড়ে মরে, কারণ বিনা-প্রতিবাদে তাকে এ অত্যাচার সহ্য করে হাসিমুখে আত্মীয়দের আপ্যায়ন করতে হবে। একে তো চাচির ফোলা-ফোলা চকচকে মুখখানা দেখে তার রক্ত ক্রোধে টগবগ করে ওঠে, তার উপর তার চাচার উদ্ধত গুণ্ডা ছেলেটা। তাকে দেখলেই ওয়াঙের হাত নিশপিশ করে। রাগে-দুঃখে সে শহরে যাওয়াও ছেড়ে দেয়।

ধীরে ধীরে সব সয়ে যায়। ওলানও ওয়াঙকে বুঝিয়ে বলে, "রাগ করে কী লাভ? সহ্য করতেই হবে।" ওয়াঙও এবার উপলব্ধি করে যে তার চাচার পরিবার তাদের নিজেদের থাকা-খাওয়ার স্বার্থে এবার ভদ্রোচিত ব্যবহার করবে। মানসিক স্থৈর্য ফিরে পেয়ে তার মন আবার পদ্ম'র জন্য উতলা হয়ে ওঠে; সে বিড়বিড় করে নিজকে সান্ত্বনা দেয় :

"বাড়িতে বুনো কুকুরের দল যা বাসা বেঁধেছে, বাইরে একটু শান্তির জায়গা না হলে চলে না।"

তার মনে আবার কামনার আগুন জ্বলে ওঠে, অতৃপ্ত কামনার জ্বালায় সে অস্থির হয়ে ওঠে।

ওলান তার সারল্য, বুড়ো বাপ তার বার্ধক্য আর চিঙ তার বন্ধুবাৎসল্য হেতু যা এতদিন দেখতে পায়নি, ওয়াঙের চাচির চোখে তা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে। সে চোখে হাসির ঝলক ফুটিয়ে চেঁচিয়ে ওলানকে বলে :

"ওয়াঙ লাঙ যে আবার অন্য ফুলের মধু খাচ্ছে!"

ওলান একথার মর্ম বুঝতে না-পেরে বিনীত দৃষ্টি তোলে চাচি-শাশুড়ির পানে। শাশুড়ি হেসে বলে, "তরমুজ কেটে দু'ফাঁক করে না দিলে তুমি দানা দেখতে পাও না। তাই না? কী হাবা মেয়ে। তবে সাদা কথায় বলছি, তোমার স্বামী অন্য এক মেয়েমানুষের জন্য উন্মাদ। বুঝলে?"

তার চাচির কথা ওয়াঙ লাঙের কানে আসে। সে সকালবেলা পদ্ম'র সাথে নিশি-যাপনের ক্লান্তিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়েছিল। তার চাচির কথায় তার তন্দ্রা ভেঙে যায়। আঙিনায় দাঁড়িয়ে তার চাচি কথা বলছিল, সে কান পেতে তার কথা শোনে। এই স্ত্রীলোকটার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় সে বিস্মিত হয়। যেন হাঁড়ি থেকে তেল পড়ছে, তেমনি মোটা গলায় তার চাচি বলে যায় :

"অনেক পুরুষ দেখলাম। কোনো পুরুষ যখন সহসা চুলে টেরি কেটে, নতুন পোশাক আর মখমলের জুতো পরে ফুলবাবু বনে যায়, তখন বলতেই হবে, সে নতুন মেয়েমানুষের খোঁজ পেয়েছে।"

ওলানের মুখ থেকে এক বুকভাঙা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে। ওয়াঙ কথাগুলো ভালো করে বুঝতে পারে। শাশুড়ি আবার বলতে থাকে, "ওগো বোকা মেয়ে। এক মেয়েমানুষে পুরুষের সাধ মেটে না। আর তার যদি আবার সংসারে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সে মেয়েমানুষের গতর নষ্ট হয়ে যায়। সে পুরুষ তখন উতলা হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে নতুন মেয়েমানুষ জুটিয়ে পটিয়ে নেয়। তুমি তো তার হালের বলদ! তোমার মধ্যে কী আছে তাকে ঘরে ধরে রাখার, তার মনের বাসনা পূর্ণ করার? তার হাতে পয়সা আছে, সে যদি পয়সা খরচ করে একটা মেয়েমানুষ ঘরে এনে রাখে, তাতেও তো তোমার হায়-আফসোস করার কোনো কারণ নেই। সব বেটাছেলেরাই এ-রকম করে। আমার ঘরের নিষ্কর্মা মিনসেই কি কম যায়? ট্যাঁকে পয়সা নেই নিজের পেট চালাবার তাই পারে না।"

সে অনেক কথাই বলে; কিন্তু সবকথা ওয়াঙ শুনতে পায় না। একটা কথা শুনেই তার চিন্তাধারা থমকে দাঁড়ায়। সহসা তার অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করার পথ খুলে যায়। সে পদ্মকে কিনে এনে বাড়িতে রেখে দেবে, অন্য পুরুষ তার সঙ্গভোগে বঞ্চিত হবে। সে তখন মনের সুখে অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবে, একথা ভেবেই সে চট করে শয্যা ছেড়ে বাইরের আঙিনায় গিয়ে চাচিকে হাত-ইশারায় ডাকে। চাচি তার ইশারায় নির্জন আঙিনায় খেজুরগাছের নিচে চলে গেলে, সে বলে :

"আঙিনায় দাঁড়িয়ে যা বলেছ, সব শুনেছি। তুমি খাঁটি কথাই বলছে, ওকে নিয়ে আমার চলছে না, আমার যখন সবাইকে খাওয়াবার মতো জোত-জমি আছে, তখন আমি তা করব না-ই বা কেন?"

চাচি তার কথা লুফে নিয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"নিশ্চয়ই, করবে না কেন? পয়সাওয়ালারা অমন করেই থাকে, গরিবেরাই কেবল এক পেয়ালায় পানি খায়।" ওয়াঙের পরবর্তী প্রশ্ন কী হবে জেনেই তার চাচি একথাগুলো বলে। চাচির পরিকল্পনা অনুযায়ীই ওয়াঙ বলে যায় :

"কিন্তু আমার হয়ে কে গিয়ে ঘটকালি করবে? একজন পুরুষ তো আর চট করে একজন মেয়েমানুষকে বলতে পারে না, এসো, আমার বাড়িতে থাকবে।"

একথায় চাচি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জওয়াব দেয় :

"এ ব্যাপারটা তুমি নিশ্চিন্তে আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারো, শুধু বলে দাও মেয়েমানুষটা কে? সব ঠিক করে দেব।"

ওয়াঙ দ্বিধাজড়িত ভীরু কণ্ঠে জওয়াব দেয়। আজ পর্যন্ত সে এ নামটা প্রকাশ করে নি :

"মেয়েটির নাম পদ্ম।"

তার মনে হয় পদ্মকে সবাই জানে, সবাই তার নাম শুনেছে। অথচ দুমাস আগে পদ্ম'র অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার নিজেরও কোনো জ্ঞান ছিল না।

"মেয়েটা থাকে কোথায়?"

"আবার কোথায়? শহরের বড় রাস্তার উপর বড় চা-খানাটায়!" সে উষ্মার সঙ্গে জওয়াব দেয়।

"ও, পুষ্পমহল নামের বাড়িটায়?"

"তা ছাড়া আবার কী?" ওয়াঙ প্রত্যুত্তরে বলে।

শুকনো ঠোঁটে আঙুল বুলাতে বুলাতে একটু চিন্তা করে সে বলে :

"ও-বাড়ির কারো সাথে আমার পরিচয় নেই, একটা পথ যা-হোক বের করতে হবে, আচ্ছা মেয়েটার অভিভাবিকা কে?"

কোকিলার নাম আর পূর্বপরিচয় দিতেই চাচি সহাস্যমুখে বলে ওঠে :

"ও, সেই কোকিলা? তার শয্যায়ই তো বুড়ো জমিদার মারা গেল। তারপর থেকে সে বুঝি এই কাজই করছে। এ কাজ ছাড়া করবেই-বা কী?"

এই বলে সে হি-হি করে হেসে সহজ কণ্ঠে বলে, "কোকিলা! অতি সহজ কাজ! কোকিলা মাগী পয়সা পেলে সব করতে পারে, এমনকি পাহাড় পর্যন্ত বানাতে রাজি আছে।"

একথা শুনে ওয়াঙের মুখখানা সহসা যেন শুকিয়ে যায়। ফিসফিস কণ্ঠে বলে :

"টাকার কথা। সোনা-রুপা, জোত-জমি বিক্রি করতে হলেও রাজি!"

পদ্ম'র প্রতি ওয়াঙের আবেগ এবার বিচিত্র, বিপরীত রূপ গ্রহণ করে। সব ব্যবস্থা পাকাপাকি হওয়ার আগে সে আর পদ্ম'র ঘরে যায় না। সে আপন মনে ভাবে : "ও যদি আমার বাড়িতে এসে একমাত্র আমার হয়ে থাকতে রাজি না হয়, তবে আমার গলা কেটে ফেললেও আমি আর ওর কাছে যাব না।"

কিন্তু 'যদি সে আসতে রাজি না হয়' কথাটা ভাবতেই ভয়ে তার বুকের স্পন্দন থেমে আসে; তাই বারবার সে তার চাচির কাছে ছুটাছুটি করে। চাচিকে বলে, "অর্থের অভাবে কাজ যেন পণ্ড না হয়। কোকিলাকে কি জানিয়েছ যে, টাকা-পয়সার অভাব আমার নেই? পদ্মকে বলবে, তাকে আমার বাড়িতে কোনো কাজ করতে হবে না, শুধু সেজেগুজে বসে থাকবে, ভালো লাগলে রোজ হাঙরের পাখনা খাবে!"

একদিন তার মোটা চাচি তার জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে চোখমুখ ঘুরিয়ে বলে দেয় :

"হয়েছে—যথেষ্ট হয়েছে। আমি কি এতই বোকা? আমি কি এই কাজে নতুন হাত দিয়েছি? মেয়ে-পুরুষের জোড় মিলানো কি এই আমার প্রথম? আমার উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্তে বসে থাকোগে। আমি সব বলেছি, বহুবার বলেছি।"

এবার আঙুল-কামড়ানো আর পদ্ম'র থাকার ব্যবস্থা করা ছাড়া ওয়াঙের আর কিছু করার থাকে না। সে ওলানকে তাড়া দিয়ে এটা-ওটা করায়। বাড়িতে ঝাড়া, ধোয়ামোছা চলতে থাকে, টেবিল চেয়ার সরানো হয়, হুলুস্থুল পড়ে যায় বাড়িতে। বেচারি ওলান আরও শঙ্কিত হয়ে পড়ে, মুখে কিছু না বললেও সে ইতিমধ্যে জেনেছে, কী আপদ তার মাথার উপর আসছে।

ওয়াঙ আর ওলানের শয্যাসঙ্গ সহ্য করতে পারে না। বাড়িতে দুটো মেয়েমানুষ রাখতে হলে আরও ঘর চাই। ওয়াঙ আপনমনে ভাবে, বরং আর একটা মহল হলেই ভালো হয়। সেখানে সে তার প্রিয়তমা পদ্ম'র সাথে নিরিবিলি রঙ্গরস করতে পারবে, কোনো হাঙ্গামাই থাকবে না। এই ভেবে সে তার লোকজনদের আর একটা মহল তৈরি করতে হুকুম দেয়। মাঝঘরের পিছনে হবে সে মহলটা, সে মহলে হবে একটা বড় কামরা আর তার পাশে দুটো ছোট কামরা। লোকজনেরা তার পানে বিস্ময়ে চেয়ে থাকে, ভয়ে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। ওয়াঙ নিজেই কাজের দেখাশোনা করে। চিঙকেও এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় না। বাড়ির মাটির দেয়াল তৈরি হয়ে গেলে ওয়াঙ একদিন শহর থেকে ছাদের জন্য টাইল কিনে আনে।

দেয়াল আর ছাদ হয়ে গেলে ইট কিনে ঘরগুলোর মেঝে পাকা করা হয়। এমনি করে পদ্ম'র জন্য মহল তৈরি হয়ে যায়। ওয়াঙ ঘরের পর্দার জন্য লাল কাপড় আর একটা নতুন টেবিল ও দুটো কাজ-করা চেয়ার কিনে আনে। দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার জন্য পাহাড়ের দৃশ্য আঁকা দুটো পটও নিয়ে আসে। তারপর ঢাকনাওয়ালা একটা গালার ডিশ কিনে আনে ওয়াঙ। তাতে নানারকম সুস্বাদু খাদ্য ভরে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়। গদি-আঁটা কারুকার্য-করা বেশ বড় একটা খাট কেনা হয়, আর সে খাটের জন্য কেনা হয় ফুলের কাপড়ের মশারি। এসব ব্যাপারে ওলানকে কিছু করার জন্য বলতে তার লজ্জা লাগে। তাই সন্ধ্যার সময় তার চাচি এসে মেয়েদের রুচিমাফিক সব সাজিয়েগুছিয়ে দিয়ে যায়।

এদিককার সব কাজ সম্পূর্ণ; কিন্তু পনেরো দিন গত হয়ে গেল, ওদিকের ব্যবস্থা এখনও পাকাপাকি হল না। ওয়াঙ নতুন মহলের আঙিনায় ঘুরে বেড়ায়, আর ভাবে, আঙিনার মাঝখানে একটা ছোট্ট জলাশয় কাটালে মন্দ হয় না। মজুর ডেকে ওয়াঙ একটা চতুষ্কোণ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চার ফুট—পাকা চৌবাচ্চা তৈরি করিয়ে তাতে শহর থেকে সোনালি মাছ কিনে এনে ছেড়ে দেয়। আর কিছু করার নেই। ওয়াঙ অস্থিরচিত্তে দিন গোনে।

এই কয়দিন ওয়াঙ কারো সাথে কথা বলেনি। কেবল ছেলেমেয়েদের নোংরা থাকার জন্য গালাগালি করেছে; ওলান কেন তিনদিন মাথায় চিরুনি লাগায়নি,

সেজন্য চেঁচামেচি করেছে। একদিন সকালে ওলান অতিষ্ঠ হয়ে বিলাপ করতে শুরু করে দেয়। দিনের-পর-দিন অনাহারে থেকেও ওলান কোনোদিন চোখের পানি ফেলেনি। ওয়াঙ আরও রুক্ষস্বরে চেঁচায় :

"এতে হল কী? আমি তো তোমার ঘোড়ার ল্যাজে চিরুনি দিতে বললাম, এতেই বিলাপ শুরু করেছ?"

ওলান একথায় শুধু বারবার কেঁদে কেঁদে বলে :

"আমি তোমার পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছি—পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছি—"

ওয়াঙ স্তব্ধ হয়ে যায়, সে অস্বস্তি অনুভব করে, লজ্জায় আপনমনে বিড়বিড় করতে করতে চলে যায়। এটা সত্যি যে, আইনত সে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে পারে না, তার স্ত্রী তাকে তিন-তিনটে জীবিত সুপুত্র দিয়েছে, তার আপন কামনার চরিতার্থতা ছাড়া অন্য কোনো অজুহাতে সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে না।

দিনকয়েক পর চাচি এসে জানায়, "সব ঠিকঠাক, চা-খানার মালিকের হয়ে কোকিলাই সব করছে বলে তাকে দিতে হবে নগদ গুনে একশোটি ডলার। পদ্ম চায় একজোড়া জেড-এর দুল, একটা সোনার আঙটি, দুপ্রস্থ সাটিনের পোশাক, দুপ্রস্থ রেশমি পোশাক, এক ডজন জুতো আর চায় বিছানার জন্য রেশমি কাপড়ের দুখানা লেপ।"

এসব কথার সবটুকু ওয়াঙের কানে যায় না, সে মাত্র "সব ঠিকঠাক" কথাটাই শোনে।

"তাই হবে।" বলেই ওয়াঙ বাড়ির ভিতরে গিয়ে কতকগুলো ডলার এনে বুড়ির হাতে দেয়; তবে খুব গোপনে, যাতে কেউ না বুঝতে পারে যে, এতদিনের সঞ্চয় এমনি করে অপব্যয় হচ্ছে। সে তার চাচিকে বলে, "তুমি নিজের জন্য দশ ডলার রেখে দিও।"

তার চাচি স্থূলদেহ দুলিয়ে মাথা এদিক-ওদিক হেলিয়ে এ দান গ্রহণে অস্বীকৃতির অভিনয় করে বলে :

"না, আমি নেব না। আমরা এক পরিবারের লোক আর তুই তো আমার ছেলের মতো। তোর খাতিরেই এ কাজ করছি, টাকার লোভে নয়।" কিন্তু ওয়াঙের চোখ এড়ায় না যে, এই অস্বীকৃতির অভিনয় করতে করতে বুড়ি তার হাত বাড়িয়ে দিতে কসুর করে না, ওয়াঙ তার বাড়ানো হাতে ডলারগুলো ঢেলে দিয়ে ভাবে যে, সার্থক ব্যয় হল।

ওয়াঙ এবার বাজার থেকে অনেকখানি গাওয়া গোশ্‌ত, ম্যাঞ্জাবিন মাছ, বাঁশের কোঁড়, বাদাম, শুকনো হাঙরের পাখনা ইত্যাদি তার জানা সবরকম সুস্বাদু উপকরণ নিয়ে আসে।

এবার চলে প্রতীক্ষা, যদি তার বুকের তীব্র-দহন, অস্থিরতা আর অধৈর্যকে প্রতীক্ষা বলা যায়।

গ্রীষ্মশেষের এক সূর্যকরোজ্জ্বল তপ্ত দিবসে পদ্ম আসে, দূর থেকে ওয়াঙ তার আগমন দেখতে পায়। সে এক ঘেরাটোপে ঢাকা বাঁশের সিডান চেয়ারে বসে আসছে। কয়েকজন লোক আঁকাবাঁকা মেঠো পথ দিয়ে তার চেয়ার বয়ে আনছে, চেয়ারের পিছনে কোকিলা। এক অজানা ভয়ে ওয়াঙের মন কেঁপে ওঠে, সে আপনমনে বলে, "বাড়িতে আমি কাকে নিয়ে আসছি?"

সে কী করছে তা তার মনের গোপনে জানা আছে। সে দ্রুতপদে যে ঘরে জীবনের এতবছর সে তার স্ত্রীর সাহচর্যে কাটিয়েছে, সেই ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। ঘরের অন্ধকারে সে প্রতীক্ষা করে, তার চাচি দুয়ারে এসে তাকে ডাকাডাকি করে কে এসেছে তাই দেখতে।

ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে আসে, লজ্জায় তার মাথা নুয়ে পড়ে। এ মেয়েটাকে সে যেন কোনোদিন দেখেনি। সামনে না-তাকিয়ে সে এদিক-ওদিক তাকায় কিন্তু কোকিলা আনন্দোজ্জ্বল কণ্ঠে তাকে সাদর-অভ্যর্থনা জানায় :

"এসো! তোমার সঙ্গে যে এমন লেনদেনও করতে হবে, তা তো জানতাম না।"

কোকিলা চেয়ারের কাছে গিয়ে পর্দা উঠিয়ে বলে :

"বেরিয়ে এসো গো পদ্মফুল! তোমার বাড়িঘর আর মালিককে বুঝে নাও।"

বাহকদের মুখে বিদ্রূপের হাসি লক্ষ করে ওয়াঙ কেমন ব্যথিত হয়ে ওঠে। মনকে সান্ত্বনা দেয়, "এসব শহরের বাজে ছোটলোক, এদের হাসির পরোয়া কে করে?" তাদের হাসি দেখে তার রাগ হয়েছে বলে সে আবার রেগে যায়, কিন্তু কথা বলে না।

পর্দা উঠতেই সে অজ্ঞাতসারে চেয়ারের কোণের দিকে তাকায়, পদ্মফুলের মতো সযত্ন প্রসারিত পদ্ম'র মুখখানা তার চোখে পড়ে। সে এবার সব ভুলে যায়; বাহকদের প্রতি তার ক্রোধও মন থেকে মুছে যায়। তার মনে শুধু এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে থাকে যে, সে এই মেয়েটাকে কিনে এনেছে, মেয়েটা চিরদিন তার বাড়িতে থাকবে। প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সে দেখে, পদ্ম উঠে আসছে। হালকা হাওয়ায় যেন ফুলের গায়ে দোলা লাগছে। সে নির্নিমিখ চেয়ে দেখে, কোকিলার হাত ধরে পদ্ম চেয়ার থেকে অবনত মস্তকে তার ছোট্ট দুখানি পায়ের উপর ভর দিয়ে দুলে দুলে এগিয়ে যাচ্ছে। সে ওয়াঙের সাথে কোনো কথা না বলে কোকিলাকে জিজ্ঞেস করে :

"আমার মহল কোন্‌দিকে?"

ওয়াঙের চাচি তাড়াতাড়ি এসে পদ্মকে ধরে। তারা দুজন—কোকিলা আর ওয়াঙের চাচি পদ্মকে তার জন্য তৈরি নতুন মহলে নিয়ে যায়। আজ ওয়াঙের বাড়ির কেউ পদ্মকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে না। ওয়াঙ জনমজুরদের আর চিঙকে বহুদূরের ক্ষেতে কাজ করতে পাঠিয়ে দিয়েছে, ওলানও সকালবেলায় তার ছোট দুই বাচ্চাকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে, ওয়াঙ জানে না। বড় দুই ছেলে পাঠশালায়। বুড়ো দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমোচ্ছে। সে চোখেও কিছু দেখে না, কানেও শোনে না, আর হাবা

মেয়েটার তো কোনোদিকে লক্ষই নেই। মা আর বাপ ছাড়া সে কাউকে চেনে না। পদ্ম ঘরে ঢুকে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে কোকিলা ঘরের পর্দা টেনে দেয়।

একটু পরে ওয়াঙের চাচি ঠোঁটে বিদ্বেষের বাঁকা হাসি মেখে দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে—হাতে যেন কিছু লেগে আছে—বলে, "ওর গায়ে কী বিদঘুটে গন্ধ।" তারপর কথায় আর হাসিতে আরও বিদ্বেষ ছড়িয়ে টেনে টেনে বলে, "ওগো বাছা! যত কচি দেখায়, আসলে তত কচি নয়। আমি বলছি, বয়সে ভাটা পড়েছে; দুদিন পর কোনো পুরুষমানুষ ওর পানে চোখ তুলে চাইত না। নইলে জেড-এর দুল, সোনার আঙটি আর সাটিনের পোশাকের লোভে সে কোনোদিন চাষার বাড়িতে ঢুকত না, হোক সে টাকা-পয়সাওয়ালা চাষি।" তার এই মন্তব্যে রাগে ওয়াঙের মুখ লাল হয়ে উঠেছে দেখে বুড়ি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, "তবে সুন্দরী বটে। ওর চেয়ে সুন্দরী আমার চোখে পড়েনি। হোয়াঙদের বাড়ির এই উঁচু-চোয়ালে কুশ্রী বাঁদিটার সাথে এতদিন ঘর করে, এই মেয়েটাকে মনে হবে সুগন্ধি মিহি চাউলের মতো সুস্বাদু।"

ওয়াঙ কোনো কথার জওয়াব দেয় না। অস্থির চিত্তে বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়। অবশেষে লাল পর্দাটা সরিয়ে সে পদ্ম'র ঘরে সাহস করে ঢুকে পড়ে।

সারাদিন ওলান বাড়ি ফেরে না। সাতসকালে সে কপির পাতায় বাসি খাবার মুড়িয়ে ছোট্ট বাচ্চাদুটো আর নিড়ানিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর সে ক্লান্তদেহে গায়ে কাদামাটি মেখে নীরবে বাড়িতে ঢোকে। কাউকে কিছু না বলে নীরবে সে বাবুর্চিখানায় গিয়ে রোজকার মতো খাবার তৈরি করে। বুড়ো, হাবা মেয়ে আর বাচ্চাদের খাইয়ে নিজেও সামান্য কিছু খেয়ে নেয়। তারা ঘুমিয়ে পড়লে, সে হাতমুখ ধুয়ে তার ঘরে একলা শয্যায় শুয়ে পড়ে। ওয়াঙ তখনও পদ্ম'র ঘরে স্বপ্নের রঙিন জাল বুনছে।

ওয়াঙ এখন অহোরাত্র প্রেমের মহোৎসবে আকণ্ঠ পানাহার করে মত্ত হয়ে থাকে। আলস্যের সুষমায় শায়িতা পদ্মের পানে বসে বসে ওর রূপসুধা পান করে; পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে ওকে উপভোগ করে। প্রথম হেমন্তের উত্তাপে পদ্ম বাইরে আসে না। কোকিলা ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে ওকে গোসল করিয়ে দেয়, ওর গায়ে তেল মাখে, ওর চুলে সুবাসিত তেল দেয়। পদ্মই জেদ করে কোকিলাকে সঙ্গে এনেছে ওর দাসীরূপে। কোকিলাকেও মুক্তহস্তে পয়সা দেয়, তাই কোকিলাও বহুজনের পরিচর্যা ছেড়ে একজনের পরিচর্যাটা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে।

পদ্ম সবুজ রেশমি গ্রীষ্মাবাস, কাঁচুলি আর ঢিলেঢালা পায়জামা প'রে ওর সুশীতল অন্ধকার ঘরে শুয়ে সারাদিন অলস-আবেশে কাটিয়ে দেয়।

সাঁঝের বেলা পদ্ম ওয়াঙকে মধুর রূঢ় ভাষায় ঘর থেকে বের করে দিয়ে আবার গোসল ও প্রসাধনে রত হয়। কোকিলা ওকে গোসল করিয়ে নতুন করে সাজায়, শাদা মিহি রেশমের অন্তর্বাসের উপর ওয়াঙের দেওয়া পিচরঙা রেশমের পোশাক পরিয়ে দেয়, পায়ে পরিয়ে দেয় ফুলতোলা মখমলের জুতো। পদ্ম এবার ছোট ছোট পা ফেলে আঙিনায় গিয়ে জলাশয়ের ভাসমান সোনালি মাছের খেলা দেখে। ওয়াঙ

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার নিজস্ব পরম বিত্তের পানে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। ওর দুলে দুলে চলার ভঙ্গি, ওর ছোট সরু পা দুখানি আর লতার মতো লুলিত হাত—ওয়াঙের কাছে বিশ্বের সেরা বলে মনে হয়।

ওয়াঙ এই পরম ঐশ্বর্য একলা ভোগ করে; তার অতৃপ্ত কামনা তৃপ্ত হয়।

একুশ

পদ্ম আর ওর পরিচারিকা কোকিলার ওয়াঙের বাড়িতে প্রবেশের ব্যাপারটা নির্বিঘ্নে চুকেবুকে গেল, এ ধারণা করার কোনো হেতু নেই। একই সংসারে স্ত্রী-সংখ্যার আধিক্য শান্তিপূর্ণ হতে পরে না। ওয়াঙ লাঙ আগে ব্যাপারের গুরুত্বটা এত তলিয়ে দেখেনি। ওলানের বিমর্ষভাব আর কোকিলার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বরে মাঝে মাঝে তার মনে হয়, কোথাও ছন্দপতন হয়েছে; কিন্তু তার কামনার তীব্র দহন-জ্বালা এ সম্বন্ধে তাকে ভাববার অবসর দেয় না।

কয়েকদিন পর নেশার ঘোর কেটে গেলে ওয়াঙ চোখ মেলে দেখে, সকালবেলা সূর্যোদয়ের মতো সত্য তার বাড়িতে পদ্ম'র অবস্থান; যথানিয়মে আকাশে চন্দ্রোদয়ের মতো সত্য পদ্ম'র সহজলভ্যতা। এই নিশ্চয়তার স্বস্তিতে তার কামনার তীব্রতা কমে আসে, এতদিন কামনার ঠুলি-পরা চোখে যা পড়েনি এবার তা তার চোখে পড়ে।

তার এতটুকু বুঝতে দেরি হয় না যে, ওলান আর কোকিলার বনিবনা হচ্ছে না। এটা তার অদ্ভুত ঠেকে। ওলান পদ্মকে ঘৃণা করবে, এজন্য তার মন প্রস্তুত ছিল; অনেকের কাছে আগে সে এমন কথা শুনেছে। কোনো কোনো মেয়ে নাকি স্বামীর পরদার গমনে বা উপপত্নী গ্রহণে আত্মহত্যা করে; লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় স্বামীর জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। স্বভাব-নির্বাক ওলান তাকে এ নিয়ে কোনো কথা শোনায় না বলে সে মনেপ্রাণে প্রীত হয়। সে ভাবেওনি, ওলান পদ্মকে বাদ দিয়ে কোকিলারই উপর সব ঝাল ঝাড়বে।

পদ্ম'র প্রেমে আত্মহারা ওয়াঙকে পদ্ম যখন মিনতির সুরে বললে :

"এই স্ত্রীলোকটাকেই আমার পরিচারিকা করে দাও। এ সংসারে আমি আত্মীয়-স্বজনহীন। ছোটবেলার মা-বাপ মারা গেলে চাচার হাতে পড়ি, আমার চেহারা সুন্দর দেখে চাচা আমাকে বিক্রি করে দিল এ ব্যবসা করতে। সেই থেকে এ ব্যবসাই করে আসছি। আমার আপন বলতে কেউ নেই।" তখন ওর অনুরোধ ওয়াঙ ঠেলতে পারল না। ওর সুন্দর চোখের টলটলে পানি দেখে ওর অনুরোধ উপেক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া ওয়াঙ ভাবল, এ মেয়েটার দেখাশোনা করার লোকও তো চাই। ওলান তো আর একে দেখাশোনা করতে আসবে না; ওর দিকে ফিরেও তাকাবে না। পদ্ম'র চাচা অবশ্য আছে কিন্তু ওয়াঙ চায় না যে সে-বেটা এসে তার বাড়িতে উঁকিঝুঁকি মারবে, পদ্মকে কানভাঙানি দেবে। সুতরাং কোকিলাকে সঙ্গে নেওয়াই সমীচীন।

মনে হয়, কোকিলাকে দেখেই ওলান তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছে। ওলানের এত রাগ ওয়াঙ কোনোদিন দেখেনি। ওলানের যে এত রাগ আছে তা-ও তার জানা ছিল না। ওয়াঙের পয়সা খাচ্ছে বলে কোকিলা ওলানের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে চায়। যদিও সে এ অহঙ্কার ভুলতে পারে না যে, ওলান যখন জমিদারবাড়ির একজন বাঁদি মাত্র তখন সে নিজে ছিল বুড়ো জমিদারের অঙ্কশায়িনী। তবু ওলানকে প্রথম দেখে সে ডেকে বলেছিল :

"এই যে আমার পুরাতন বান্ধবী। এক বাড়িতেই মিললাম, তবে তুমি এ বাড়ির কর্ত্রী—প্রথম স্ত্রী—আমার মনিব, আর আমি বাঁদি, অদৃষ্টের পরিহাস!"

ওলান তার পানে চেয়ে থাকে। এ স্ত্রীলোকটা কে আর কেনই-বা এখানে এসেছে, একথা বুঝতে পেরে কোকিলার কথায় সাড়া দিয়ে হাতের পানি-ভরা কলসিটা ফেলে রেখে মাঝের ঘরে ছুটে যায়। প্রেমানুষ্ঠানের অবসরে ওয়াঙ তখন সেখানে বসে আছে। ওলান সোজা ভাষায় ওয়াঙকে প্রশ্ন করে :

"এই বাঁদি মাগী এ বাড়িতে কেন?"

ওয়াঙ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। প্রভুত্বব্যঞ্জক কঠোর কণ্ঠে ওলানকে তার বলে দিতে ইচ্ছা করে, "এ বাড়ি আমার। যাকে খুশি আনতে পারি, তুমি বলার কে?" কিন্তু ওলানের সামনে লজ্জায় তার মুখ দিয়ে কথা সরে না। লজ্জায় কথা সরে না বলে সে রেগে যায়। সে আপনমনে বিচার করে দেখে, লজ্জার কোনো কারণ নেই, সে অন্যায় কিছু করেনি, দুটো পয়সা হলে লোকে যা করে, সে-ও তাই করেছে।

এত যুক্তির পরেও সে কিছু বলতে পারে না। অপ্রতিভের মতো এদিক-ওদিক তাকায়। যেন পাইপটা কোথায় হারিয়ে গেছে এই ভাব দেখিয়ে জামাকাপড় হাতড়াতে থাকে। ওলান সেখানে উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। ওয়াঙের জওয়াব না-পেয়ে সে আবার সোজা ভাষায় প্রশ্ন করে :

"এ বাঁদি মাগী এ বাড়িতে কী করছে?"

কোনো জওয়াব না নিয়ে ছাড়বে না দেখে ওয়াঙ ক্ষীণকণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"তাতে তোমার কী?"

ওলান বলে :

"জমিদারবাড়িতে এ মাগীর চোখরাঙানি অনেক সয়েছি। যখন-তখন বাবুর্চিখানায় গিয়ে নানারকম হুকুম জারি করে জ্বালাতন করেছে। এটা ভালো হয়নি, ওটা ভালো হয়নি বলে আমাকে কুৎসিত নির্ধ্মা বলে গালাগালি করেছে।"

কী বলবে ভেবে না-পেয়ে ওয়াঙ নিরুত্তর।

ওলান জওয়াবের প্রতীক্ষায় থাকে। জওয়াব না-পেয়ে তার চোখ তপ্ত অশ্রুতে ভরে যায়। সে অশ্রু বাঁধ মানে না, নীল জামার খুঁট দিয়ে অশ্রু মুছে ফেলে বলে, "নিজের বাড়িতে বাঁদির চোখরাঙানি সহ্য করা মর্মন্তুদ, কিন্তু আমার মায়ের বাড়ি নেই যে চলে যাব।"

ওয়াঙ লাঙ তবু নিরুত্তর; মুখের পাইপটা ধরিয়ে সে টানতে থাকে। ওলান তার পানে বেদনার্ত চোখে চেয়ে থাকে। ওলানের পাণ্ডুরমতো বোবা ব্যঞ্জনাহীন চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে। সে অশ্রু-আচ্ছন্ন চোখে হাতড়ে হাতড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ওয়াঙ তার চলে যাওয়ার পানে চেয়ে থাকে, এবার সে নিঃসঙ্গতায় খুশি হয়। কিন্তু লজ্জা তার কিছুতেই কাটে না। লজ্জা পায় বলে সে আবার রেগে যায়। যেন কারো সাথে ঝগড়া করেছে, এমনি ঝাঁঝালো কণ্ঠে আপনমনে বলে :

"সবাই এমন করে, আমি তো ওর সাথে কোনো দুর্ব্যবহার করিনি। আমার চেয়ে খারাপ লোক অনেক রয়েছে।" অবশেষে সে মনস্থির করে দেখে যে, ওলানকে এ অবস্থা সহ্য করতেই হবে।

কিন্তু ওলান হাল ছেড়ে দেয় না। নীরবে আপনমনে তার কাজ করে যায়। সকালবেলা পানি গরম করে বুড়োকে দেয়, ওয়াঙ নতুন মহলে না থাকলে ওয়াঙকে চা দেয়, কিন্তু কোকিলা তার বিবির জন্য গরম পানি আনতে গিয়ে দেখে, কড়াই শূন্য পড়ে আছে। সে চেঁচিয়ে ওলানকে কত কথা জিজ্ঞেস করে, ওলান সাড়া দেয় না। তখন কোকিলা অনন্যোপায় হয়ে নিজেই পানি গরম করতে যায়। এদিকে সকালবেলায় মণ্ড তৈরির সময়; কড়াইয়েও বেশি পানি ধরে না। ওলান কোনোদিকে খেয়াল না করে নির্বিকার চিত্তে রান্না করতে ঢোকে, কোকিলা বৃথাই চেঁচিয়ে মরে :

"তা হলে সকালবেলা এক ঢোক পানি পর্যন্ত না গিলে আমার বিবি কি ছাতি ফেটে মরবে?"

ওলান তার কথায় কান না দিয়ে আপনমনে উনুনের মুখে একটু করে ঘাসপাতা সাবধানে ঠেলে দেয়। যাতে অপব্যয় না হয়, ঠিক আগের দিনের মতো। তাদের কাছে তখন ঘাসপাতা ছিল অতি মূল্যবান পদার্থ। কোকিলা ওয়াঙের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে নালিশ জানায়। তার নধরকান্তি প্রেয়সীর রূপ-লাবণ্য নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে ওয়াঙ রেগে ওলানকে বকাবকি করতে যায় :

"সকালবেলা কড়াইয়ে আর সামান্য পানি বেশি দিতে পারো না?"

"এ বাড়ির বাঁদিদের বাঁদি তো আমি নই।"

একথায় অসহনীয় ক্রোধে ক্রোধান্বিত ওয়াঙ ওলানের কাঁধ ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বলে :

"বেকুফ কোথাকার। এ পানি বাঁদির জন্য নয়, মনিবের জন্য।"

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সহ্য করে ওলান স্বামীর পানে তাকিয়ে সহজকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে :

"সে মাগীকেই বুঝি আমার মুক্তোদুটো দিয়েছ?"

ওয়াঙের হাত শিথিল হয়ে পড়ে যায়। তার মুখ দিয়ে কথা ফোটে না। তার রাগ পানি হয়ে যায়; লজ্জিত মুখে সে বেরিয়ে গিয়ে কোকিলাকে বলে :

"আলাদা বাবুর্চিখানায় আলাদা উনুন বানাব। পদ্ম'র ফুলের মতো সুন্দর দেহের সৌন্দর্য অটুট রাখতে যা খাওয়ার দরকার, সেসব বড়বউ রাঁধতে জানে না। আলাদা উনুনে তোমার যা-খুশি রাঁধবে, তুমিও খাবে।"

ওয়াঙ মিস্ত্রি লাগিয়ে দেয় আর একটা বাবুর্চিখানা আর উনুন তৈরি করতে। শহর থেকে বেশ ভালো একটা কড়াইও কিনে আনে। "তোমার যা-খুশি এতে রাঁধবে," একথায় কোকিলাও খুশি হয়।

ওয়াঙ লাঙ ভাবে, যাক ঝঞ্ঝাট মিটে গেছে, মেয়েদের কোন্দল আর হবে না। সে পদ্মকে নিয়ে নিরিবিলি থাকতে পারবে। আর মনে হয়, পদ্ম'র প্রতি তার প্রেমে কোনোদিন ক্লান্তি আসবে না। পদ্ম'র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান, অভিমানে সায়াহ্নের পদ্ম-পাপড়ির মতো নুয়ে-পড়া ওর আয়ত আঁখিপল্লব, ওর হাসি-চক্‌চক্ চোখের চাওয়া, তার প্রেমকে নিত্যনতুন করে সজীব করে রাখবে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত এই নতুন রান্নাঘর, তার দেহে কাঁটা হয়ে বিধতে লাগলো। কোকিলা রোজ শহরে যায় আর ইচ্ছামতো দক্ষিণদেশের আমদানি যতসব দামি দামি খাদ্যোপকরণ কিনে নিয়ে আসে, অনেক জিনিসের নামই ওয়াঙ জীবনে শোনেনি। খরচের পরিমাণ দেখে তার বুক কেঁপে উঠে; তার বলতে ইচ্ছা করে, "তোমরা আমার দেহের গোশ্‌ত্ চিবিয়ে খাচ্ছ।" কিন্তু সাহসে কুলোয় না। পাছে কোকিলা রেগে যায়, পদ্ম অসন্তুষ্ট হয়। নিরুপায় হয়ে তাকে ট্যাক থেকে টাকা বের করে দিতে হয়। কিন্তু মনে খোঁচা লাগে, কাউকে বলতেও পারে না; তাই এ কাঁটা মনের মধ্যে রোজ গভীর হয়ে বেঁধে। এতে পদ্ম'র প্রতি তার প্রেমানলের তীব্রতা কমে।

এ কাঁটা থেকে আর-একটা ক্ষুদ্র কাঁটারও সৃষ্টি হয়। তার ভোজন-বিলাসিনী চাচি ঠিক খাওয়ার সময় এই মহলে এসে উপস্থিত হয়। ক্রমে এখানে তার অবাধ বিচরণ শুরু হয়। এর সাথে পদ্ম'র ঘনিষ্ঠতা ওয়াঙের ভালো লাগে না। এরা তিনজন স্ত্রীলোক মিলে একত্র খায়। অবিরাম রসালাপ হাসি-তামাশা আর কানাকানি করে। অজানা কারণে চাচিকে পদ্ম'র ভালো লাগে। এই তিনজন বেশ আনন্দে থাকে। ওয়াঙের মোটেই তা ভালো লাগে না। কিন্তু ওয়াঙ নিরুপায়। একবার ওয়াঙ কত খোশামোদ করে পদ্মকে বলছিল :

"ওগো আমার পদ্মফুল। তুমি তোমার সব সৌরভ ঐ ধুমসি বুড়িটাকে দিয়ে নষ্ট করবে, তা আমার ভালো লাগে না। এ সৌরভ যে আমার প্রয়োজন। বুড়ি বড্ড ধড়িবাজ আর বেঈমান। আমি চাই না যে, সারাদিন সে তোমার এখানে বসে থাকে।"

একথা শুনে পদ্ম মেজাজ দেখায়—অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ওয়াঙের মুখের কাছ থেকে মাথা সরিয়ে নিয়ে বলে :

"তুমি ছাড়া আমার কোনো বন্ধু নেই যে আলাপ করি, অথচ সারাজীবন হৈ-হুল্লোড় হাসি-আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে এসেছি। তোমার বাড়িতে আছে মাত্র তোমার প্রথম বৌ, ও তো ঘেন্নায় আমার সাথে কথাই বলে না। তোমার ছেলেরাও আমার হাড় জ্বালিয়ে খায়, একটা কথা বলতে কাউকে পাই না।"

তারপর সে তার মোক্ষম অস্ত্র ব্যবহার করে। সে রাতে ওয়াঙকে তার ঘরে ঢুকতে দেয় না। অভিমানের সুরে বলে, "তুমি আমাকে মোটেই ভালোবাসো না, ভালোবাসলে আমার সুখের পথে এমনি করে কাঁটা দিতে না।"

ওয়াঙ উদ্বেগ-ভাবনায় নেতিয়ে পড়ে। অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে :

"তোমার যা-খুশি তাই করোগে!"

পদ্ম রাজ-রাজ্যেশ্বরীর মতো ওয়াঙকে ক্ষমা করে। এরপর থেকে সে আর পদ্মকে কড়া কথা বলতে পারে না। পদ্ম তার চাচির সঙ্গে বসে খাচ্ছে বা গল্প করছে—এমন সময় সে পদ্ম'র মহলে উপস্থিত। পদ্ম তাকে তাচ্ছিল্যের স্বরে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে আবার চাচির সাথে আহারে গল্পে মেতে উঠে। ওয়াঙ এই ভেবে রাগ করে যে, চাচি যখন থাকে তখন পদ্ম তার আসাটা মোটেই পছন্দ করে না। এমনি করে তার অজ্ঞাতসারে তার প্রেমের তীব্রতা মিইয়ে আসে।

ওয়াঙের আরো রাগের কারণ, পদ্ম'র জন্য আনা ভালো খাবার খেয়ে-খেয়ে তার চাচির আরো চর্বি বেড়ে যাচ্ছে, অথচ সে অসহায়ের মতো দেখে যাচ্ছে, কিছু বলতে পারছে না; প্রতিবাদ করারও তার অধিকার নেই। সে যেন আপন ঘরে প্রবাসী। তাছাড়া তার চাচিও যেরকম ধূর্ত, ওয়াঙ ঘরে এলেই বিনয়ে-ভদ্রতায় ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তাই সে তাকেও কোনো কথা বলার সুযোগ-সুবিধা পায় না।

এমনি করে যে-প্রেম তার দেহ-মনকে এতদিন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, অন্তরের অবরুদ্ধ ক্রোধের আঘাতে সে-প্রেমের পূর্ণাঙ্গতায় ভাঙন ধরে। সে এই ক্রোধ ব্যক্ত করতে পারে না বলে ক্রোধের তীব্রতা বেড়ে যায়। তাদের দুজনের জীবনের মাঝখানে বয়ে চলছে দুস্তর ব্যবধান। ওলানের সান্নিধ্যে আবার গমন, ওর সাথে অবাধ আলাপের পথও ওয়াঙের রুদ্ধ। উপেক্ষার তীক্ষ্ণ শলাকা তার বুকের প্রেমকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

একটি কাঁটা-তৃণের শিকড় থেকে যেমন একটা কাঁটাবনের সৃষ্টি হয়, তেমনি করে পদ্মকাঁটার শিকড় থেকে কাঁটা গজিয়ে ওয়াঙের জীবনও ক্লিষ্ট করে তোলে।

একদিন ওয়াঙের জরাজীর্ণ বাপ হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে তার সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে ওয়াঙের দেওয়া ড্রাগন-মুখো লাঠিটায় ভর দিয়ে নতুন আর আদি মহলের মাঝখানে পর্দা-দেয়া দরজার সামনে এসে উপস্থিত। বুড়ো এ দরজার খবর জানে না। ছেলে যে, বাড়িতে একজন মেয়েমানুষ এনেছে একথাও বুড়োকে বলেনি; কারণ বুড়োর বধির কানে নতুন কথা বলতে গেলে তা ঢুকবে না।

বুড়ো কৌতূহলে পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ওয়াঙ তখন পদ্মকে নিয়ে আঙিনার চৌবাচ্চার কিনারে দাঁড়িয়ে। পদ্ম সোনালি মাছের খেলা দেখছিল আর ওয়াঙ দেখছিল পদ্ম'র অপরূপ রূপ-সুষমা। বৃদ্ধ তার ছেলেকে এক ছিপছিপে তরুণীর পাশে দাঁড়িয়ে আছে দেখেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে :

"আমার বাড়িতে বেশ্যা!"

পদ্ম'র ক্রোধের ভয়ে বিবর্ণ ওয়াঙ বাপকে হাত ধরে বাইরে নিয়ে শান্ত করতে চেষ্টা করে :

"বাবা শান্ত হও, এ বেশ্যা নয়, দ্বিতীয় স্ত্রী।'

বুড়ো বাপের ক্রোধ আর কমে না। ওয়াঙের কথা হয়তো তার কানেই গেল না। চেঁচাতে থাকে, "বেশ্যা! এ বাড়িতে বেশ্যা!" হঠাৎ ওয়াঙের উপর চোখ পড়তেই বলে ওঠে, "আমি এক বউ নিয়ে ঘর করেছি, আমার বাপও এক বউ নিয়ে ঘর করেছে, চাষাবাদ করেছে, তুমি কি না নিয়ে এলে দ্বিতীয় বউ!" কিছুক্ষণ পর আবার বুড়ো চেঁচিয়ে উঠে "বেশ্যা! আলবৎ বেশ্যা!"

ওয়াঙ ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। পদ্ম আকারে ছোট হলেও একবার রেগে গেলে, চেঁচিয়ে হাত-পা ছুড়ে একটা অনর্থ বাধিয়ে দেবে।

এমনি করে পদ্ম'র বিরুদ্ধে মহাঘৃণা নিয়ে বুড়োর রোজ ঘুম ভেঙে যায়। সে মাঝে মাঝে নতুন মহলের দুয়ারে দাঁড়িয়ে "বেশ্যা! বেশ্যা!" বলে চেঁচিয়ে উঠে, ঘৃণায় থুতু ফেলে বা ঢিল ছুড়ে চৌবাচ্চার মাছগুলোকে ভয় দেখায়। দুষ্টু ছেলের মতো সে এমনি করে মনের ক্রোধ প্রকাশ করে।

এ নিয়েও ওয়াঙের বাড়িতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। বাপকেও সে গালাগালি করতে পারে না, আবার বদমেজাজি পদ্মকেও তার ভয়। তাই বাপকে ঠেকাতে গিয়ে সে বিব্রত, চিন্তিত হয়ে ওঠে, তার বুকভরা প্রেম তার মাথার বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

একদিন হঠাৎ সে ভীষণ চিৎকার শুনতে পায়—পদ্ম'র চিৎকার। গিয়ে দেখে, তার যমজ সন্তানদুটি তার হাবা মেয়েটাকে নিয়ে নতুন মহলে ঢুকেছে। হাবা মেয়েটা ছাড়া বাকি চার সন্তানের মধ্যে ভিতরমহলের অধিবাসিনী সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল জেগে আছে। বড় দুই ছেলে অবশ্য এই অধিবাসিনীর সেখানে অবস্থানের কারণ পরস্পর আলোচনা ছাড়া বাইরে ওর নামও উচ্চারণ করে না। কিন্তু উঁকিঝুঁকি মেরে কানাকানি করে। ভিতরমহল থেকে ভেসে-আসা সুরভির আমেজ পেয়ে ভিতরে কোকিলার বয়ে আনা এঁটো বাসন আঙুল দিয়ে চেটে ছোট্ট যমজ ভাইবোনের কৌতূহল মেটে না।

পদ্ম তার সন্তানদের সম্বন্ধে ওয়াঙের কাছে বহুবার অভিযোগ করেছে। দরজা বন্ধ করে এই উপদ্রব বন্ধ করার কথাও পদ্ম তাকে বলেছে, কিন্তু ওয়াঙ এতে রাজি না হয়ে রসিকতা করে বলেছে :

"তাদের বাবার মতো তারাও এই সুন্দর ফুটফুটে মুখখানা দেখতে চায় আর কী!"

ওয়াঙ তাদের মুখে বারণ করে দেয় মাত্র, কিন্তু তারা তার অনুপস্থিতিতে গোপনে সেই মহলে ঢোকে। হাবা মেয়েটা অবশ্য কিছুই জানে না। সে দেয়ালে হেলান দিয়ে রোদ পোহায় আর আপনমনে তার কাপড়ের ফালি পাকিয়ে পাকিয়ে খেলা করে।

আজ বড় ছেলেদুটোর অনুপস্থিতিতে যমজ ভাইবোনের মাথায় খেয়াল চাপে যে, হাবা মেয়েটা নতুন মহলের মানুষটিকে দেখুক। তারা মেয়েটার হাত ধরে টানতে টানতে ভিতরমহলে নিয়ে যায়। বোবা মেয়েটা এই নতুন মুখখানা দেখে হা করে চেয়ে থাকে। পদ্ম'র সাজ-পোশাক, গয়না-গাঁটি দেখে বোবা মেয়েটা অদ্ভুত আনন্দে মেতে ওঠে ও মহাউল্লাসে তাকে ধরতে যায়। বোবা মেয়েটার কণ্ঠ থেকে হাসির

নামে অর্থহীন বিকৃত শব্দতরঙ্গ বেরিয়ে আসে। পদ্ম ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে। ওয়াঙ ছুটে এসে দেখে, পদ্ম ক্রোধে থরথর করে কাঁপছে, লাফালাফি করছে আর বোবা মেয়েটাকে তর্জনী-সঙ্কেতে শাসাচ্ছে। ওয়াঙকে দেখেই সে চেঁচিয়ে ওঠে :

"ওটা যদি আমার সামনে আসে, আমি আর এ বাড়িতে থাকব না। এ বাড়িতে নোংরা-নচ্ছার ছেলেমেয়ের উপদ্রব সহ্য করতে হবে জানলে আমি এখানে আসতামই না।" এই বলে সে ক্রোধে যমজ ছেলেটাকে ধাক্কা মারে।

এতে সন্তান-বৎসল ওয়াঙের প্রাণে আঘাত লাগে। সে প্রচণ্ড ক্রোধে কঠোর কণ্ঠে বলে :

"আমার সন্তানদের এমন করে কেউ গালি দেবে, তা আমি চাই না। আমার হাবা মেয়েটাকে কেউ যেন শাপ-মন্যি না করে। তোমার মতো আঁটকুড়ে মেয়েমানুষের গালাগাল সহ্য করতে আমি কোনোদিনই প্রস্তুত নই।" এই বলে সে তার সন্তানদের কাছে টেনে বলে, "যা বাছারা এখান থেকে, কোনোদিন এখানে আসিস না, ও তোদের ভালোবাসে না, আর তোদের ভালো না বাসলে, তোদের বাপকেও ভালোবাসে না।" বড়মেয়েটাকে আদর করে বলে, "এসো আমার মানিক, তোমার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে থাকো।" মেয়েটা হেসে ওঠে। সে মেয়েটার হাত ধরে বেরিয়ে যায়।

এই হতভাগী মেয়েটাকে গালি দিয়েছে বলেই তার রাগ বেশি হয়। এই মেয়েটার জন্য তার বুকে আরো গভীর বেদনা জাগে। রাগে সে পদ্ম'র কাছে যায় না; সারাদিন ছেলেমেয়েদের সাথে খেলা করে। হাবা মেয়েটার জন্য লজেন্স কিনে আসে, হাতে লজেন্স পেয়ে মেয়েটার মুখে আনন্দ ফুটে উঠতেই তার দুঃখ দূর হয়।

এরপর ওয়াঙ পদ্ম'র কাছে গেলে, তার না-আসা নিয়ে দুজনের কোনো কথাই হয় না। তাকে খুশি করার জন্য পদ্ম ব্যস্ত হয়ে উঠে। পদ্ম তখন চাচির সাথে বসে চা খাচ্ছিল। ওয়াঙকে দেখেই "সাহেব এসেছে" বলে উঠে দাঁড়ায়। ঘর থেকে চাচি না বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আর বসে না।

চাচি চলে গেলে পদ্ম ওয়াঙের হাত ধরে চোখেমুখে হাত বুলোয়, তাকে আদর করে, ওয়াঙের প্রসন্নতা ফিরে আসে। কিন্তু আগের দিনের মতো প্রেমের পরিপূর্ণতা আর সে ফিরে পায় না।

গ্রীষ্ম শেষ হয়। ভোরের স্বচ্ছ আকাশে সাগরের স্নিগ্ধ-নীলিমার সমারোহ দেখা দেয়; হেমন্তের নির্মল বাতাস মাঠের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। গভীর ঘুম থেকে ওয়াঙও জেগে উঠে। সে বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ক্ষেতের বিস্তৃতির পানে দৃষ্টি মেলে দেয়। বন্যার পানি নেমে গেছে। শুকনো স্নিগ্ধ-বাতাস আর প্রখর সূর্যালোকস্নাত মাটি জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করে আছে।

নারীপ্রেমের চেয়ে গভীর মাটির আহ্বান তার অন্তরে ধ্বনিত হয়ে উঠে। এ আহ্বান তার জীবনের সব আহ্বানকে ছাড়িয়ে তার মনকে মথিত ধ্বনিত করে

তোলে। সে ছিঁড়ে ফেলে দেয় তার বিলাস-বসন, ছুড়ে ফেলে তার মখমলের জুতো; আর সাদা মোজা পায়জামা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে বলিষ্ঠ ব্যগ্রকণ্ঠে ডাক দেয় :

"আমার লাঙল-জোয়াল, নিড়ানি-কোদাল কই? গমের বীজ কই, চিঙ ভাই! ডাকো জনমজুরদের। আমি মাঠে যাচ্ছি।"

বাইশ

আপন মাটির বুকে ফিরে এসে ওয়াঙ যেমন তার দক্ষিণশহরের দুঃখ-দারিদ্র্য, গ্লানিময় জীবনের তিক্ততা ভুলে গিয়েছিল, এবারও তেমনি করে শ্রীময়ী কালো মাটির স্পর্শ তার প্রেম-রুগ্ণ মনকে আবার রোগমুক্ত করে দেয়। সে পায়ের তলায় সিক্ত রসালো মাটির স্পর্শ উপভোগ করে, চষা গমক্ষেতের সোঁদা-গন্ধ বুক ভরে গ্রহণ করে মনের সুস্থতা ফিরে পায়। সে জনমজুরদের হুকুমের পর হুকুম দেয়। সে নিজেই প্রথম লাঙল ধরে, পিছনে পিছনে গমের বীজ ছড়িয়ে দেয়। মাটির বুক চিরে আঁকাবাঁকা গভীর রেখা টেনে লাঙলের ফাল এগিয়ে যায়, তৃপ্তিতে তার মন ভরে ওঠে। একবার সে চিঙকে লাঙল চালাতে দিয়ে মাটির ঢেলা ভাঙে। মাটির ভিজা ঢেলা গুঁড়িয়ে কালো মাটির মতো কোমল করে ফেলে। আজ প্রয়োজনের তাগিদে সে পরিশ্রম করে না, এ পরিশ্রমে মহানন্দের উপভোগ রয়েছে বলে করে। ক্লান্তদেহে সে মাটির বুকে শুয়ে ঘুমোয়। মাটির স্বাস্থ্য তার দেহ-মনে সংক্রামিত হয়ে তাকে নীরোগ স্বাস্থ্যবান করে তোলে।

নির্মেঘ সন্ধ্যাকালে সূর্য ডুবে যায়; অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বিজয়ীর গর্ব বুকে নিয়ে ওয়াঙ ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ধীরে ধীরে বাড়ি ফেরে। দুই মহলের মাঝখানের পর্দাটা একটানে ছিঁড়ে ফেলে। সে ভিতরমহলে প্রবেশ করে, রেশমি পোশাক পরিহিতা পদ্ম তখন অঙ্গনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার ধুলো-কাদা মাখা জামাকাপড় দেখে পদ্ম চিৎকার করে ওঠে। ওয়াঙ কাছে আসতেই ও আঁতকে উঠে সরে দাঁড়ায়।

ওয়াঙ অট্টহাসি হেসে পদ্মর লুলিত হাতখানা নিজের মাটিমাখা হাতে তুলে নিয়ে হেসে বলে :

"দেখছ তো, তোমার মনিব একজন চাষা, আর তুমি চাষার বউ।"

পদ্ম ঝাঁঝালো জওয়াব দেয় :

"তুমি যা হও তা হও, আমার বয়ে গেছে চাষার বউ হতে!"

ওয়াঙ আবার হেসে অতি সহজে পদ্ম'র সামনে থেকে চলে আসে।

গায়ে মাটি নিয়েই সে খাওয়াটা সেরে নেয়। ঘুমোবার আগে নেহাত অনিচ্ছায় গোসল করে। গোসল করতে করতে সে আবার হেসে ওঠে; কারণ এ গোসল সে নারীর মন-জোগাবার জন্য করে না। সে হাসে, কারণ সে আজ বন্ধনহারা, মুক্ত।

ওয়াঙের মনে হয়, সে বহুদিন এখান থেকে অনুপস্থিত; তাই মেলাই কাজ জমে আছে। জমিগুলো যেন চাষ করা, বীজবোনার জন্য উচ্চকণ্ঠে তার কাছে দাবি

জানাচ্ছে। তাই সে দিনমান কাজ করে যায়। গ্রীষ্মব্যাপী প্রেমের ফলে তার দেহ-ত্বকে যে পাণ্ডুরতা দেখা গিয়েছিল, রোদে পুড়ে সে পাণ্ডুরতা দূর হয়ে তার ত্বক গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেছে, তার হাতের পরম গ্রন্থিগুলো লাঙল-কোদালের সংঘর্ষে আবার শক্ত হয়ে উঠেছে।

দুপুররাতে বাড়ি এসে ওলানের তৈরি ভাত, কপি, বিনের তরকারি আর রসুন-মোড়া রুটি পরম তৃপ্তিতে পেট ভরে খায়। নতুন মহলে গেলে পদ্ম যখন রসুনের দুর্গন্ধে নাক টিপে সরে যেতে চায়, তখন সে হেসে একরাশ নিশ্বাস ওর মুখের উপর ছেড়ে দেয়। পদ্ম যেমন করে পারে, এ দুর্গন্ধ সহ্য করুক; তার যা ভালো লাগে, তা সে খাবেই। সে এখন প্রেম-রোগমুক্ত স্বাস্থ্যবান পুরুষ। সে পদ্ম'র কাছে যায়, প্রয়োজন মিটিয়ে অতি সহজভাবে অন্য কাজে চলে যায়।

এমনি করেই দুটি নারীই এ সংসারে আপন আপন আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। পদ্ম তার খেয়াল-খুশির খেলনারূপে; আপন রূপ আর নারীত্বের বৈভবে তার কামনা-বাসনার পরিপূরিকা রূপে। আর ওলান তার কর্ম-সহচরী, সন্তানের জননী, ঘরের গৃহিণীরূপে তার নিজের, তার সন্তানের আর বৃদ্ধ পিতার লালিকা-পালিকা রূপে। তারই অন্দরমহলবাসিনী পদ্ম গাঁয়ের লোকদের ঈর্ষার বস্তু; তাই ওয়াঙের গর্বের ধন। পদ্ম যেন তার অধিকৃত দুর্লভ-মণি বা বহুমূল্য খেলনা। বাহ্যত কোনো ব্যবহারিক মূল্য নেই; এর সার্থকতা অধিকারে। এই বহুমূল্য খেলনা অধিকারীর প্রয়োজনাতিরিক্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাস-বাসনার স্বাক্ষর বহন করে।

ওয়াঙের সমৃদ্ধি-প্রচারে তার চাচাই পঞ্চমুখ। তার চাচা আজকাল পা-চাটা কুকুরের মতো তার পা চাটে। সে বলে :

"আমার ভাইপো স্ফূর্তি ওড়াবার জন্য যে মেয়েমানুষ রেখেছে, এমন মেয়েমানুষ আমাদের মতো চাষাভূষারা কোনোদিন চোখেও দেখিনি! সে মেয়েমানুষ নাকি রেশম আর সাটিনের পোশাক ছাড়া অন্য পোশাক পরেই না। আমি নিজে অবশ্য চোখে দেখিনি, আমার গিন্নির মুখে শুনেছি।" সে বলে যায়, "আমার ভাইপো আমার আপন ভাইয়ের ছেলে, জমিদারি গুছিয়ে বসেছে। তার ছেলেরা হবে জমিদারতনয়, তাদের আর সারাজীবনে খেটে খেতে হবে না। পায়ের উপর পা তুলে জীবন কেটে যাবে।"

ওয়াঙকে গাঁয়ের লোকেরা মান্য করে। তার সাথে সসম্ভ্রমে কথা বলে। তারা তার কাছ থেকে সুদে টাকা নেয়, ছেলেমেয়ের বিয়েতে তার সাথে পরামর্শ করে; জমির সীমানা নিয়ে ঝগড়া হলে ওয়াঙ লাঙকে সালিশি মানে, তার রায়ই সবাই মাথা পেতে নেয়।

এতদিন ওয়াঙ মেয়েমানুষ নিয়েই মজে থাকত, কিন্তু আজকাল তার অনেক কাজ। সময়মতো বৃষ্টি হয়, ভালো গম ফলে; প্রচুর গম গোলায় ওঠে। শীতের মওসুমে সে এ গম বাজারে তোলে। দাম না-চড়া পর্যন্ত সে তার গোলার গম বাজারে ছাড়ে না। এবার সে তার বড়ছেলেকেও সঙ্গে নেয়।

ছেলে যখন গড়গড় করে কাগজের ওপর লেখা পড়ে যায়, কাগজের উপর তুলি আর কালি দিয়ে খসখস করে লিখে যায়, তখন বাপের বুক অহংকারে ফুলে উঠে বৈ কি! সে সবিস্ময়ে তার বড়ছেলের পাণ্ডিত্য দেখে। যেসব কেরানিরা আগে তাকে বিদ্রূপ করত, তারাই যখন বলে, চমৎকার হাতের লেখা ছেলেটার আর ছেলেটা বুদ্ধিমানও বটে; তখন সে গম্ভীর হয়ে এই প্রশংসার বাণী শোনে। এমনি একটা ভাব দেখাতে চায় যে, অমন ছেলে হওয়া অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু ছেলে যখন অন্যের লেখায় ভুল ধরে তখন ওয়াঙের বুক গর্বে যেন ফেটে যায়, গর্বটুকু লুকোবার জন্যে সে মুখ ফিরিয়ে কেশে থুতু ফেলে। ছেলের বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসায় উপস্থিত কেরানিরা মুখর হয়ে উঠলে ওয়াঙ উদাসকণ্ঠে বলে, "তা হলে এ ভুলটা শুদ্ধ করে ফ্যাল্, ভুল কিছুতে সই করিস না যেন।" ছেলে ভুল শুদ্ধ করে আর ওয়াঙ সগর্বে দাঁড়িয়ে তাই দেখে।

বিক্রির দলিল আর রসিদে বাপের হয়ে ছেলের সই করা শেষ হয়ে গেলে, তারা দুজন বাড়ি রওনা হয়। পথ চলতে চলতে বাপ ভাবে : ছেলে এবার সোমত্থ হয়েছে, এবার তাকে বাপের দায়িত্ব সম্পন্ন করতে হবে। একটা ভালো মেয়ে দেখে ছেলের বিয়েটা পাকাপাকি করতে হবে, যাতে ছেলেকে বাপের মতো আবার জমিদারবাড়িতে বউয়ের জন্য ধন্না দিয়ে জমিদারদের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে এনে ঘরে তুলতে না হয়। বাপের অবশ্য উপায় ছিল না, কিন্তু ছেলের বাপের তো এখন জোত-জমা আছে। বাপ তো বিত্তবান।

ওয়াঙ মেয়ের সন্ধানে লেগে যায়। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়, কারণ, যা-তা ঘরের যেমন-তেমন মেয়ে আনলে তার চলে না। একদিন বসন্ত-মওসুমে বোনার জন্য কী কী বীজ লাগবে, তার হিসাব শেষ করে সে মাঝের ঘরে বসে চিঙের কাছে কথাটা পাড়ে। চিঙ যে এ-ব্যাপারে খুব সাহায্য করতে পারবে এ আশায় অবশ্য একথাটা তাকে বলেনি। সে জানে চিঙ লোকটা অতি সাধু আর প্রভুভক্ত, তাই তার মতো লোকের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করে শান্তি পাওয়া যায়।

চিঙ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট ওয়াঙের কথা শোনে। ওয়াঙ সম্পদশালী হয়েছে, তাই ওয়াঙের অনুরোধ সত্ত্বেও চিঙ তার সামনে বসে না। চিঙ ওয়াঙের ছেলের জন্য মেয়ে খোঁজার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কথা শেষ হতে চিঙ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চাপাকণ্ঠে বলে :

"যদি আমার মেয়েটা এখন থাকত, তুমি এক পয়সা ব্যয় না করে আমার মেয়ে আর আমার বুক-ভরা কৃতজ্ঞতা পেতে পারতে। কিন্তু হতভাগিনী মেয়েটা যে কোথায় আছে, জানিও না। জীবিত আছে কি না সে-খবরও নেই।"

ওয়াঙ লাঙ চিঙকে ধন্যবাদ জানায়, কিন্তু মনের কথা খুলে বলে না। তার ছেলের বউ হবে অনেক বড়লোকের মেয়ে, পরের বাড়িতে খেটে-খাওয়া চিঙের মতো লোকের মেয়েকে সে ছেলের বউ করে আনবে না।

ওয়াঙ এ-সম্বন্ধে আর কাউকে কিছু বলে না। সে চা-খানায় গিয়ে কান পেতে থাকে, কোনো মেয়ের সন্ধান পায় কি না। তার চাচিকে সে এ-সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কিছু বলে না। তার নিজের বেলায় তাকে তার চাচির শরণাপন্ন হতে হয়েছিল সত্যি, কিন্তু ছেলের বউ নির্বাচনের ব্যাপারে তার চাচির মতো মেয়েমানুষ কোনো কাজে আসবে না। কারণ তার ছেলের বউ হতে পারে এমন মেয়ের খোঁজখবর তার রাখার কথা নয়, তার চাচি পদ্ম'র মতো মেয়েমানুষের খবরই কেবল রাখে।

হাড়-কাঁপানো শীত আর বরফ-পতনের সঙ্গে আসে নববর্ষোৎসব। খাওয়াদাওয়ার ধুম পড়ে যায়, লোকজন আসে ওয়াঙের সঙ্গে দেখা করতে, তাকে শুভকামনা জানাতে। শুধু গ্রামের লোকই নয়, শহর থেকে বহু লোক আসে। তারা বলে :

"তোমার বউ আছে, ছেলে আছে, অর্থসম্পদ আছে। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর নেই, যা তোমার জন্য কামনা করতে পারি।"

রেশমি পোশাক পরিহিত ওয়াঙের দুইপাশে দামি পোশাক-পরিহিত তার দুই ছেলে। টেবিলে সাজানো রয়েছে পিঠে, তরমুজের দানা, বাদাম, নববর্ষ উপলক্ষে লাল-কাগজের মঙ্গল-পত্রী লাগানো রয়েছে এখানে-ওখানে। ওয়াঙ জানে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

বসন্ত আসে। উইলো গাছে সবুজ কিশলয় দেখা দেয়; পিচ গাছ গোলাপি কুঁড়িতে ভরে যায়; কিন্তু ওয়াঙ লাঙ ভাবী পুত্রবধূর সন্ধান পায় না।

বসন্তের বিলম্বিত প্রখর দিনগুলো কুল আর চেরির সুবাসে সুরভিত হয়ে ওঠে। উইলো গাছের সবুজ-পল্লব সঙ্কোচ কাটিয়ে বিস্তৃতি চায়। গাছে সবুজের সমারোহ, সিক্ত বাষ্পায়িত ধরিত্রী শস্যসম্ভবা। ওয়াঙের বড়ছেলেও অকস্মাৎ নতুন রূপ পরিগ্রহ করে; মেজাজি, অভিমানী আর পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে। ওয়াঙ ভয় পায়। ছেলের এ পরিবর্তনের কারণ বুঝতে না-পেরে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে।

ছেলেকে শোধরানো যায় না। একটু কড়া কথা বললেই ছেলে জেদ ধরে গুম হয়ে বসে থাকে। ওয়াঙ রাগ করে কিছু বলে তো উপায়ই নেই, ছেলে কেঁদেকেটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বিস্ময়াভিভূত ওয়াঙ এর কোনো কারণ খুঁজে পায় না। একদিন ছেলের কাছে গিয়ে যথাসাধ্য মোলায়েম কণ্ঠে ছেলেকে শুধায় :

"আমি তোর বাবা। আমার কাছে কোনো কথা লুকোসনি। বল্ তো তুই কী চাস্?" ছেলে কোনো কথা বলে না, কেবল কাঁদে আর মাথা নাড়ে।

আর এক অসুবিধা। ছেলে তার ওস্তাদকে দেখতে পারে না। সে সকালবেলায় ঘুম থেকেও উঠবে না, পাঠশালায়ও যাবে না। ওয়াঙকে এ নিয়ে চেঁচামেচি করতে হয়, মাঝে মাঝে ছেলেকে শাসনও করতে হয়। মারধোর খেয়ে ছেলে হয়তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, কিন্তু পাঠশালায় যায় না। শহরের অলিগলি ঘুরে বেড়ায়,

ওয়াঙ এ খবরও পায় না। একদিন তার সেজোছেলে অভিযোগ করে যে, তার বড়ভাই সেদিন স্কুলে যায়নি।

রেগে ওয়াঙ লাঙ বড়ছেলেকে খুবই গালাগালি করে :

"তাহলে আমি কি সব পয়সা পানিতে ঢালছি?" বলেই সে ছেলেকে একটা বাঁশ দিয়ে প্রহার করতে আরম্ভ করে। ওলান শুনতে পেয়ে বাবুর্চিখানা থেকে ছুটে এসে ছেলেকে আড়াল করে দাঁড়ায়। মারটা বেশির ভাগ ওলানের উপরই পড়ে। আশ্চর্যের কথা, যে-ছেলে সামান্য বকুনি খেয়ে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেয়, সে নীরবে বাঁশের আঘাতগুলো পিঠ পেতে নেয়। তার মুখ প্রস্তরমূর্তির মতো কঠোর হয়ে ওঠে। দিনরাত ভেবেও ওয়াঙ এসবের কোনো কারণ খুঁজে যায় না।

সন্ধ্যাবেলা স্কুলে যায়নি বলে ওয়াঙ ছেলেকে মারধোর করে। নৈশভোজের শেষে এ-কথাই ভাবছে এমন সময় ওলান নিঃশব্দে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ায়। ওয়াঙ বুঝতে পারে ওলান কিছু বলতে এসেছে, তাই সে প্রশ্ন করে :

"বলো তো খোকার মা, কী বলতে চাও?"

ওলান জওয়াব দেয় :

"এই মারধোরে কোনো ফল হবে না। আমি জমিদারবাড়িতে দেখেছি, জমিদারের ছেলেরা সোমত্থ হলে এমন হত। তখন তারা হয় নিজেরাই বাড়ির বাঁদিদের পটিয়ে নিত, নয়তো বুড়ো জমিদার নিজেই তাদের জন্য বাঁদির ব্যবস্থা করে দিতেন, সব গোলমাল চুকে যেত!"

"না, এখানে ওসব চলবে না।" ওয়াঙ কড়া মেজাজে বলে, "আমারও একদিন এ বয়েস ছিল, কিন্তু এমন খিটখিটে মেজাজ, কান্নাকাটি, গুমরানো তো কোনোদিন আমার হয়নি! বাঁদিরও প্রয়োজন পড়েনি!"

খানিক পরে ওলান বলে, "অবশ্য সে-বাড়ির জমিদার-তনয়দের ছাড়া কোথাও অমনটি দেখিনি! কিন্তু একটা কথা—তুমি খেটে খাও, আর বড়ছেলে জমিদারের ছেলের মতো অলস বসে থাকে।"

এ-কথায় ওয়াঙ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। ভেবে দেখে, ওলান খাঁটি কথাই বলেছে। তার যখন এ বয়েস তখন এমনি করে মুখ-গোমরা করে বসে থাকার সময় ছিল না তার। তাকে সকালবেলা উঠে, হাল-বলদ, কোদাল খুরকি নিয়ে মাঠে যেতে হয়েছে; ফসল কাটার মওসুমে খেটে খেটে পিঠ ব্যথা ধরে গেছে। কাঁদলে কেউ শোনার ছিল না। আর ছেলের মতো তার পাঠশালা-পালানোর সুযোগও ছিল না, কারণ সে জানত যে, ঘরে গিয়ে কিছু খেতে পাবে না। একে একে সব কথা তার মনে পড়ে যায়। সে আপনমনে বলে :

"কিন্তু আমার ছেলে আমার মতো নয়, আমি ওর মতো লাজুক ছিলাম না। ওর বাপ ধনী আর আমার বাপ ছিল গরিব। আমার ছেলের খেটে খেতে হচ্ছে না, কারণ আমার জনমজুর আছে, তা ছাড়া আমার ছেলের মতো বিদ্বান ছেলেকে দিয়ে হাল-চাষ করানো চলেও না!"

মনের গোপনে সে ছেলেকে নিয়ে গর্ব অনুভব করে, ওলানকে বলে :

"ছেলের যদি জমিদারপুত্রের মতো স্বভাব হয়, তবে কী করা যায়; কিন্তু তাই বলে ছেলের জন্য আমি বাঁদি কিনে আনতে পারব না, বরং তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়েরই বন্দোবস্ত করা যাক!"

এই বলে ওয়াঙ ভিতর-মহলে চলে যায়।

তেইশ

পদ্ম লক্ষ করে যে, ওয়াঙ তার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েছে। সে ওর ফুটফুটে মুখের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে অন্য কী নিয়ে ভাবছে। তাই ও ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমানের সুরে বলে :

"যদি জানতাম, এমনি অল্পসময়ের মধ্যেই তুমি আমাকে অবহেলা করতে শুরু করবে, আমার পানে ফিরেও চাইবে না, তবে আমি চা-খানা ছেড়ে আসতামই না।"

আড়চোখে ওয়াঙের পানে তাকিয়ে সে এই কথাগুলো বলে, ওয়াঙ হেসে ওর হাত তুলে নিজের চোখে-মুখে বুলিয়ে হাতের সুবাস গ্রহণ করে।

"জামায় হিরের বোতাম লাগিয়ে মানুষ তো আর সারাদিন তা নিয়ে ভাবে না, সে বোতাম হারিয়ে গেলে অবশ্য দুঃখ হয়।" ওয়াঙ জওয়াব দেয়। বলে, "আজকাল বড়ছেলেকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি। ও যা অস্থির চঞ্চল হয়েছে, বিয়ে না দিলে চলছে না। তবে উপযুক্ত মেয়েরও তো সন্ধান কোথাও পাচ্ছি না। গাঁয়ের কোনো চাষির মেয়ে আমি চাই না, আর তা উচিতও নয়, কারণ এখানকার সবাই একই গোত্রের লোক। অথচ শহরের কাউকে এমন চিনি না যাকে গিয়ে বলতে পারি, 'আমার ছেলে আর তোমার মেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হোক।' পেশাদার ঘটকের কাছে যেতেও আমার ইচ্ছা নেই; পাছে মেয়ের বাপের টাকা খেয়ে পঙ্গু-হাবা মেয়ে জুটিয়ে দেয়।"

তারুণ্য-ললিত দীর্ঘাঙ্গ বড়ছেলের প্রতি পদ্ম'র পক্ষপাত আছে। তাকে ওর ভালো লাগে। তার সম্বন্ধে কথা উঠতেই ওর মনের গতি ফিরে যায়, ভেবে বলে :

"বড় চা-খানায় থাকতে আমার কাছে এক ভদ্রলোক আনাগোনা করত। সে প্রায়ই তার মেয়ের কথা আমাকে শোনাত। আমারই মতো ছোটখাটো আর সুন্দর, তবে বয়সে কচি। সে ভদ্রলোক বলত, 'তোমার আর আমার মেয়ের মধ্যে এমনি চেহারার ঐক্য যে, তোমার কাছে এলেই আমার বুকে অদ্ভুত এক অস্বস্তি জাগে। তোমাকে অন্য চোখে দেখা আমার অন্যায়! অনুশোচনার দহনে আমার মন দগ্ধ হয়।' এ কারণেই আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেও আমার কাছে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে লালমুখো হস্তিনী 'ডালিম ফুল' নাম্নী একটা মেয়ের কাছে যেত।"

"লোকটা কী করে? কেমন?"

"লোকটা অতি চমৎকার আর উদার, বাজে-ভাঁওতা দেয় না। তাকে আমাদের ভালো লাগত; কারণ পয়সা দেওয়ার ব্যাপারে সে কোনোদিন ছেঁচড়ামি করত না। কোনো মেয়ে ক্লান্তির দরুন দীর্ঘক্ষণ তাকে সঙ্গ দিতে না পারলে সে ঠকিয়েছে বলে চেঁচামেচি না করে, দিলদরাজ রাজপুত্র বা বনেদি-লোকের মতো পুরো পাওনাটা দিয়ে বলত, 'এই টাকা রইল, এবার আরাম করে চাঙা হয়ে নাও গিয়ে!'—কী চমৎকার বলার ধরন!" এই বলেই পদ্ম আবার ভাবনায় ডুবে যায়। ওয়াঙ তাড়াতাড়ি ওকে পুরনো দিনের স্মৃতির তল থেকে টেনে আনার জন্য বলে :

"লোকটা বড়লোক, সন্দেহ নেই। তবে তার পেশা কী?"

পদ্ম জওয়াব দেয়,

"জানি না; তবে শুনেছি, সে নাকি একজন আড়ৎদার। কোকিলা সবার খবর কিছু জানে। তাকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখব'খন।"

এই বলেই পদ্ম হাততালি দেয়। কোকিলা বাবুর্চিখানা থেকে হস্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। আগুনের আঁচে তার নাক-মুখ লাল হয়ে আছে। পদ্ম তাকে প্রশ্ন করে :

"সেই যে মোটা ভালোমানুষটা আমার কাছে আসা-যাওয়া করত, পরে আমি দেখতে তার মেয়ের মতো বলে 'ডালিম ফুলের' ঘরে চলে গেল, সেই লোকটা না কে?"

কোকিলা চট করে জওয়াব দেয়, "ও, লিও'র কথা বলছ? সেই যে আড়ৎদার! কত ভালোমানুষ! আমাকে দেখলেই বখশিশ দিত।"

এসব মেয়েলি বাজে কথায় কান না দিয়ে ওয়াঙ উদাসীন কণ্ঠে বলে, "সে থাকে কোথায়?"

"স্টোনব্রিজ রোডে।" কোকিলা বলে।

কোকিলার কথা শেষ হওয়ার আগেই ওয়াঙ আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে :

"আরে! আমার ব্যবসাও তো সেখানেই। সম্বন্ধটাও ভালো, নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধ হতে পারে।" তার মনে আগ্রহ জাগে। তার কাছ থেকে শস্য কেনে এমন লোকের মেয়ের সাথে ছেলে বিয়ে দেওয়া তো ভাগ্যের কথা।

ইঁদুর যেমন চর্বির গন্ধ পায়, কোনো লেনদেনের ব্যাপারে কোকিলাও তেমনি টাকার গন্ধ পায়! তাড়াতাড়ি কাপড়ে হাত মুছে বলে :

"মনিবের কাজের জন্য আমি সদাপ্রস্তুত!"

সন্দিগ্ধ মনে ওয়াঙ পদ্ম'র পানে তাকায়, পদ্ম খুশি হয়ে বলে :

"ভালোই হল, কোকিলাকেও যখন লিও ভালো করেই চেনে তখন কোকিলাই গিয়ে সম্বন্ধটা ঠিকঠাক করুক। ঘটক-বিদায়ের পাওনাটা—সব ভালোয় ভালোয় করে দিতে পারলে, সেই পাবে।"

তার প্রাপ্য ঘটক-বিদায়ের টাকার কথা ভেবে কোকিলা আন্তরিকতার সুরে হেসে বলে, "আমি তা পারব।" কোমরে জড়ানো এপ্রনটা ছেড়ে সে ব্যস্ত হয়ে বলে, "এখ্খুনি চট করে একবার আসিগে, রান্নাবান্নার কাজ শেষ হয়ে গেছে।"

ওয়াঙ ব্যাপারটা এখনো ভালো করে তলিয়ে দেখতে পারেনি, এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়া করাও ভালো নয়, তাই সে কোকিলাকে ডেকে বলে :

"এখনই নয়, আমি এখনও মনস্থির করিনি। দিনকয়েক ভেবে দেখি, পরে তোমাকে বলব!"

পদ্ম ও কোকিলা দুজনই অধৈর্য হয়ে ওঠে। কোকিলা নগদপ্রাপ্তির আশায় আর পদ্ম একঘেয়ে জীবনে অভিনবত্বের আশায়। কিন্তু ওয়াঙ বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলে :

"না, এ আমার ছেলের বিয়ে; আমাকে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে।"

ভাবনা-চিন্তা হয়তো অনেকদিন গড়িয়ে যেত, তার বড়ছেলেই ব্যাপারটা ত্বরান্বিত করে দিল। একদিন সকালবেলা বড়ছেলে মদ খেয়ে চোখ-মুখ লাল করে টলতে টলতে বাড়ি আসে। বাড়ির আঙিনায় পতনের শব্দ শুনে ওয়াং বাইরে এসে দেখে, ছেলে বমি করে মরা কুকুরের মতো বমির উপর পড়ে আছে। কড়া মদ সহ্য করার মতো অভ্যাস তার নেই, বাড়ির তৈরি হাল্‌কা মদ ছাড়া সে অন্য কোনো মদ কোনোদিন মুখে দেয়নি।

ভয়ে ওয়াঙ বউকে ডাকে। দুজনে মিলে ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে নাইয়ে মুছিয়ে ওলানের বিছানায় শুইয়ে দেয়। ছেলে মরার মতো ঘুমিয়ে থাকে; বাপের কোনো কথায় সাড়া দিতে পারে না।

ওয়াঙ এবার ছেলেদের শোবার ঘরে যায়। মেজোছেলে তখন স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওয়াঙ ছেলেকে প্রশ্ন করে :

"গেল রাত তোমার বড়ভাই এ ঘরে শুয়েছিল?"

ছেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জওয়াবে বলে :

"না।"

ভীত-সন্ত্রস্ত ছেলেকে ওয়াং ধমক দিয়ে বলে :

"তবে কোথায় ছিল সে?" ছেলের কাছে জওয়াব না-পেয়ে ওয়াঙ তার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে :

"বল্ কুত্তার বাচ্চা, সে কোথায় ছিল?"

ছেলে ভয় পেয়ে কেঁদে কেঁদে বলে,

"বড়ভাই আমাকে বলতে বারণ করেছে। বললে গরম সুঁচ দিয়ে আমাকে ফুঁড়ে ফেলবে ভয় দেখিয়েছে। না-বললে পয়সা দেবে বলেছে।"

ওয়াঙ লাঙ রেগে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে :

"শিগ্‌গির বলে ফ্যাল্; নইলে মেরে খুন করে ফেলব।"

মেজোছেলেটা চারদিকে তাকায়। না বললে বাপ টুঁটি চেপে মেরে ফেলবে। ভয়ে মরিয়া হয়ে বলে :

"সে আজপর্যন্ত তিন রাত বাইরে কাটিয়েছে। কোথায় গেছে কী করেছে; তা আমি জানি না, সে ও-ঘরের চাচার সঙ্গে যায়।"

ওয়াঙ লাঙ ছেলের টুঁটি ছেড়ে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে দুমদাম করে চাচার ঘরে গিয়ে হাজির হয়। তার চাচার ছেলেও মদ খেয়ে চোখমুখ লাল, তবে তার বড়ছেলের মতো এত কাবু হয়নি। কারণ এসব ব্যাপারে সে অভ্যস্ত। ওয়াঙ গর্জে ওঠে:

"আমার ছেলেকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে?"

তার চাচার ছেলে বিদ্রূপাত্মক মুখ বেঁকিয়ে বলে :

"তাকে নিয়ে যেতে হয় না। সে নিজেই পথ চেনে।"

ওয়াঙের ইচ্ছা হয় এই উদ্ধত বখাটে ছোকরার মুখটা ঘুসি দিয়ে থেঁৎলে দেয়। সে গর্জনে আরো তীব্রতা ঢেলে আবার বলে:

"কাল রাতে আমার ছেলে কোথায় ছিল?"

ওয়াঙের কণ্ঠস্বরে এবার চাচার ছেলে সত্যি ভয় পায়। মাথা নিচু করে বিব্রতকণ্ঠে বলে:

"ওই জমিদারবাড়িতে একটা মেয়েমানুষের ঘরে।"

একথা শুনে ওয়াঙ আর্তনাদ করে ওঠে। সে-মেয়েটাকে চেনে না, এমন লোক নেই। কুলি-কাবারি চাষা-মজুর ছাড়া ভালোমানুষ সেখানে যায় না। কারণ তার বয়েসে ভাটি পড়েছে, তাই সে অল্পমূল্যে বেশি দান করে।

খাওয়াদাওয়া না-করেই ওয়াঙ বেরিয়ে যায়। মাঠের উপর দিয়ে হনহন করে চলে। মাঠের শস্যের পানেও তার খেয়াল নেই, তার ছেলে যে বিপদ ঘটিয়েছে এ বিপদের কাছে তার অন্য সব চিন্তা মুছে যায়। দৃষ্টি আজ তার মনের উপর নিবদ্ধ—মর্মাভিমুখী। সে লুপ্ত-গৌরব জমিদারবাড়ির ফটক পেরিয়ে যায়।

বিরাট ফটকটা আজ খোলা পড়ে রয়েছে। লোহার প্রকাণ্ড কব্জার ওপর মোচড় দিয়ে কেউ এটাকে আর বন্ধ করে না। এ ফটকের ভিতর এখন সর্বসাধারণের অবারিত প্রবেশাধিকার। বাড়িতে এখন অতিসাধারণের বাস। প্রত্যেক ঘরে একটা করে ভাড়াটে পরিবার, বাড়িময় আবর্জনা। পুরনো পাইনগাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে; যেগুলো আছে, সেগুলোও অযত্নে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। আঙিনার ঝর্নাগুলো আবর্জনা পড়ে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

ওয়াঙের চোখে এসব পড়ে না। প্রথম মহলের আঙিনায় দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করে প্রশ্ন করে :

"ইয়েঙ মাগীটা কোন্ ঘরে থাকে?"

একজন মেয়েমানুষ তেপায়া টুলে বসে জুতোর সুখতলা সেলাই করছিল। সে মাথা দুলিয়ে পাশের একটা ঘরের দিকে ইশারা করে আবার কাজে মন দেয়। তার মেজাজ দেখে মনে হয়, রোজ তাকে বহুবার এ প্রশ্নের জওয়াব দিতে হয়।

ওয়াঙ নির্দেশিত দুয়ারের সামনে ধাক্কা দেয়। বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠে ভিতর থেকে ভেসে আসে :

"চলে যাও, আজ আর হবে না, সারারাত জেগে জেগে গতর আর সাড়া দিচ্ছে না। এবার ঘুমোব।"

ওয়াঙ আবার ধাক্কা দেয়, ভিতর থেকে আবার ভেসে আসে, "কে তুমি গা?"

ওয়াঙ সাড়া না দিয়ে ধাক্কাতে থাকে; তাকে যেমন করেই হোক, ভিতরে যেতে হবে। অবশেষে একটা খস্‌খস্‌ শব্দ ভেসে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে একজন মেয়েমানুষ দুয়ার খুলে দেয়। বয়েস যৌবন পেরিয়ে গেছে; মুখে ক্লান্তির ছাপ; ঝুলে-পড়া পুরু ঠোঁট। কপালে সাদা আর গালে লাল রঙের পালিশ এখনও অধৌত। ওয়াঙের পানে তাকিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে :

"এখন আর আমি পারব না বাপু! সন্ধ্যার সময় যত শিগগির পারো এসো। আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।"

মেয়েটার কথার মাঝখানেই ওয়াঙ বলে ওঠে, "আমার জন্যে আমি আসিনি। তোমার মতো মেয়েমানুষে আমার রুচি নেই। আমি এসেছি আমার ছেলের জন্যে।"

মেয়েটার চেহারা দেখে আর এই কুৎসিত মেয়েটার কাছে ছেলেটা আসে ভেবে ঘৃণায় ওয়াঙের গা রি-রি করে ওঠে। হঠাৎ ছেলেটার জন্য দুঃখে কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।

মেয়েমানুষটা প্রশ্ন করে :

"তোমার ছেলের আবার কী হল?"

ওয়াঙ লাঙ আবেগকম্পিত কণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"কাল রাত্রে সে এখানে এসেছিল?"

"কতজনের ছেলেই তো কাল রাত্রে এখানে এসেছিল," মেয়েটা জওয়াব দেয়, "তোমার ছেলে কোন্‌টা তা বুঝব কেমন করে?"

ওয়াঙ তাকে মিনতির সুরে বলে :

"মনে করতে চেষ্টা করো, ছিপছিপে ছেলে, বয়সের আন্দাজে বেশি লম্বা আর বড় কচি। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এ বয়সে সে মেয়েমানুষের পিছু নেবে।"

মেয়েটার মনে পড়ে যায়। সে বলে :

"দুটো লোক এসেছিল। একজন যুবকের নাকের ডগাটা আকাশমুখো হয়ে আছে; সবজান্তা ভাব; টুপিটা এককান ঢেকে বাঁকিয়ে রাখে, আর একজন তুমি যা বলছ, ছিপছিপে গড়নের স্বাস্থ্যবান যুবক, সোমত্থ হবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল।"

ওয়াঙ লাঙ বলে ওঠে, "হ্যাঁ—হ্যাঁ ওটিই আমার ছেলে।"

"তাতে হল কী?" মেয়েটা জিজ্ঞেস করে।

ওয়াঙ সনির্বন্ধ অনুরোধের কণ্ঠে বলে :

"যদি আবার সে তোমার কাছে আসে ওকে তাড়িয়ে দিয়ো। বোলো যে, তুমি কচি বাচ্চাদের আমল দাও না। তোমার যা-খুশি তাই বলে দিয়ো, তুমি যতবার ওকে তাড়াবে, ততবার আমি তোমার প্রাপ্য-টাকার দ্বিগুণ দেব।"

মেয়েটা হঠাৎ সুর নরম করে রসিকতার সুরে বলে :

"বিনা পরিশ্রমে মজুরি পেলে কে না রাজি হয়? আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি, আর সত্যিকথা বলতে কি পুরুষমানুষই আমি চাই। কচি ছেলেদের সঙ্গে আমোদ-স্ফূর্তি জমে না।" সে একথা বলতে বলতে ওয়াঙের পানে মাথা দুলিয়ে কটাক্ষ হানে। তার কুৎসিত চেহারা দেখে ওয়াঙের বমি-বমি ভাব হয়। সে তাড়াতাড়ি বলে :

"তা হলে এই কথাই রইল।"

সে হনহন করে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দেয়। পথ চলতে চলতে মেয়েটার কথা মনে পড়তেই তার সারা গা ঘিনঘিন করে। এ-থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে বারবার থুতু ফেলে।

সেইদিনই কোকিলাকে বলে :

"তুমি যা বলছিলে তাই করোগে, আড়ৎদারের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা পাকাপাকি করে এসো। মেয়ে পছন্দ হলে যৌতুক ভালোই দেব, তবে তাদের দাবিটা যেন আবার খুব বেশি না হয়।"

কোকিলাকে একথা বলে সে ঘরে গিয়ে ঘুমন্ত ছেলের পাশে বসে। কী কচি, ফুটফুটে ছেলে, শান্ত তারুণ্যে সুকুমার। সেই মেয়েটার রঙ-মাখা কুৎসিত মুখের কথা মনে পড়তেই ঘৃণায়-ক্রোধে সে আপনমনে বিড়বিড় করে।

ওলানও তার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলের পানে চেয়ে থাকে। ছেলের সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। সে গরম পানির সাথে সির্কা মিশিয়ে অতি মোলায়েম হাতে ছেলের ঘাম ধুয়ে দেয়। জমিদারবাড়িতে ছেলেরা মদ খেয়ে মাতাল হলে, এমনি করে সির্কা দিয়ে তাদের গা ধুয়ে দেওয়া হত। এই কচি মুখ আর এই গভীর নেশা। এত নাড়ানাড়িতেও এ নেশা ভাঙে না—দেখে ওয়াঙের বুকে জ্বালা করে, সে উঠে চাচার ঘরে যায়। এ লোকটা যে তার পিতৃ-সহোদর, রাগের মাথায় একথা সে ভুলে যায়। তার শুধু মনে পরে এই লোকটা সেই অকালকুষ্মাণ্ড শয়তান ছেলেটার বাপ— যে শয়তান তার কচি নিষ্পাপ ছেলেটার সর্বনাশ করেছে। ঘরে ঢুকেই সে চেঁচাতে থাকে :

"আমি দুধ-কলা দিয়ে কতকগুলো সাপ পুষছি। সাপগুলো এবার আমাকেই ছোবল মেরেছে।"

তার চাচা তখন টেবিলে বসে নাস্তা খাচ্ছিল। দুপুরের আগে সে ঘর থেকে বেরোয় না। কাজ নেই, যাবেই-বা কোথায়। তার চাচা মাথা তুলে অলসকণ্ঠে বলে, "ব্যাপারটা কী?"

ওয়াঙ কোনোরকমে কথাগুলো বলে। বলতে বলতে তার যেন দম আটকে যায়। তার চাচা কথাগুলো শুনে হেসে বলে :

"ছেলেকে কি সারাজীবন ছেলে করেই রাখবে? পুরুষ হতে দেবে না?"

চাচার এই কথা শুনে ওয়াঙের স্মৃতি ভেসে উঠে। এ লোকটার জন্য তাকে কত নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে! এ লোকটা তাকে দিয়ে জমি বিক্রি করার জন্য কত ফন্দিই করেছে। তার বাড়িতে তিন-তিনটে প্রাণী মুফতে খাচ্ছে; তার চাচি পদ্ম'র

জন্য তৈরি ভালো খাবার খেয়ে ফুলছে, আর তার চাচার বদমায়েশ ছেলেটা তার ছেলের সর্বনাশ করছে। সে রাগে ঠোঁট-জিভ কামড়ে বলে :

"আর নয়, এবার তুমি তোমার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, এখন থেকে এ বাড়িতে তোমাদের আহার জুটবে না, তোমাদের আশ্রয় না দিয়ে বরং এ বাড়িতে আমি আগুন লাগিয়ে দেব, বসে বসে খাচ্ছ আর নিমকহারামি করছ?"

তার চাচা নির্বিকার চিত্তে খেয়ে যায়। একটু নড়েও না। রাগে ওয়াঙের রক্ত টগবগ করে উঠে। তার চাচা তার কথায় কান দেয় না দেখে সে হাত তুলে এগিয়ে যায়। তার চাচা তার পানে মুখ ফিরিয়ে বলে,

"সাহস থাকলে তাড়িয়ে দে না দেখি!"

চাচার কথার মর্ম বুঝতে না পেরে ওয়াঙ তোতলিয়ে গর্জন করে ওঠে, 'বেশ, দেখে নাও—পারব না কেন, কী হয়েছে—" কথা শেষ হবার আগেই তার চাচা গায়ের জামাটা ফাঁক করে ভিতরটা দেখিয়ে দেয়।

ভিতরে লুকানো রয়েছে একটা লালরঙের নকল দাড়ি আর একটুকরো লাল কাপড়।

ওয়াঙ প্রস্তরবৎ স্তব্ধ অচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নিমেষে তার রাগ পানি হয়ে যায়।

এই লাল দাড়ি আর লাল কাপড় একদল ডাকাতের চিহ্ন। এই ডাকাতের দল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে থাকে আর লুঠতরাজ করে। এরা কত বাড়িঘর লুঠ করেছে, নারীদের অপহরণ করেছে, ভালো ভালো চাষাদের বাড়ির দরজায় বেঁধে রেখেছে, পরদিন দেখা গেছে বাঁধা অবস্থায় জীবিত থাকলে উন্মাদ হয়ে প্রলাপ বকছে, নয়তো তাদের মৃতদেহ ঝলসে আছে। ওয়াঙের চোখ কোটর হতে ঠিকরে পড়তে চায়। সে আর একটি কথাও না বলে ভয়ে চলে আসে। চলতে চলতে চাচার চাপাহাসি তার কানে আসে।

ওয়াঙ লাঙ এক অভাবনীয় দুর্বিপাকের জালে জড়িয়ে পড়ে। তার চাচা কেশবিরল পাকা দাড়ির ফাঁকে দাঁত বের করে হাসে। আগের মতোই অসম্বৃত ছেঁড়া ময়লা পোশাক পরে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। তাকে দেখলেও ওয়াঙের দেহ ভয়ে হিম হয়ে যায়। ভয়ে চাচাকে কিছু বলতে পারে না। বিনীত ভদ্রভাষায় তার সাথে কথা বলা ছাড়া ওয়াঙের উপায় নেই, কে জানে এই ভয়ানক লোকটা কখন কী করে বসে। এ-কথা সত্য যে, এই কয় বছর ওয়াঙের সমৃদ্ধির দিনে, বিশেষত বহুলোক যখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অনাহারে দিন কাটিয়েছে তখনও ওয়াঙের বাড়িতে ডাকাত পড়েনি। সে শক্ত করে দুয়ারে আগল দিয়ে ভীত-উদ্বিগ্ন হয়ে রাত কাটিয়েছে। পদ্ম'র প্রেমে পড়ার সেই গ্রীষ্মকালের আগে পর্যন্ত সে নিজের সমৃদ্ধি গোপন রাখার জন্য বেশভূষায় অতি সাদাসিধে জীবন যাপন করেছে, কারো মুখে লুঠতরাজের গল্প শুনলে রাতে তার ভালো ঘুম হয়নি, সারারাত কান পেতে কাটিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তার বাড়িতে কোনোদিন ডাকাত পড়েনি বলে, সে অসতর্ক আর সাহসী হয়ে ওঠে। তার ধারণা জন্মে যায়, দেবতাই তাকে সম্পদ দিয়েছেন আর দেবতাই সে সম্পদ রক্ষা করেছেন। ধীরে ধীরে সে দেবতা সম্বন্ধেও উদাসীন হয়ে যায়। দেবতার মন্দিরে ধূপ-ধূনা দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। বিনা-পূজায়ই দেবতা তার প্রতি প্রসন্ন আছেন এই তার ধারণা। এই ধারণার বশীভূত হয়ে সে নিজের বিষয়-চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু আজ সহসা তার কাছে তার নিরাপত্তার কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যতদিন সে তিনটি পোষ্যসহ চাচাকে খাওয়াতে পারে, ততদিন পর্যন্তই সে নিরাপদ। একথা ভাবতেই তার গা বেয়ে শীতল ঘাম ঝরতে থাকে। তার চাচার বুকে লুকানো লাল দাড়ি আর লাল কাপড়ের টুকরোর কথা কাউকে বলতে তার সাহসে কুলোয় না।

তার চাচার বাড়িত্যাগ করার কথা সে আর মুখেও আনে না। তার চাচিকে বরং অনুরোধের সুরে বলে :

'ভিতরমহলে গিয়ে তোমার যা অভিরুচি খেয়ো আর এই টাকাটা ধরো, খরচ কোরো।"

তার চাচার ছেলেকে বলে—যদিও বলতে গিয়ে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে—

"এই নে টাকাটা, জোয়ান ছেলের এটা-ওটা লাগে তো!"

কিন্তু নিজের ছেলেকে ওয়াঙ চোখে-চোখে রাখে। সন্ধ্যার পর তার বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ। ছেলে রাগে হাত-পা ছোড়ে, অকারণে ভাইবোনদের মেরে মনের ঝাল মেটায়। চারদিকে ওয়াঙের ঝঞ্ঝাট লেগেই থাকে।

দুশ্চিন্তায় ওয়াঙের অন্য কোনো কাজে প্রথমটায় মন বসত না। এসব বিপদের কথা ভেবে সে আপনমনেই বলত, "চাচাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বরং শহরে চলে যাই। সেখানে রাত্রিবেলায় ফটক বন্ধ করে রাখলে ডাকাতের দল আর ভিতরে ঢুকতে পারে না।" তারপর তার মনে হয়, দিনের বেলায় তো রোজ তাকে ক্ষেতখামারের কাজে আসতেই হবে। তার এই অসহায় অবস্থায় একটা কিছু ঘটবে কি না, কে জানে। তা ছাড়া শহরের প্রাচীর-ঘেরা বাড়িতে বদ্ধ থেকে মানুষ বাঁচে কেমন করে? তার বেলায় তো এ অসম্ভব। মাটি থেকে সম্পর্কচ্যুত হলে সে বাঁচবেই না। দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব যে-কোনো শহরে হতে পারে, তখন মাটির ফসল না হলে সে কী নিয়ে বাঁচবে? আর শহর-প্রাচীরও ডাকাতের হামলা প্রতিরোধ করতে পারে না। দক্ষিণের শহরের সেই প্রাচীর-ঘেরা জমিদারবাড়িতে তা দেখা গেছে। তবে হ্যাঁ, সে শহরে গিয়ে হাকিমকে বলতে পারে, "আমার চাচা লালদেড়ে ডাকাতদলের লোক!"

কিন্তু কে বিশ্বাস করবে তার কথা? যে ব্যক্তি তার বাপের সহোদর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে পারে তাকে কে বিশ্বাস করবে? মাঝখান থেকে মুরুব্বির প্রতি অবমাননার দায়ে মার খাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। শেষপর্যন্ত তার জীবন হারাবার ভয়ও আছে। কারণ ডাকাতেরা এর খবর জানতে পারলে তাকে খুন করে এর প্রতিশোধ নেবে।

বিপদের উপর বিপদ। কোকিলা এসে খবর দিল যে, আড়ৎদার এ সম্বন্ধ করতে রাজি আছে। তার মেয়ের বয়স খুব কম—মাত্র চৌদ্দ—বলে, এখন বিয়ের দলিল হয়ে থাকবে, বিয়ে হবে তিন বছর পর। এ খবরে ওয়াঙ নিরাশ হয়ে পড়ে। আরও তিনটি বছর ছেলের মেজাজ আর কুঁড়েমি সহ্য করতে হবে। ছেলে তো পড়াশোনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। রাতের বেলায় খেতে বসে ওয়াঙ বউকে বলে :

"সবকটা ছেলের বিয়ে যত শিগগির পারি ঠিক করে ফেলা যাক, কী বলো? যত শিগগির হয় ততই ভালো। বড় হয়ে একটু এদিক-ওদিক করলেই বউ ঘরে নিয়ে আসব। তিন-তিনবার এ বিড়ম্বনা আমি সইতে পারব না।"

রাত্রে ওয়াঙের ভালো ঘুম হয় না। সকালবেলা উঠেই—সংসারে বেশি অশান্তি দেখা দিলে সে যা করে—গায়ের চাপকান আর জুতোজোড়া ছুড়ে ফেলে, নিড়ানি হাতে নিয়ে মাঠের দিকে রওনা হয়। বাইরের আঙিনায় বসে বড় হাবা মেয়েটা আপনমনে হাসে আর কাপড়ের ফালি পাকায় দেখে সে আপনমনে বলে :

"বাকি ছেলেমেয়েগুলো সবাই মিলে যতটুকু শান্তি আমায় দেয়, এই আমার হতভাগী মেয়েটা তার চেয়ে আমাকে বেশি শান্তি দেয়।"

কয়দিন ধরে সে দিনের-পর-দিন মাঠে কাজ করে। লক্ষ্মী মাটি আর রোদের ছোঁওয়ায় মনের ক্ষত আবার নিরাময় হয়ে ওঠে। উষ্ণ বাতাস তার গায়ে শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দেয়, তার মনের ব্যাধির মূলোচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে যেন একদিন দক্ষিণদিক থেকে টুকরো হালকা মেঘ আকাশের এককোণে দেখা দেয়। প্রথমটায় এ-মেঘ দিকচক্রবালে কুয়াশার মতো স্থির হয়ে ঝুলে থাকে। মেঘের মতো বাতাসে নড়ে না। তারপর সহসা সেই মেঘখণ্ড পাখার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামবাসীরা দেখে আর এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে। তাদের মনে আতঙ্ক দেখা দেয়। তাদের ভয় দক্ষিণ থেকে পঙ্গপাল আসছে তাদের ফসলের সর্বনাশ করতে। ওয়াঙও বাইরে এসে এই মেঘের পানে চেয়ে থাকে। সহসা বাতাসের ঝটকায় কী যেন একটা তাদের পায়ের কাছে এসে পড়ে; একজন চট করে মাটি থেকে এটা কুড়িয়ে নেয়। একটা মরা পঙ্গপাল, তাদের দিকে উড়ে-আসা অসংখ্য জীবন্ত পঙ্গপালেরই একটা।

ওয়াঙ তার সব অশান্তি ভুলে যায়। তার দুশ্চিন্তা—ওলান, পদ্ম, সন্তান, চাচা—মন থেকে একদম মুছে যায়। সে আতঙ্কিত গ্রামবাসীদের কাছে ছুটে গিয়ে তাদের বলে :

"এই আসমানী শত্রুদের সাথে লড়াই করে আমাদের জমির ফসল বাঁচাতে হবে।"

কয়েকজন প্রথম থেকেই নিরাশ হয়ে পড়েছে। তারা মাথা নেড়ে বলে :

"না, না, কোনোকিছুতেই ফল হবে না, আমরা অনাহারে মরব, এই উপরওয়ালার ইচ্ছা। তার বিরুদ্ধে লড়াই করে, মিছেমিছি নিজেদের ক্ষয় করব কেন?"

মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদতে কাঁদতে শহরে গিয়ে ক্ষেত্রদেবতার মন্দিরে জ্বালাবার জন্য কাঠি কিনে আনে, আর কেউ শহরে গিয়ে স্বর্গের আর মাটির দেবতার মন্দিরে পুজো দেয়। একই সাথে স্বর্গের আর মাটির দেবতার পুজো চলে, তবুও দেবতা তুষ্ট হয় না। পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়ে আকাশে, মাঠের বুকে।

ওয়াঙ তার জনমজুরদের ডাকে। চিঙ হুকুমের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। তাদের ছাড়া ওয়াঙের ডাকে আসে বহু জোয়ান চাষি। তারা নিজহাতে আগুন লাগিয়ে দেয় তাদের কোনো-কোনো জমিতে। আধপাকা গমক্ষেত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তারা খাল কেটে কুয়ো থেকে পানি তুলে মাঠ ভাসিয়ে দেয়। আহার-নিদ্রা ভুলে দিনরাত মাঠে লেগে থাকে, ওলান তার স্বামী আর তার লোকজনদের জন্য মাঠে খাবার নিয়ে আসে। অন্যান্য মেয়েরাও তাদের কিষাণ স্বামীদের জন্যে মাঠে খাবার পৌঁছে দেয়। ক্ষুধিত পশুর মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা খাবার খেয়ে আবার কাজে লাগে।

তারপর আকাশ কালো হয়ে ওঠে। অসংখ্য পঙ্গপালের পাখার চাপা গর্জনে চারদিকে ভরে ওঠে। পঙ্গপালের দল নিচে নামে। কোনো ক্ষেতের হয়তো উপর দিয়ে চলে যায়; সে ক্ষেতের ফসল অটুট থাকে, কোনো ক্ষেতের বুকে নেমে সে ক্ষেত নিঃশেষ করে ধূসর-শূন্য করে দেয়। গ্রামবাসীরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, "এই-ই হয়তো উপরওয়ালার ইচ্ছা।" কিন্তু ওয়াঙ লাঙ খেপে যায়, হিংস্র হয়ে উঠে। সে পঙ্গপালের উপর আঘাত করে, পতিত-পঙ্গপালকে মাড়িয়ে দেয়। তার লোকেরা শস্য-ঝাড়ার কুলো দিয়ে উড়ন্ত পঙ্গপালে আঘাত করে, দলেদলে পঙ্গপালের কতক মাটিতে পড়ে যায়, আর কতক আগুনে পুড়ে মরে। লক্ষলক্ষ পঙ্গপাল মরে, কিন্তু জীবিত অবশিষ্টের তুলনায় মৃতের সংখ্যা নগণ্য।

ওয়াঙের প্রাণপণ সংগ্রাম নিষ্ফল হয় না, তার ভালো ভালো জমিগুলো রক্ষা পায়। পঙ্গপালের মেঘ আকাশের বুক থেকে সরে যায়, কৃষাণ-মজুরেরা হাঁফ ছাড়ার অবসর পায়। ঘরে তোলার মতো গম ওয়াঙের হয়েছে, তার ধান-চারার ক্ষেত বেঁচে গেছে, এতেই ওয়াঙ তৃপ্ত। অনেকে ঝলসানো পঙ্গপাল খায়, কিন্তু ওয়াঙ খায় না। এই বীভৎস প্রাণীগুলো ওর সোনার ফসল নষ্ট করেছে, তাই এগুলো খেতে ওর রুচি হয় না। ওলান এগুলো তেলে ভাজে; ওয়াঙ আপত্তি করে না। জনমজুরেরা এগুলো কুড়মুড় করে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। এগুলোর বীভৎস চোখ দেখে ছেলেরা ভয় পায়, তবু তারাও খায়, ওয়াঙ একলাই কেবল খায় না।

পঙ্গপাল কিন্তু তার একটা উপকার করেছে। এক সপ্তাহ অবধি ওয়াঙ তার ক্ষেতের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা করার অবসর পায়নি। তার সব দুঃখ, সব অশান্তি মন থেকে ধুয়েমুছে যায়, সে শান্তকণ্ঠে মনকে বলে :

"দুঃখ-কষ্ট সবার জীবনেই আসে; আমার জীবনেও আসবে। চাচা বুড়োমানুষ, কয়দিনই আর বাঁচবে, ছেলের জীবনও তিনটে বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে, এসব ভেবে আমি আত্মহত্যা করব না।"

আবার বৃষ্টিপ্লাবিত ক্ষেতে ধানের চারা লাগানো হয়, আবার গ্রীষ্মকাল ঘুরে আসে।

চব্বিশ

একদিন দুপুরবেলা ওয়াঙ লাঙ মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে আপনমনে ভাবছে যে, শেষপর্যন্ত তবু বাড়িতে শান্তি বিরাজ করছে; ঠিক এই সময়ে তার বড়ছেলে সামনে এসে বলে :

"বাবা, ভালো করে লেখাপড়া শিখতে হলে বাইরে যেতে হবে, এখানকার ওস্তাদের বিদ্যেয় আর কুলোচ্ছে না।"

বাবুর্চিখানার কড়াই থেকে একমগ গরম পানি এনে ওয়াঙ তার তোয়ালেটা ডুবিয়ে সবেমাত্র নিঙড়াচ্ছে, তোয়ালেটা মুখের সামনে ধরে সে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে :

"কী বলছিস?"

ছেলে একটু ইতস্তত করে বলে যায় :

"ভালো করে লেখাপড়া শিখতে হলে আমি দক্ষিণের শহরে গিয়ে কোনো বড় স্কুলে পড়তে চাই, সেখানে যা-ই শিখতে চাই, শিখতে পাব।"

ওয়াঙ ভিজে তোয়াল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে নেয়। মাঠের ক্লান্তিতে মন-মেজাজ তার এমনি খারাপ হয়ে আছে, সে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ছেলেকে বলে :

"কী বাজে বকছিস? শুনে রাখ্, তোর বাইরে যাওয়া হবে না, আমাকে এ নিয়ে আর বিরক্ত করিস না। যে লেখাপড়া শিখেছিস, এ অঞ্চলে তাতেই কাজ চলে যাবে।"

ওয়াঙ আবার তোয়ালেটা ভিজিয়ে নিঙড়ে নেয়।

ছেলেটা সেখানে অনড় দাঁড়িয়ে বাপের পানে ঘৃণাব্যঞ্জক চোখে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী বলে। ওয়াঙ শুনতে না পেয়ে রাগে গর্জে ওঠে :

"যা বলতে চাস পরিষ্কার করে বল্।"

বাপের মেজাজে ছেলেও জ্বলে উঠে জবাব দেয় :

"আমি যাবই যাব, এ বাড়িতে আমি শিশুর মতো নজরবন্দি হয়ে থাকব না। এ যা শহর, এখানে পড়ে কী হবে? আমি বাইরে গিয়ে লেখাপড়া শিখব; দু-দশটা জায়গা ঘুরে দেখব।"

ওয়াঙ লাঙ একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে নিজের দিকে তাকায়। ছেলের পরিধানে রুপালি ধূসর রঙের চাপকান, গ্রীষ্মোপযোগী মিহি আর ঠাণ্ডা কাপড়ে তৈরি, ঊর্ধ্বোষ্ঠে নবযৌবনের স্বাক্ষর কালো-গোঁফ-রেখা; তার মসৃণ দেহও সোনালি আস্তিনে ঢাকা, মণিবন্ধে নারীসুলভ কমনীয়তা। ওয়াঙ নিজের দেহের পানে তাকায়। তার দেহ অমসৃণ, মজবুত আর মাটি-মাখা। তার পরিধানে সূতির মোটা নীল কাপড়ের পায়জামা, কোমর থেকে উপরটা অনাবৃত। কেউ দেখলে বলবে, সে তার ছেলের বাপ নয়, ভৃত্য। এই কথা ভেবে ছেলের সুকুমার সুঠাম

দেহের প্রতি তার মনের যুগপৎ ঘৃণা ও ক্রোধের উদয় হয়। সে গর্জন করে ওঠে :

"একবার মাঠে গিয়ে গায়ে ধুলোমাটি মেখে নে, নইলে লোকে তোকে মেয়েমানুষ ঠাওরাবে, খেটে খেতে তো হচ্ছে না। এবার মাঠে কাজ করে নিজের ভাত জোগাড় কর্।"

ছেলের পাণ্ডিত্য আর বুদ্ধিমত্তার যে কোনোদিন গর্ব অনুভব করেছে, সেকথা ওয়াঙ ভুলে যায়। সে হাত-পা ছুঁড়ে মেঝেতে অবজ্ঞায় থুতু ফেলে দুমদাম করে বেরিয়ে আসে। আজ ছেলের তরুণ সৌকুমার্য ওয়াঙের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে। ছেলে দাঁড়িয়ে ঘৃণাব্যঞ্জক চোখে বাপের পানে নিষ্পলক চোখে চেয়ে থাকে। কিন্তু বাপ পিছন ফিরে তাকায় না।

সে-রাত্রে ওয়াঙ ভিতরমহলে পদ্ম'র পাশে গিয়ে বসে। কোকিলা তখন পদ্মকে পাখার বাতাস করছে। পদ্ম কথায় কথায় বলে, যেন এটা অতি নগণ্য একটা ব্যাপার—

"তোমার বড়ছেলে বাইরে যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে।"

ছেলের প্রতি তার ক্রোধের কথা মনে করে ওয়াঙ রুক্ষকণ্ঠে বলে :

"তাতে তোমার কী? আর তার এ বয়সে আমি তাকে এ ঘরে আসতেই দেব না।"

পদ্ম তাড়াতাড়ি জওয়াব দেয়, "না, না, এতে আমার কী? কোকিলাই একথা বলেছিল কিনা, তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম।"

কোকিলাও আবার ফোড়ন কাটে, "এতে বলার কী আছে, সবাই তো চোখে দেখতে পাচ্ছে। সুন্দর ছেলে, উঠতি বয়েস। এ কি তার অলস হয়ে বসে থাকবার সময়?"

ওয়াঙ লাঙ দমে যায়। ছেলের প্রতি তার ক্রোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সে বলে ওঠে, "না, যাওয়া তার হবে না, আমি বাজেপয়সা খরচ করতে রাজি নই।" ওয়াঙ এ সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করে দেয়। তার বদমেজাজ লক্ষ করে পদ্মও কোকিলাকে ঘর থেকে সরিয়ে দেয়।

অনেক দিন অবধি এ নিয়ে আর কথা ওঠে না। ছেলেও মনে হয়, হঠাৎ বেশ খুশি হয়ে উঠেছে, কিন্তু স্কুলে সে যায় না। ওয়াঙ তাতে আপত্তি করে না। সোমত্থ ছেলে। প্রায় আঠারো বছর বয়েস; দেহের কাঠামো মায়ের মতো শক্ত-বলিষ্ঠ। ঘরে বসেই পড়াশোনা করে। অন্তত বাপকে তাই দেখায়। বাপও খুশি হয়ে ভাবে :

"এ হল বয়সের পাগলামো। কী চায় নিজেই জানে না। মাত্র তিন বছরের কথা, কিছু টাকা ব্যয় করলে তিন বছরকে দুবছর এমনকি এক বছরেও নামিয়ে আনা যায়। অবশ্য বেশি টাকা ঢালতে হবে। এ মওসুমটা শেষ হলে দেখা যাবে।"

ওয়াঙ লাঙ ছেলের কথা ভুলে যায়। পঙ্গপালে নষ্ট-করা সত্ত্বেও ফসল মোটামুটি ভালোই হয়েছে। পদ্ম'র পিছনে সে যে-টাকা নষ্ট করেছে, সে-টাকা উঠে গেছে। একটা মেয়েমানুষের পিছনে এত টাকা ব্যয় করেছে ভেবে অনেক সময় তার আশ্চর্য লাগে।

এখনও মাঝে মাঝে পদ্ম তার মনে দোলা দেয়; অবশ্য এ দোলায় আগের তীব্রতা নেই। তবে অধিকারের গর্বে তার বুক ভরা। তার চাচি বলেছিল, তাই ঠিক—গড়নে ছোট হলেও পদ্ম'র বয়েস নেহাত কম নয়। সন্তানবতী হয়নি বলেই দেহের কমনীয়তাও নষ্ট হয়নি। ওর সন্তানবতী হওয়ার ব্যাপারে ওয়াঙ ভাবে না। তার ছেলে-মেয়ে আছে, সুতরাং পদ্ম তার আনন্দদায়িনী হয়েই থাকুক।

বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে পদ্ম আরও লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে। আগে তার দৈহিক-সৌন্দর্যের একমাত্র খুঁত ছিল পাখিসুলভ কৃশতা। তাতে তার মুখাবয়বের রেখাগুলোর তীক্ষ্ণতা বেরিয়ে পড়ত, চেহারা ভাঙা-ভাঙা মনে হত, কিন্তু এখন ভালো খেয়ে, বহু পুরুষের স্থলে এক পুরুষের মনোরঞ্জনের সামগ্রী হয়ে আর অলস-বিলাসী জীবন যাপন করে ওর চেহারা বেশ সুস্পষ্ট সুডৌল হয়ে উঠেছে; দেহও ভরাট হয়েছে। আয়ত চোখ আর অতটুকু মুখ! ওকে ঠিক নাদুসনুদুস বিড়ালের মতো দেখাচ্ছে। নিয়মিত খেয়ে-ঘুমিয়ে ওর গায়েও মাংস লেগেছে। এখন সে আর পদ্মকলি না হলেও ঝরা-পদ্ম নয়; পূর্ণ বিকশিত পদ্মফুল। সে এখন তরুণী নয়, কিছু বৃদ্ধাও নয়। তার বর্তমান বয়ঃসন্ধিক্ষণ যৌবন আর বার্ধক্য থেকে সমদূরে অবস্থান করছে।

ছেলে বেশ শান্ত হয়ে উঠেছে। সংসারে আর কোনো ঝামেলা নেই, ওয়াঙের জীবন এখন শান্তিময়। সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত ওয়াঙ একলা বসে আঙুলের কড় গুনে হিসাব করছে, কত শস্য বেচতে পারবে, কত টাকা আসবে ইত্যাদি, এমন সময় ওলান ধীরপদে তার ঘরে এসে উপস্থিত। এ ক'বছরে ওলান বড় রোগা হয়ে গেছে। তার চোয়ালের উঁচু হারও উঁচু হয়ে গেছে; চোখদুটো আরও কোটরে বসে গেছে। কেউ কারণ জিজ্ঞেস করলে শুধু বলে, "আমার ভিতরটা সর্বক্ষণ জ্বলে।"

এই তিন বছর অবধি তার পেটটা ফুলে আছে, মনে হয় অন্তঃসত্ত্বা; কোনো সন্তান হচ্ছে না, এই যা। ওয়াঙ লাঙও তার প্রতি খেয়াল করে না। সে বাড়ির টেবিল-চেয়ারের দিকে যেমন নির্লিপ্ত-চোখে চায়, ওলানের পানেও তেমনি চোখে চায়। রুগ্ণ বলদ কিম্বা শুয়োরের পানে সে যত মনোযোগ দিয়ে তাকায়, ওলানের প্রতি ততটুকু মনোযোগ দিয়ে তাকায় না। অথচ ওলান সকালবেলা উঠে নিজের কাজ একলা করে যায়, কারো সাথে কথা বলে না। চাচির সাথে যতটুকু না বললে নয় ততটুকু বলে। কোকিলার সাথে তার বাক্যালাপ নেই, আর পদ্ম'র ত্রিসীমানা সে মাড়ায় না। পদ্ম কোনোদিন তার মহল পেরিয়ে বাইরে পায়চারি করলে ওলান নিজের ঘরে এসে চুপ করে বসে থাকে। পদ্ম চলে না-গেলে সে ঘর থেকে বেরোয় না। ওয়াঙ একদিন ভুলেও ওলানকে বলে না—

"পয়সার যখন অভাব নেই, একটা ঝি-চাকর রাখছ না কেন?"

ওলানের যে একজন ঝিয়ের প্রয়োজন হতে পারে, এতটুকু পর্যন্ত তার মনে জাগে না; অথচ সে জনমজুর দিয়ে ক্ষেতের কাজ করায়, বলদ-শুয়োর পালে, বর্ষাকালে হাঁস পালার জন্য পর্যন্ত লোক রাখে।

ওলান এদিক-ওদিক তাকিয়ে ইতস্তত করে বলে :

"একটা কথা বলব?"

বিস্মিত ওয়াঙ পলকহীন চোখে ওলানের গায়ের ছায়াচ্ছন্ন গর্তগুলোর পানে তাকায়। তার আবার মনে পড়ে, ওলান কুৎসিত; দীর্ঘদিন সে ওলানের সঙ্গ কামনা করেনি। ওলানের কথায় সে জওয়াব দেয়,

"বেশ, বলে ফ্যালো।"

ওলান চাপা কর্কশকণ্ঠে বলে,

"তুমি যখন থাকো না, বড়ছেলে প্রায়ই ভিতরমহলে যায়।"

ওয়াঙ প্রথমটা বুঝতেই পারে না, ফিসফিস করে ওলান তাকে কী বলছে। সে মাথাটা আরও এগিয়ে দিয়ে হা করে বলে:

"কী বলছ?"

ওলান নীরবে ছেলের ঘরের দিকে ইশারা করে। তারপর শুকনো ঠোঁট কুঞ্চিত করে ভিতরমহলের দরজাটা দেখায়। ওয়াঙ সোজা হয়ে বসে ওলানের পানে অবিশ্বাসের চোখে তাকায়।

"স্বপ্ন দেখছ নাকি?" ওয়াঙ প্রশ্ন করে।

ওলান মাথা নাড়ে। তার কঠিন কথাগুলো ওষ্ঠে হোঁচট খেয়ে খেয়ে বেরিয়ে আসে :

"একদিন অসময়ে বাড়ি এসে দেখলেই বুঝতে পারবে।" একমুহূর্ত নীরব থেকে আবার বলে, "ছেলেটাকে দক্ষিণে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো।" এই বলে ওলান টেবিলে গিয়ে স্বামীর চায়ের বাটিতে হাত দেয়। চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে এ চা মেঝেতে ফেলে দিয়ে নতুন করে বাটিতে গরম চা ঢেলে দেয়। তারপর যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

এটা মেয়েলি হিংসা, ওয়াঙ ভাবে। এ নিয়ে সে আর মাথা ঘামাবে না, ছেলে তো বেশ সুস্থ-শান্ত আছে, রীতিমতো পড়াশোনাও করছে। এই ভেবে সে হেসে ওলানের কথাটা মন থেকে উড়িয়ে দেয়, মেয়েদের মনের সংকীর্ণতার কথা চিন্তা করে।

কিন্তু তার মনে পড়ে যায়, গেল রাত্রে পদ্ম'র পাশে শুতে গেলে পদ্ম তাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বিরক্তি আর অভিযোগের সুরে বলেছিল :

"একে তো গরম তার উপর তোমার গায়ের যা দুর্গন্ধ! আমার পাশে শুতে এলে নেয়ে আসবে বলছি।"

বলতে বলতে পদ্ম মুখ থেকে চুল সরিয়ে বিরক্তির সুরে বলে। ওকে কাছে টানতে চেষ্টা করতে ও ঝটকা দিয়ে সরে পড়ে। বহু আদর-সোহাগেও ওর মন গলে না। তার মনে পড়ে, অধুনা অনেক রাতেই পদ্ম অনিচ্ছায় তার ইচ্ছায় সায় দিয়েছে। সে এই অনিচ্ছা-প্রকাশকে ওর খেয়াল বলে ধরে নিয়েছে, ভেবেছে গ্রীষ্মের গরমেও এমনি নির্জীব খিটখিটে হয়ে আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে ওলানের

কথাগুলো কেমন যেন সত্যের প্রাখর্য নিয়ে তার মনে দেখা দেয়। গেল রাতে সে পদ্ম'র শয্যা ত্যাগ করে রূঢ়কণ্ঠে বলেছিল :

"বেশ, তা হলে একলাই ঘুমোও, গলা কেটে ফেললেও এখানে আর আসছি না।"

সে ঘর থেকে ছুটে বেড়িয়ে মাঝের ঘরে দুটো চেয়ার একত্র করে শুয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুমোতে পারে না, ঘর ছেড়ে এবার সে বাড়ির বাইরে বাঁশঝাড়ের নিচে এসে পায়চারি করে। রাতের স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শে তার তপ্ত দেহ জুড়িয়ে দেয়।

তার মনে পড়ে, পদ্ম নাঙ এন-এর বাইরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কথা জানে। কেমন করে জানল? তার এ-ও মনে পড়ে, অধুনা ছেলে আর বাইরে যাওয়ার নামটি পর্যন্ত করে না। বেশ আনন্দে আছে মনে হয়। কেন? ওয়াঙ কঠোর হয়ে ভাবে :

"আমি সব দেখে নেব।"

দিগন্তের কুহেলিকা ভেদ করে ঊষার রক্তিম-উদয় তার চোখে পড়ে।

ঊষার অভ্যুদয়ে সূর্যের সোনালি রেখা তার মাঠের উপর দিয়ে দিকচক্রবালে দেখা দেয়। সে ঘরে ফিরে প্রাতরাশ সেরে রোজকার মতো তার জনমজুরদের কাজকর্ম তদারক করতে বেরিয়ে যায়। যাবার বেলায় উচ্চস্বরে সবাইকে শুনিয়ে বলে, "আমি শহর-প্রাচীরের ধারের জমিটায় যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।"

আধা রাস্তায় ক্ষেত্রদেবতার মন্দির গিয়ে সে একটা ঘাসের ঢিবিতে বসে পড়ে, একটা পুরনো কবর এটা। একটা ঘাস ছিঁড়ে আঙুলে পাকাতে পাকাতে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে। দেবদেবীর যুগলমূর্তি তার পানে চেয়ে আছে, আগের দিনে এদের সে কত ভয় করত। কিন্তু এখন সমৃদ্ধিশালী হয়ে সে এদের কথা ভুলে গেছে। এদের দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন নেই বলে। তার মনের গোপনে আত্মজিজ্ঞাসা চলছে :

"বাড়ি ফিরে যাব কি?"

সহসা তার মনে পড়ে, গেল রাতের আগের রাতে পদ্ম তাকে ওর পাশ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। এই পদ্ম'র জন্য যা-কিছু করেছে, ভেবে তার মনে আগুন জ্বলে ওঠে। আপনমনে বলে :

"আমি জানি, সেই চা-খানায় ওকে বেশিদিন আর টিকতে হত না। আমার বাড়িতে ভালো খেয়ে ভালো পরে কী আরামেই ওর দিন কাটছে!"

ক্রোধের বশে সে হনহন করে অন্যপথে গোপনে বাড়ি ঢুকে ভিতরমহলের পর্দার পাশে কান পেতে দাঁড়ায়। পুরুষকণ্ঠের মৃদুগুঞ্জন তার কানে ভেসে আসে হ্যাঁ। এ তার ছেলেরই কণ্ঠস্বর।

এক অননুভূত ক্রোধাগ্নি তার মনে জ্বলে ওঠে, অবশ্য সমৃদ্ধির সাথে সাথে তার মনের ভীরুতাও কমে গেছে, সে বদমেজাজিও হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ ক্রোধ প্রেমিকা-হরণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকের বিরুদ্ধে অবমানিত প্রেমিকের ক্রোধ, প্রতিদ্বন্দ্বী তারই আত্মজ, এই কথা মনে হতেই ন্যক্কারে তার মন ভরে ওঠে।

দাঁতে দাঁত চেপে বাইরে গিয়ে সে বাঁশঝাড় থেকে একটা কঞ্চি নিয়ে আসে। কঞ্চির ডালপালা কেটে শুধু মাথার সরু ডালপালার গুচ্ছটি রেখে দেয়, রশির মতো

পাতলা-মজবুত। সে এবার মৃদু নিঃশব্দ পদক্ষেপে দরজার সামনে গিয়ে সহসা পর্দা সরিয়ে ভিতরে গিয়ে দাঁড়ায়। তার ছেলে আঙিনায় দাঁড়িয়ে নিমেষহারা চোখে পদ্ম'র পানে চেয়ে আছে, চৌবাচ্চার পাশে বসে। ওর পরিধানে পিচরঙা রেশমি জামা, সকালবেলা এ জামা পরতে ওকে কোনোদিন দেখেনি ওয়াঙ।

প্রেম-গুঞ্জনে তন্ময় প্রেমিক-প্রেমিকা। পদ্ম নাঙ এন-এর পানে অপাঙ্গ দৃষ্টি হেনে কী যেন হেসে হেসে বলছে আর নাঙ এন ওর কথাগুলো সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করছে। ওয়াঙ তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকে দেখতে পায়নি। তন্ময়তার দরুন তার আসার শব্দও তাদের কানে পৌঁছায়নি। ওয়াঙ কঠোর দৃষ্টি মেলে তাদের পানে তাকিয়ে থাকে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, ঠোঁটদুটো ফাঁক হয়ে ক্রূর হাসি বেরিয়ে পড়ে। সে হাতের কঞ্চিটা চেপে ধরে। তবু তারা ওয়াঙকে দেখতে পায় না। কোকিলা সেখানে ঢুকে ওয়াঙকে দেখে আর্তনাদ করে উঠতেই ওয়াঙের প্রতি তাদের দৃষ্টি পড়ে।

ওয়াঙ ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্যুৎগতিতে কশাঘাত করতে আরম্ভ করে। ছেলে তার চেয়ে দেখতে লম্বা হলেও ওয়াঙ তার চেয়ে শক্ত, বলিষ্ঠ। ছেলের ক্ষতবিক্ষত দেহ থেকে রক্তধারা বইতে থাকে। পদ্ম চিৎকার করে তার হাত টেনে ধরে কিন্তু ওয়াঙ আজ ক্ষিপ্ত-নির্মম। সে পদ্মকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করে, পদ্ম তাকে আঁকড়ে ধরে চেঁচাতে থাকে। ওয়াঙ তখন ওকেও কয়েক ঘা লাগায়, মার খেয়ে ও পালিয়ে গেলে ওয়াঙ আবার ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মুখ থুবড়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লে ওয়াঙের হাত থেমে যায়।

ওয়াঙ দাঁড়িয়ে হাঁপায়, তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শ্বাস-নিশ্বাস পড়তে থাকে। ঘামে তার সারাদেহ ভেসে যায়। তার মনে হয়, সে দুর্বল, অসুস্থ; হাতের কঞ্চিটা ফেলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে :

"এবার ঘরে যা, আমার হুকুম ছাড়া ঘর থেকে বেরিয়ে এলে খুন করে ফেলব।" নাঙ এন নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে যায়।

ওয়াঙ একটা টুলে বসে পড়ে, দুহাতে মাথা গুঁজে চোখ বুজে, তার ঘনঘন নিশ্বাস পড়ে। কেউ তার কাছে আসে না। অনেকক্ষণ একলা বসে থেকে তার মনের ক্রোধ উবে গিয়ে মন শান্ত হয়।

সে এবার ধীরে ধীরে দেহটাকে টেনে ঘরে নিয়ে যায়। পদ্ম শুয়ে শুয়ে বিলাপ করছে। পদ্ম'র মুখখানা ধরে সে তার পানে ফিরিয়ে নেয়। ওর সারা মুখে কঞ্চির দাগ ফুলে বেগুনি হয়ে আছে।

করুণকণ্ঠে ওয়াঙ বলে :

"খানকিপনা আর ছাড়তে পারলে না! শেষপর্যন্ত আমার নিজের ছেলের সাথেও!"

পদ্ম বিলাপের সুর আরও চড়িয়ে প্রতিবাদ করে :

"আমি কিছু করিনি। ছেলেটার একা-একা ভালো লাগত না বলে আমার এখানে আসত। কোকিলাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, ছেলে আমার শয্যার পাশে কোনোদিন আসেনি, উঠোন পর্যন্তই এসেছে।"

তারপর পদ্ম ভীত করুণ দৃষ্টি ওয়াঙের পানে তুলে ধরে ওয়াঙের হাতখানা ওর মুখে বুলোতে বুলোতে কেঁদে বলে :

'দ্যাখো, তোমার পদ্ম'র কী দশা করেছ! তুমিই আমার সব, অন্য পুরুষের স্থান এ-বুকে নেই। তোমার ছেলে, সে আমার কে?"

স্বচ্ছ অশ্রুটলমল চোখে ও আবার ওয়াঙের পানে তাকায়। অব্যক্ত বেদনায় তার মন ব্যথিয়ে ওঠে। এ-নারীর সৌন্দর্যের আকর্ষণ প্রতিহত করার ক্ষমতা ওয়াঙের নেই, এ-নারীর প্রেম-মোহাচ্ছন্ন। ওয়াঙ এ-নারীকে বিশ্বাসঘাতিনী জেনেও, ভালো না-বেসে পারে না। সহসা ওয়াঙের মনে হয়, যাক, এ দুজনের—তার ছেলে আর পদ্ম'র মধ্যে কী ঘটেছে, তা জেনে সে সহ্য করতে পারবে না। এ রহস্য তার কাছে দুর্জ্ঞেয় হয়ে থাকুক, থাকুক অনাবৃত হয়ে, তাই ভালো। আর একবার আর্তনাদ করে সে বেরিয়ে আসে।

ছেলের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে বলে :

"তোর জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নে, কালই দক্ষিণমুখো বেরিয়ে পড়বি, যা-খুশি কর্‌গে, আমি না ডাকলে ফিরবি না।"

ওলান বসে তারই জামা সেলাই করছে। ওলানের পাশে দিয়েই সে যায় কিন্তু কোনো কথা ওকে বলে না। ভিতরমহলের মারধোর কান্নাকাটির খবর পেয়েছে কি না, ওলান এ-সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত দেয় না। ওয়াঙ ভরাদুপুরে অবসন্ন দেহে মাঠে ফিরে যায়।

পঁচিশ

বড়ছেলে চলে গেলে ওয়াঙ হাফ ছেড়ে বাঁচে। বাড়ি থেকে একটা অশান্তির বোঝা যেন নেমে গেছে। তার মনে হয়, নাঙ এন-এর চলে যাওয়া মোটের উপর ভালোই হল। এবার অন্যান্য ছেলেমেয়েদের দিকে সে একটু খেয়াল করতে পারবে। নিজের অশান্তি আর চাষবাসের ভাবনায় এতদিন সে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের পানে তাকিয়ে দেখার সময় পর্যন্ত পায়নি। সে ঠিক করে যে, মেজোছেলেটাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে কোনো ব্যবসাকেন্দ্রে শিক্ষানবিশিতে লাগিয়ে দেবে, নইলে বড়ছেলের মতো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে বাড়িতে আবার উপদ্রব সৃষ্টি করতে পারে।

ওয়াঙের মেজোছেলেটা বড়ছেলের ঠিক বিপরীত। সহোদর ভাই বলে এদের কেউ মনেই করবে না। বড়ছেলেটা তার মায়ের মতো। লম্বা-চওড়া হাড় আর উত্তরদেশীয় লোকের মতো লালচে রঙ। মেজোছেলে দেখতে ছোট বেঁটে। গায়ের রঙ পীত, তার মুখের আদলে কতকটা ওয়াঙের বাপের মুখ আসে। ধূর্ত-তীক্ষ্ণ

কৌতুক-ভরা চোখ; তবে কারণ ঘটলে যে-কোনো মুহূর্তে সে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। ওয়াঙ ভাবে :

"এ ছেলেটা পাক্কা ব্যবসায়ী হবে। দেখি,ওকে স্কুল ছাড়িয়ে শস্যপট্টিতে কোনো দোকানের শিক্ষানবিশিতে লাগিয়ে দিতে পারি কি না। আমি তো সেখানেই আমার শস্য বিক্রি করি—সেখানে নিজের ছেলে থাকলে সুবিধাই হবে। ফসল ওজনের সময় পাল্লার দিকে খেয়াল রাখবে; সময়ে নিজেদের একটু-আধটু সুবিধাও হয়তো করে নিতে পারবে।" সে কোকিলাকে ডেকে বলে :

"বড়ছেলের ভাবী-শ্বশুরকে গিয়ে বোলো, তার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে, আমাদের অন্তত একসাথে বসে এক-আধটু খাওয়াদাওয়া তো করা দরকার; যখন দুজন এক-বোতলের মদ হতে চলছি অর্থাৎ আমাদের দুজনের রক্ত একই পাত্রে ঢালা হচ্ছে।"

কোকিলা ফিরে এসে জানায় :

"তিনি যে-কোনো সময়ে আপনার সাথে দেখা করতে প্রস্তুত। আজ দুপুরে গেলেই ভালো হয়, যদি আপনি চান, তবে তিনি আপনার এখানেও আসতে পারেন।"

কিন্তু ওয়াঙ লাঙের ইচ্ছা নয় যে একজন শহুরে লোক তার এখানে আসুক। তাকে এটা-ওটা অনেক কিছু তৈরি করতে হবে, অনেক ঝক্কি-ঝামেলা। সে নিজেই বরং যাবে। গোসল করে রেশমি জামা পরে মাঠের উপর দিয়ে সে শহরে রওনা হয়। কোকিলার নির্দেশমতো সে লিও'র নামফলকওয়ালা একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সে নিজে অবশ্য নামফলক পড়তে পারে না, একজন পথচারীকে দিয়ে পড়িয়ে নেয়। ফটকটা সম্ভ্রান্ত মনে হয়। ফটকে সে এবার টোকা দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ফটকটা খুলে যায়, একজন পরিচারিকা কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে তার নাম জিজ্ঞেস করে। নাম শুনে পরিচারিকা তার পানে একবার চেয়ে তাকে বাড়ির প্রথম মহলে নিয়ে যায়। এটা পুরুষদের মহল। একটা ঘরে তাকে বসতে বলে, সে আবার তাকে একটিবার নিরীক্ষণ করে বুঝতে পারে যে, তিনিই তার মনিব-কন্যার ভাবী-বরের পিতা। সে তার মনিবকে ডাকতে যায়।

ওয়াঙ লাঙ চারিদিকটা ভালো করে দেখে। পর্দার কাপড় আর আসবাবপত্রের কাঠে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে। এগুলোতে মালিকের আর্থিক সাচ্ছল্যের স্বাক্ষর রয়েছে, তবে অতি-ঐশ্বর্যের স্বাক্ষর নেই। অবশ্যি তারও অতি-ধনীর মেয়েকে ঘরের বউ করে নেওয়ার ইচ্ছা নেই। ধনীর মেয়ে হবে জেদি, অহঙ্কারী আর তার ফরমাইশেরও ইয়ত্তা থাকবে না। তা ছাড়া ছেলেকেও সে বাপের অবাধ্য করে তুলবে। ওয়াঙ প্রতীক্ষা করে।

ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে একজন স্থূলকায় ভারিক্কি লোক এসে ঘরে ঢোকে। ওয়াঙ উঠে দাঁড়ায়। তারা পরস্পর অভিবাদন জানায়, গোপনে একে অন্যকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের ভালো লাগে। দুজন পাশাপাশি বসে তাদের জন্য পরিবেশিত গরম

পানীয় পান করে আর নানা বিষয়ে আলোচনা করে—ফসলের কথা, ফসলের দামের কথা ইত্যাদি। অবশেষে ওয়াঙ বলে :

"আমি আপনার কাছে একটা বিশেষ কথা বলতে এসেছি, অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে। আপনার বিখ্যাত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে কোনো লোকের প্রয়োজন হলে, আমার মেজোছেলে রয়েছে, বেশ চালাক-চতুর; আর যদি আপনার প্রয়োজন না থাকে তবে এ-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে অন্য আলাপ করা যাক।"

ওয়াঙের ব্যবসায়ী-বেয়াই মুখে হাসি মেখে প্রসন্ন-সুরে বলে :

"হ্যাঁ, আমারও এমনি একজন চালাক-চতুর লেখাপড়া-জানা যুবকের দরকার।"

ওয়াঙ গর্ব-ভরে জওয়াব দেয় :

"আমার দুই ছেলেই পণ্ডিত। তারা অন্যের লেখায় ভুল থাকলে চট করে ধরে ফেলে।"

"তবে তো ভালোই হল," লিউ জওয়াব দেয়। "সে যখন খুশি আসতে পারে, তবে একটা কথা—কাজ না-শেখা পর্যন্ত মাইনে পাবে না, খাওয়াটা পাবে শুধু। একবছর পর মাসিক এক ডলার দেব, তারপর বছরে এক ডলার বাড়বে, তিন বছর পরে সে আর শিক্ষানবিশ থাকবে না। তখন নিজের কর্মক্ষমতা অনুযায়ী উন্নতি করা-না-করা তার হাতে। এ মাইনে ছাড়াও সে ক্রেতা-বিক্রেতাদের কাছ থেকে কমিশন পেতে পারে। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। আমরা দুজন যখন আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছি, তখন আমি আপনার কাছ থেকে জামিন তলব করব না।"

প্রসন্ন ওয়াঙ উঠতে উঠতে হেসে বলে :

"আমরা এখন আত্মীয়। আমার দ্বিতীয় মেয়েটার জন্য আপনার কোনো ছেলে নেই?"

লিউ এবার প্রাণখোলা হাসি হেসে বলে, তার পুষ্ট দেহখানা হাসির প্রাবল্যে দুলে ওঠে :

"আমার মেজোছেলের বয়েস দশ বছর। ওর এখনও বাকদান হয়নি। আপনার মেয়ের বয়েস কত?"

"আগামী জন্মদিনে ওর বয়স হবে দশ। দেখতে শুনতে বেশ ফুটফুটে, ফুলের মতো সুন্দর দেখতে।"

দুজন এবার একসাথে হেসে ওঠে। "তাহলে আমরা কি দুই-বন্ধনে বাঁধা পড়লাম?" —লিউ রসিকতা করে।

এ সম্বন্ধে ওয়াঙ আর কোনো কথা বলে না। বৈবাহিক ব্যাপারে সামনাসামনি এর চেয়ে বেশি আলাপ অশোভন। বিদায় নিয়ে পথ চলতে চলতে সে ভাবে, "এ সম্বন্ধটা হয়ে যাবে, আশা করি।" বাড়ি ফিরে সে তার ছোটমেয়ের পানে তাকায়। মেয়েটা ফুটফুটে। ওর মা ওর পা দুটো বেশ ভালো করে বেঁধে দিয়েছে। তাই মেয়েটা যখন টলতে টলতে চলে, তখন বেশ লাগে।

মেয়েটার মুখের দিকে ভালো করে তাকাতেই ওর গালের শুকনো অশ্রুরেখা ওয়াঙের চোখে পড়ে। মুখখানাও ওর বিষাদ-ক্লিষ্ট, গম্ভীর। মেয়েটাকে কাছে টেনে আদর করে বলে :

"তুমি কেঁদেছ কেন?"

মেয়েটা অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে জামার একটা বোতাম নাড়তে নাড়তে লজ্জিত অনুচ্চ কণ্ঠে বলে :

"মা আমার পা দুটো এমনি শক্ত করে বেঁধে দেয় যে, যন্ত্রণায় রাতে আমি ঘুমোতে পারি না।"

"কিন্তু আমি তো তোমাকে কাঁদতে শুনিনি?" ওয়াঙ অবাক হয়ে বলে।

"মা আমাকে জোরে কাঁদতে বারণ করেছে যে! মা বলে, তুমি নাকি কারো দুঃখ সইতে পারো না। তাই আমার কান্না শুনলে তুমি আমার পা বাঁধতে দেবে না। পা না-বেঁধে দিলে, তুমি যেমন মাকে ভালোবাসো না, আমার স্বামীও আমাকে ভালোবাসবে না।"

ছোট্ট শিশু যেমন শেখানো গল্প বলে যায়, মেয়েটাও একথাগুলো তেমনি করে বলে যায়। ওয়াঙের বুকে কে যেন ছুরি বসিয়ে দেয়। ওলান তার মেয়েকে বলেছে, সে ওলানকে ভালোবাসে না। ওলান তার সন্তানের মা। সে তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফিরিয়ে দেয় :

"আজ তোমার জন্য একটা সুন্দর বরের কথা শুনে এলাম। দেখি, কোকিলা এ-সম্বন্ধটা পাকাপাকি করতে পারে কি না।"

একথা শুনে মেয়েটা মধুর হাসি হেসে লজ্জায় মাথা নত করে। সহসা কিশোরী বালিকা যৌবনবতী হয়ে ওঠে।

সেদিন সন্ধ্যায় ওয়াঙ লাঙ কোকিলাকে বলে, "গিয়ে দ্যাখো, এ-সম্বন্ধটা পাকাপাকি করতে পারো কি না।"

সে রাতে পদ্ম'র পাশে শুয়ে ওয়াঙের ভালো ঘুম হয় না। জেগে জেগে তার মনের মুকুরে অতীতজীবনের ছবি ভেসে ওঠে। ওলানই তার জীবনের প্রথম পরিচিতা নারী। প্রভুভক্ত বিশ্বাসী ভৃত্যের মতো ওলান সারাজীবন তার পাশে রয়েছে। মেয়ের কথাগুলো তার মনে পড়ে যায়। দৃষ্টির অস্বচ্ছতা সত্ত্বেও ওলান এ সত্যটুকু উপলব্ধি করেছে যে, সে তাকে ভালোবাসে না।

এর দিনকয় পরে মেজোছেলেকে শহরে পাঠিয়ে দেয়; মেজোমেয়ের বিয়েটাও পাকাপাকি করে নেয়। যৌতুকাদি গয়নাগাঁটি দেওয়া-থোওয়াটাও ধার্য হয়ে যায়। এবার ওয়াঙ লাঙ নিশ্চিন্ত। সে ভাবে :

"যাক, সব ছেলেমেয়ের সুরাহা হল। রইল মাত্র হাবা মেয়েটা। বসে বসে কাপড়ের ফালি পাকানো ছাড়া ওকে দিয়ে আর কিছু হতে পারে না । ছোট ছেলেটাকে স্কুলে না দিয়ে জমিজমা দেখাশোনার কাজেই লাগাব। দুজন লেখাপড়া শিখেছে, এই যথেষ্ট।"

গর্বে তার বুক ফুলে ওঠে। তার তিন ছেলে—একজন পণ্ডিত, একজন ব্যবসায়ী আর একজন কিষাণ। সে এবার তৃপ্ত। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর তাকে ভাবতে হবে না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে না ভাবুক, ছেলেমেয়েদের জন্মদায়িনীর ভাবনা তার মনে উঁকি মারে।

সুদীর্ঘ দিন ব্যাপী তাদের দাম্পত্যজীবনে এই প্রথম ওয়াঙ লাঙ তার স্ত্রীর সম্বন্ধে চিন্তা করে। ওলানের প্রথম আগমনের দিনেও ওলানের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ওয়াঙ ভাবেনি। ওর নারীত্বের স্বীকৃতি ছাড়া আর কোনো স্বীকৃতি ও পায়নি। ওলান তার জীবনের প্রথম নারী, এই বিবেচনাটুকু ওয়াঙ করেছে। তার মনে হয়, কর্মবহুল ব্যস্ত জীবনে সে এতদিন ওলানের কথা ভাববার অবসরই পায়নি। এবার জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। ছেলেমেয়েদের সুরাহা হয়ে গেছে, জোত-জমির দেখাশোনার ভাবনা নেই। পদ্ম'র সঙ্গে তার জীবন ধরাবাঁধা নিয়মে দাঁড়িয়েছে। পদ্ম এখন শান্ত বিনীত হয়ে গেছে। এতদিনে ওলান সম্বন্ধে ভাবনার তার অবসর হয়েছে।

আজ ওলান তার চোখে নারীরূপে ধরা পড়ে না। তার কুৎসিত চেহারা, অস্থিসার দেহ আর হলদে রঙ তার চোখে পড়ে না। তার পানে চেয়ে ওয়াঙের মন অদ্ভুত অনুশোচনায় ভরে ওঠে। ওলান কত রোগা হয়ে গেছে। কী পাংশুটে আর রুক্ষ হয়ে গেছে ওর দেহ-বর্ণ। ওলানের রঙটা ছিল সব সময়ই কালচে। মাঠে কাজ করার সময় ওর গায়ের রঙ লালচে আর পিঙল হয়ে উঠত। বহুদিন সে ফসল-তোলার মওসুম ছাড়া আর মাঠে যায় না। তা-ও দুই বছর আগের কথা। ওলান তার মাঠে যাওয়াটা পছন্দ করে না—পাছে লোকে বলে :

"তুমি অমন ধনী আর তোমার স্ত্রী কিনা এখনও মাঠে কাজ করতে যায়!"

কেন যে ওলান মাঠে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকতে রাজি হল, এ সম্বন্ধে ওয়াঙ কোনোদিন ভাবেনি। কেন ওলান এত আস্তে ধীরে চলাফেরা করে এ সম্বন্ধেও ওয়াঙ কোনোদিন ভাবেনি। কিন্তু আজ তার মনে পড়ছে, অনেকদিন বিছানা ত্যাগ করার সময় বা উনুন ধরাবার সময় ওলানের কাৎরানি সে শুনেছে। সে 'কী হয়েছে?' বললেই ওলান তার কাৎরানি বন্ধ করে দিয়েছে। এখন ওলানের স্ফীত উদরের পানে তাকিয়ে অনুতাপে সে ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে আপনমনে যুক্তি দেয় :

"একজন পুরুষ তার উপপত্নীকে যেমন ভালোবাসে, পত্নীকে যদি তেমন ভালোবাসতে না পারে সে অপরাধ তার নয়। কোনো মানুষই তা পারে না।" সে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়, "আমি তাকে দৈহিক নির্যাতন করিনি; যখনই চেয়েছে, তখনই তাকে টাকা-পয়সা দিয়েছি।"

তবু মেয়ের কথাটা সে ভুলতে পারে না। বারবার তার বুকে একথার কাঁটা বিঁধে। কেন যে এ-কথাগুলো বুকে বিঁধে, তা সে উপলব্ধি করতে পারে না; কারণ যুক্তিতর্কে সে নিজেকে একজন ভালো, এমনকি অনেকের চেয়ে ভালো স্বামী বলেই মনে করে। এই অস্বস্তির জ্বালা থেকে মুক্ত হতে না-পেরে সে ওলানের চলাফেরা

লক্ষ করে। একদিন খাওয়াদাওয়ার পর ওলান নুয়ে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। সে লক্ষ করে, যন্ত্রণায় তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় সে হাঁপাচ্ছে আর নুয়ে নুয়ে পেট টিপছে। ওয়াঙ তাকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে :

"কী হয়েছে?"

ওলান মুখ ফিরিয়ে বিনীত-কণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"পুরনো ব্যথাটা আবার উঠেছে।"

ওয়াঙ তার পানে কতক্ষণ চেয়ে থেকে ছোটমেয়েকে বলে :

"ঝাড়ুটা দিয়ে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে ফ্যাল্; তোর মা অসুস্থ।" ওলানকে বহুবছর পর আজ মমতা-ভরা কণ্ঠে বলে, "বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। মেয়েকে বলছি, তোমাকে গরম পানি দিয়ে আসবে। তুমি বিছানা ছেড়ে উঠো না।"

সে স্বামীর কথায় নীরবে ধীরে ধীরে আপন ঘরে চলে যায়। তার অস্ফুট গোঙানি ওয়াঙের কানে ভেসে আসে। এই গোঙানি ওয়াঙ সহ্য করতে না-পেরে ডাক্তারের সন্ধানে শহরে যায়।

তার মেজোছেলের পরিচিত এক কেরানির কথামতো ওয়াঙ এক ঔষধের দোকানে যায়। ডাক্তার তখন চায়ের পেয়ালা সামনে নিয়ে অলসভাবে বসেছিল। ডাক্তার বৃদ্ধলোক। দীর্ঘ পক্ব শ্মশ্রুতে মুখ ঢাকা। নাকে প্যাঁচার চোখের মতন প্রকাণ্ড একজোড়া পিতলের ফ্রেমের চশমা। ধূসর রঙের ময়লা চাপকানে তার সারা হাত ঢেকে আছে। ওয়াঙ তার স্ত্রীর রোগের উপসর্গগুলো বর্ণনা করতেই ডাক্তার তার টেবিলের দেরাজ ঠেলে কালো কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলি বের করে বলে, "আমি এখনি যাচ্ছি।"

তারা এসে দেখে ওলান ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ঠোঁটে আর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে আছে। বুড়ো ডাক্তার এসব দেখে মাথা নাড়ে। বানরের মতো শুকনো পাংশুটে হাতে সে অনেকক্ষণ ওলানের নাড়ি পরীক্ষা করে। তারপর মাথা নেড়ে গভীর কণ্ঠে বলে, "পিলেটা বেড়ে গেছে, যকৃৎটাও খারাপ হয়ে গেছে। জরায়ুতে মানুষের মাথার সমান পাথরের মতো শক্ত কী একটা রয়েছে; পাকস্থলীতে কিছু হজম হচ্ছে না। হৃদপিণ্ডটাও প্রায় অনড়। মনে হচ্ছে ওটাতে পোকা ধরেছে।"

এসব শুনে ওয়াঙ লাঙের নিজের হৃদস্পন্দনও বন্ধ হয়ে যায় আর কী। সে উষ্মার সুরে বলে :

"তাহলে ওকে ঔষধ দাও, পারবে দিতে?"

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে ওলান চোখ মেলে তাদের পানে তাকায়। বেদনার তন্দ্রাচ্ছন্নতায় ও কিছুই বুঝতে পারে না। বুড়ো ডাক্তার আবার বলে :

"রোগটা বড় কঠিন। রোগমুক্তির চুক্তি না করতে চাইলে দশ ডলার লাগবে। ঔষধ লিখে দেব। গাছগাছড়া, বাঘের হৃদপিণ্ড, কুকুরের দাঁত—সব একত্র সিদ্ধ করে রোগিনীকে সুরুয়াটা সেবন করতে দেবেন। আর রোগের পূর্ণ নিরাময়ের চুক্তি করতে চান, তবে পাঁচশ ডলার লাগবে।"

"পাঁচশ ডলার!" কথাটা ওলানের কানে যেতেই ওলানের তন্দ্রাচ্ছন্নতা ভেঙে যায়। ও দুর্বল ক্ষীণ-কণ্ঠে বলে :

"না, এত টাকা খরচ করে আমাকে বাঁচাতে হবে না। আমার জীবন এত বড় নয়। এ টাকায় একফালি ভালো জমি কেনা যাবে।"

একথা শুনে ওয়াঙের মন অনুশোচনার বৃশ্চিক-দংশনে আবার ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে :

"না,এ বাড়িতে আমি কাউকে মরতে দেব না। এ টাকা দেবার ক্ষমতা আমার আছে।"

ওয়াঙের কথায় বুড়ো ডাক্তারের চোখ লোভে জ্বলজ্বল করে ওঠে। কিন্তু সে জানে চুক্তি করে চুক্তির শর্ত পূর্ণ করতে না পারলে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই সে দুঃখিত মনে বলে :

"না, তার আসল রোগটা আগে আমার চোখে পড়েনি বলে আমার ভুল হয়েছিল; পূর্ণ রোগমুক্তি চাইলে আমাকে পাঁচটি হাজার ডলার দিতে হবে।"

ওয়াঙ এবার করুণ-চোখে ডাক্তারের পানে তাকায়। জমি বিক্রি না করলে সে এত টাকা জোগাড় করতে পারবে না। সে জানে, জমি বিক্রি করে টাকা জোগাড় করলেও কিছু ফল হবে না। ডাক্তার যা বলেছে তার অর্থ এই যে, এ রোগ চিকিৎসার অতীত। ওলান বাঁচবে না।

ডাক্তারের সাথে বেরিয়ে গিয়ে সে ডাক্তারকে তার দর্শনীর দশ ডলার দিয়ে দেয়। ডাক্তার বিদায় হলে সে অন্ধকার বাবুর্চিখানায় যায়। এ বাবুর্চিখানায় ওলান তার জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছে। এখন সে আর এখানে নেই। সুতরাং, ওয়াঙকে আর কেউ এখানে দেখতে আসবে না। ধোঁওয়ায় কালো বাবুর্চিখানার দেওয়ালের উপর মুখ রেখে ওয়াঙ অঝোরে কাঁদে।

ছাব্বিশ

কিন্তু এমন আকস্মিকভাবে ওলানের জীবনের অবসান হতে পারে না। সবে জীবনের মাঝপথ পেরিয়ে এমনি করে সে পালাতে পারে না, পালালে চলবে না। তাই সে বহুদিন মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে। সারাটা শীতকাল বিছানায় পড়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। এই প্রথম ওয়াঙ লাঙ আর তার সন্তানেরা উপলব্ধি করে, ওলান এ গৃহের কী ছিল, কতখানি ছিল। কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা সে করেছিল তাদের সবার জন্যে।

এখন দেখা যাচ্ছে, বাড়ির কেউ জানে না, কী করে উনুনে আঁচ দিতে হয়; না-ভেঙে না-পুড়িয়ে কী করে মাছ ভাজতে হয়, কী তেল দিয়ে কোন্ তরকারি রাঁধতে হয়। বাড়িতে সব আনাড়ির মেলা। এঁটো খাবার আর আবর্জনা টেবিলের নিচে জমে থাকে, যতক্ষণ-না দুর্গন্ধে অস্থির হয়ে ওয়াঙ কুকুরকে খাওয়ায় বা ফেলে দেয়।

ছোটছেলেটা তার দাদুর এটা-ওটা করে মায়ের অভাব পূর্ণ করতে চেষ্টা করে। শিশুর মতো অসহায় হয়ে গেছে বুড়ো। ওয়াঙ বাপকে কিছুতেই বোঝাতে পারে না ওলান আর কেন তার কাছে চা আর গরম পানি নিয়ে আসে না ; তাকে ধরে শুইয়ে উঠিয়ে দেয় না। তার ডাকে ওলান আর আসে না বলে বুড়ো জেদি-শিশুর মতো চায়ের বাটি মাটিতে ছুড়ে ফেলে। অনন্যোপায় হয়ে ওয়াঙ লাঙ একদিন তাকে ধরে ওলানের ঘরে নিয়ে গিয়ে শয্যায় শায়িতা ওলানকে দেখিয়ে দেয়। বুড়ো তার ছানিপড়া আধ-কানা চোখে ওলানের পানে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কী বলতে বলতে কেঁদে ওঠে। সে-ও বুঝতে পারে, অঘটন একটা ঘটেছে।

শুধু হাবা মেয়েটাই কিছু বোঝে না। দিনরাত হাসিমুখে কাপড়ের ফালি পাকায়। কিন্তু এর জন্যও লোক দরকার। একে খাওয়াতে হয়, রোদে বসিয়ে দিতে হয়, ঘরে আনতে হয়। কাউকে-না-কাউকে এর উপর খেয়াল রাখতেই হয়। একদিন সবাই তার কথা ভুলে যায়, এমনকি ওয়াঙও। সারারাত বাইরে থেকে শেষরাতে শীতের হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে বেচারি চিৎকার করতে শুরু করে। নিজের মা'র পেটের বোনের প্রতিও তাদের একটু মায়া-মমতা নেই বলে ওয়াঙ রাগে সবাইকে খুব গালাগালি করে; কিন্তু পরে ভেবে দেখে, সবাই ছেলেমানুষ। মায়ের কাজ করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। তাই সে তাদের ক্ষমা করে। হাবা মেয়েটার ভার এরপর সে নিজের হাতেই তুলে নেয়। বৃষ্টি বা তুষারপাত হলে কিম্বা কনকনে হাওয়া বইলে সে মেয়েটাকে ঘরে এনে উনুনের পাশে গরম জায়গায় বসিয়ে দেয়।

সারা শীতের মওসুমে ওলান মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে। ওয়াঙ লাঙ জোতজমির দেখাশোনা করতে যায় না। শীতের কাজ আর জনমজুরদের পরিচালনার ব্যবস্থা সে চিঙের হাতেই তুলে দেয়। চিঙ সততার সাথে কাজ করে। সকাল-বিকাল ওলানের ঘরে এসে ওর হাল-অবস্থা জেনে যায়। রোজ রোজ একই জওয়াব দিয়ে ওয়াঙ বিরক্ত হয়ে ওঠে। অবশেষে সে চিঙকে হুকুম দেয়, ওলান সম্বন্ধে সে আর কোনোদিন কোনো খোঁজখবর না নিয়ে যেন চাষাবাদের কাজ মন দিয়ে করে। এতেই হবে।

শীতের মাসে ওয়াঙ অধিকাংশ সময় ওলানের শয্যাপাশে থাকে। ওলান শীত অনুভব করলে সে মাটির হাঁড়িতে কাঠ-কয়লা জ্বালিয়ে ওর পাশে রেখে দেয়। ওলান রোজ ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করে :

"বড় বাজেখরচ করছ।"

একদিন সে ওলানের প্রতিবাদ সহ্য করতে না-পেরে রেগেই বলে,

"আমি তোমার এসব কথা সইতে পারি না। আমি জমাজমি সব বেচে ফেলব। দেখি, তোমাকে সারিয়ে তুলতে পারি কি না।"

ওলান ম্লান হাসি হেসে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "না, না, তা আমি তোমাকে করতে দেব না। মরণ আমার একদিন-না-একদিন হবেই; কিন্তু আমার মরণের পরেও আমার জমি যেন অক্ষয় থাকে।"

ওলানের মৃত্যু সম্বন্ধে ওয়াঙ কোনো কথা বলতে চায় না। সে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ওয়াঙ জানে, ওলান আর বেশিদিন টিকবে না। তার একটা কর্তব্য রয়েছে। তাই সে একদিন শহরে কফিন-প্রস্তুতকারকের দোকানে গিয়ে তৈরি-কফিনগুলো একটা একটা করে পরীক্ষা করে। সে একটা ভালো কাঠের মজবুত কালো রঙের কফিন বেছে নেয়। ধূর্ত মিস্ত্রি বলে :

"দুটো কফিন একসাথে নিলে সস্তা পড়বে—দামের তিন ভাগের এক ভাগ কমে যাবে। নিজের জন্যও একটা কিনে ফেলুন না, নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

"না, আমার ছেলেরাই এ কাজটা করতে পারবে।"—ওয়াঙ জওয়াব দেয়। তার মনে পড়ে যায়, তার বাবার জন্য এখনও কফিন কেনা হয়নি। সে মিস্ত্রিকে বলে, "আমার বুড়ো বাবা আছে, তাঁর দিন ফুরিয়েছে—তাঁর শ্রবণ আর দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। দাও, দুটো কফিনই নেব।"

মিস্ত্রি কথা দেয় কফিন দুটো আবার ভালো করে কালো রঙ করে ওয়াঙের বাড়িতে পৌঁছে দেবে। বাড়ি ফিরে ওলানকে কফিন কেনার কথা বললে, ওলান খুব খুশি হয়—যাক, ওর পরপারের ভালো বন্দোবস্ত হয়ে গেছে তা হলে।

ওয়াঙ দিনের বেশির ভাগ সময় ওলানের শয্যাপার্শ্বে থাকে। তাদের মধ্যে বেশি কথা হয় না; ওলান বড় দুর্বল। তাছাড়া জীবনে তাদের মধ্যে বেশি আলাপ কোনোদিনই হয়নি। অনেক সময় ওলান কেমন যেন সবকিছু ভুলে যায়। কোথায় আছে, সেকথাও তার মনে থাকে না। সে প্রলাপে তার শৈশবের কথা বকে। প্রলাপের ভাঙা টুকরো কথার ফাঁকে ওয়াঙ ওলানের জীবনের অতীতদিনের মর্মখানি অনুভব করে। ওলান বকে :

"আমি দোরগোড়া পর্যন্ত গোশ্‌তের তরকারি দিয়ে আসব—আমি জানি আমি কুরূপা, বড়সাহেবের সামনে আমি যেতে পারব না—।"

আবার হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, "না, আমাকে আর মেরো না—আমি চুরি করে আর খাব না—বাবাগো—মাগো—।" ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারবার বলে, "আমি জানি, আমি কুরূপা—কেউ আমাকে ভালোবাসতে পারে না।"

"আমি কুরূপা—কেউ আমাকে ভালোবাসতে পারে না—" শুনে ওয়াঙের সহ্য হয় না। সে ওলানের রুক্ষ প্রকাণ্ড হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বুলিয়ে দেয়। মড়ার হাতের মতো শক্ত হয়ে গেছে ওলানের হাত। সে অবাক হয়ে ভাবে আর দুঃখ করে, ওলান সত্যিকথাই বলেছে; সত্যিই ও কুরূপা। সে ওলানের হাতখানা হাতে নিয়ে ওলানের প্রতি তার মমতা প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু ওলানের প্রতি তার মমতা জাগে না। সে লজ্জায় মরে যায়, পদ্ম সামান্য ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করলে তার মন গলে যায়; কিন্তু মরণ-যাত্রিনী ওলানের জন্য তো তার মন গলে না। ওলানের হাতখানা স্পর্শ ক'রে ওলানের প্রতি তার করুণা তো দূরের কথা, ঘৃণা জন্মে।

ওয়াঙ এই গোপন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় বাহ্যিক আচরণে সহৃদয়তা দেখিয়ে। সে ওলানের জন্য ভালো খাবার কিনে আনে। পন্ন'র সঙ্গসুখও সে উপভোগ করতে পারে না। সে মৃত্যুর এই বিভীষিকা থেকে মুক্তিলাভের আশায় পন্ন'র কাছে যায়; কিন্তু সেখানেও মৃত্যুশয্যাশায়িনী ওলানের মুখ বারবার তার মনে উঁকি মারে। পদ্মকে জড়িয়ে-ধরা-বাহু শিথিল হয়ে শয্যায় লুটিয়ে পড়ে।

মাঝে মাঝে ওলানের সম্বিৎ ফিরে আসে। একদিন সে কোকিলাকে ডাকে। বিস্মিত ওয়াঙ কোকিলাকে ডেকে আনলে ওলান কম্পিত হাতের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে সোজাসুজি বলে :

"বেশ, তুমি বুড়ো জমিদারের মহলে বাস করতে পারো। তার আদর-সোহাগ পেতে পারো। কারণ, রূপসী বলে তোমাকে ধরা হত; কিন্তু আমি আমার স্বামীর কাছে স্ত্রীত্বের সম্মান পেয়েছি, আমি আমার স্বামীর সন্তান গর্ভে ধরে মাতৃত্বের সম্মান পেয়েছি। আর তুমি দাসীই রয়ে গেলে, তোমার দাসীত্ব আর ঘুচল না।"

একথায় কোকিলা রেগে কী একটা মানানসই জওয়াব দিতে চাইলে, ওয়াঙ তাকে মিনতি করে থামিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে বলে, "এখন তো ভালো-মন্দ জ্ঞান ওর নেই।"

ওয়াঙ ঘরে ফিরে যায়। ওলান ওর দুহাতের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে বসে আছে। ওয়াঙকে বলে :

"আমি মরে গেলে এই দাসী মাগী কিম্বা এ মাগীর মনিব-মাগী যেন কোনোদিন আমার ঘরে না ঢোকে বা আমার কোনো জিনিস স্পর্শ না করে। যদি করে, তবে আমি আমার প্রেতাত্মাকে পাঠিয়ে এর প্রতিশোধ নেব।"—এই বলে সে তার মাথা বালিশে এলিয়ে দেয়।

নতুন বছরের আগে একদিন ওলানের অবস্থা হঠাৎ বেশ ভালো হয়ে উঠে। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শেষবার জ্বলে ওঠার মতো। সে পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বিছানায় বসে নিজহাতে খোঁপা বেঁধে চায়ের হুকুম দেয়। ওয়াঙ ঘরে এলে সে বলে,

"নতুন বছর আসছে, দেখছি পিঠেও হয়নি, গোশ্‌তও তৈরি নেই। আমি মনে মনে একটা কথা ভেবেছি, ঐ দাসী মাগীকে আমার বাবুর্চিখানায় আমি ঢুকতে দেব না। আমি চাই, তুমি আমার বাগদত্তা পুত্রবধূকে আনতে পাঠাবে। আমি তাকে এখনও দেখিনি। সে আসুক। কী করতে হবে, আমি তাকে বলে বুঝিয়ে দেব।"

ওলানের দৈহিক শক্তি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে ওয়াঙ বড় খুশি হয়। এবারকার উৎসবানন্দের কথা ওয়াঙ মোটেই ভাবেনি। ওলানের অনুরোধ শুনে সে কোকিলাকে পাঠিয়ে দেয়, লিউকে কাকুতি-মিনতি করে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের ভাবী পুত্রবধূকে নিয়ে আসার কথা বলতে। সব শুনে লিউ যখন দেখল যে, ওলান এ শীতটা কাটিয়ে উঠতে পারে কি না সন্দেহ আর এদিকে মেয়ের বয়েসও ষোলো হয়েছে—আরও অল্প বয়েসের মেয়েরাও স্বামীর ঘর করে—তখন আর আপত্তি করে না।

ওলানের অসুস্থতার দরুন পুত্রবধূর আগমন উপলক্ষে কোনো উৎসবের আয়োজন হয় না। পুত্রবধূ সিডান চেয়ারে বসে নীরবে তার শ্বশুরবাড়িতে এসে পৌঁছে। সঙ্গে আসে শুধু তার মা আর একটা দাসী। মেয়েকে বেয়াইনের হাতে তুলে দিয়ে মা চলে যায়। দাসীটাকে রেখে যায় মেয়ের সেবার জন্য।

ছেলেমেয়েরা যে-ঘরে শুত, সে-ঘর থেকে তাদের সরিয়ে দিয়ে সেখানে ছেলে-বউয়ের থাকার উপযুক্ত বন্দোবস্ত হল। বউয়ের সাথে কথা বলা রীতিবিরুদ্ধ। তাই ওয়াঙ ওর সাথে কথা বলে না। কিন্তু বউ তাকে সালাম করলে সে মাথা নুইয়ে সালাম গ্রহণ করে। বউ দেখে সে খুশি হয়, কারণ বউ নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত। চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে চলাফেরা করে, দেখতেও বেশ ভালো, অহঙ্কার করার মতো সুন্দরী অবশ্য নয়। তার আচার-ব্যবহার চাল-চলন নিখুঁত। ওলানের সেবা-শুশ্রূষা মন দিয়ে করে। তাই ওলান সম্বন্ধেও ওয়াঙ এবার নিশ্চিন্ত। কারণ এবার একজন মেয়ে-মানুষ রয়েছে ওকে দেখাশোনার জন্য। ওলানও বউকে পেয়ে খুশি।

দিন-তিনেক এমনিভাবে কেটে যেতেই ওলানের মাথায় আর এক খেয়াল চাপে। সকালবেলায় ওয়াঙ তার খোঁজখবর নিতে এলে সে তাকে বলে :

"আমার মৃত্যুর আগে আর একটা কাজ করতে হবে।"

ওয়াঙ চটে বলে :

"তোমার মরণের কথা শুনে আমি খুব আনন্দ পাই—না?"

ম্লান সংক্ষিপ্ত হাসি হেসে ওলান বলে :

"মৃত্যু আমার হবেই; মৃত্যুর ডাক আমি শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বড়খোকা বাড়ি ফিরে তার বাগদত্ত এই সুশীলা মেয়েকে বিয়ে না-করা পর্যন্ত আমার মৃত্যু হবে না। কত ভালো মেয়ে। আমার কত সেবা-যত্ন করছে। আমি চাই ছেলে বাড়ি ফিরে বিয়েটা শেষ করে ফেলুক, তা হলেই আমি আরামে মরতে পারি। আমি জেনে যেতে চাই তোমার পৌত্র আমার শ্বশুরের প্র-পৌত্র অঙ্কুরিত হয়েছে।"

এতগুলো কথা একসাথে সুস্থ অবস্থায়ও সে বলেনি, আর কথাগুলো সে বেশ জোর দিয়ে বলে। অনেকদিন সে অমনভাবে কথা বলেনি। তার জোরালো কণ্ঠস্বরে, তার চাওয়ার জোরে ওয়াঙ খুশি হয়। একটু সময় নিয়ে বেশ ধুমধাম করে ছেলের বিয়েটা দেবে, তার এই ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ওলানের ইচ্ছায় প্রতিবাদ করে না। তাই সে ওলানকে খুশি করার জন্য সাগ্রহে বলে :

"বেশ, তাই হবে। আজই আমি দক্ষিণে লোক পাঠাচ্ছি ছেলেকে খুঁজে নিয়ে আসতে। তবে তুমি আমাকে কথা দেবে, তুমি ভালো হয়ে উঠবে—মরবে না। তোমার অসুখে পড়ে থাকায় বাড়িটা যেন জঙ্গল হয়ে উঠেছে।"

এ-কথায় ওলান আনন্দিত হয়। তবে কোনো কথা না বলে নীরবে স্মিতমুখে চোখ বুজে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ে।

সেদিনই ওয়াঙ ছেলেকে আনতে লোক পাঠায়। লোকটাকে বলে দেয়,

"ছেলেকে বোলো, তার মা মৃত্যুশয্যায় দিন গুনছে। তাকে না-দেখে—তার বিয়ে না দিয়ে নিশ্চিন্তে আরামে মরতে পারছে না। ছেলের যদি মা-বাপের প্রতি একটুও দরদ আর বাড়িঘরের প্রতি টান থাকে, তবে সে যেন ক্ষণ-বিলম্ব না করে বাড়ি চলে আসে। আজ থেকে তিনদিন পর বিয়ে। সে অনুসারে আমি খাওয়াদাওয়ার আয়োজন আর লোকজনদের দাওয়াত করেছি।"

কথামতো ওয়াঙ কাজে লেগে যায়। সে কোকিলাকে ডেকে শহরের বড় চা-খানা থেকে ভালো বাবুর্চি এনে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করতে বলে দেয়। কোকিলার হাতে টাকা দিয়ে বলে :

"সেই জমিদারবাড়ির বিয়েতে যেমন জাঁকজমক খাওয়াদাওয়া হত, তেমনটি হওয়া চাই। টাকার চিন্তা নেই, যা লাগে দেব।"

ওয়াঙ গাঁয়ের সব লোকদের আর শহরে গিয়ে বড় চা-খানা আর ব্যবসা-পট্টির পরিচিত সব লোকদের দাওয়াত করে আসে। তার চাচাকে বলে :

"আমার ছেলের বিয়ে উপলক্ষে তুমি তোমার আর তোমার ছেলের বন্ধুবান্ধব সবাইকে আমার হয়ে দাওয়াত কোরো।"

তার চাচা যে কী জীব, সে-কথা মনে করেই সে তার চাচাকে এ-কথা বলে দেয়। সে তার চাচার সাথে বেআদবি করা দূরে থাকুক, তার প্রকৃত প্রকৃতি জানার পর থেকে সম্মানিত অতিথিরূপে তার সাথে ব্যবহার করে আসছে।

বিয়ের আগের রাতে নাঙ এন বাড়িতে পৌঁছে ক্ষিপ্রপদে ওয়াঙের ঘরে প্রবেশ করে। ছেলেকে দেখে ওয়াঙ পুরনো কথা একদম ভুলে যায়। দুবছর পরে ছেলের সাথে দেখা। ছেলে আর বালক নয়, দীর্ঘ সুদর্শন পুরুষ। সুগঠিত শক্ত চওড়া দেহ, গণ্ডদ্বয়ে স্বাস্থ্যের লালিমা, মাথায় ছোট করে কাটা একরাশ তেলতেলে চকচকে চুল। তার পরিধানে সাটিনের দীর্ঘ চাপকান আর আস্তিনহীন জ্যাকেট। ওয়াঙের বুক গর্বানন্দে ফেটে পড়ে। এ ছেলে তারই আত্মজ! বিগত দিনের দুঃখময় স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায়। সে ছেলেকে মায়ের ঘরে নিয়ে যায়।

মায়ের শয্যাপাশে বসে মায়ের অবস্থা দেখে ছেলের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। কিন্তু ছেলে রোগিণী মাকে উৎসাহ দেয়। প্রফুল্লকণ্ঠে বলে. "যা শুনেছিলাম, তার চেয়ে তোমার শরীর অনেক ভালো দেখতে পাচ্ছি; তোমার মরণের আরও অনেক দেরি, মা।"

"তোর বিয়ে দেখে তবে মরব।" ওলান সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়।

বিয়ের আগে বর-কনের দেখা হতে নেই। তাই পদ্ম মেয়েকে সাজাবার জন্য আপন মহলে নিয়ে যায়। পদ্ম, কোকিলা আর ওয়াঙের চাচির চেয়ে কনে-সাজানো প্রসাধনের কাজ কেউ ভালো জানে না। বিয়ের দিন সকালবেলায় তিনজনে মিলে মেয়েকে আপাদমস্তক নাইয়ে নতুন সাদা কাপড় দিয়ে মেয়ের পা বেঁধে দেয়; পদ্ম নিজের সুগন্ধি বাদাম তেলে মেয়ের দেহ-চর্বিত করে। তারপর মেয়েকে তার বাপের বাড়ির পোশাক পরানো হয়। সাদা রেশমের ফুল-তোলা

অন্তর্বাস মেয়ের কুমারী-দেহ আবৃত করে, তার উপর ভেড়ার কোমল কোঁকড়ানো পশমের কোট পরিয়ে লালরঙের সাটিনের বিয়ের জামা পরিয়ে দেয়। কপালে শুভ্র চূর্ণ ঘষে কৌমার্যের প্রতীক ভ্রূর উপর নুয়ে-পড়া ঝালরের মতো কেশগুচ্ছ পিছনে টেনে ফিতা দিয়ে নিপুণ হাতে বেঁধে কপালটাকে সুপ্রশস্ত করে তোলে। মুখাবয়বের প্রসাধন শেষ করে তুলি দিয়ে নিপুণ হাতে ভ্রূদুটো টেনে দিয়ে মাথায় কনের মুকুট আর পুঁতি-বসানো অবগুণ্ঠন পরিয়ে দিয়ে ফুলতোলা জুতো পরিয়ে দেয়। রক্তরাগে নখাগ্র রাঙিয়ে হাত সুরভিত করে তারা কনে সাজানোর পালা শেষ করে দেয়। মনের অতল গহনে পূর্ণ সম্মতি থাকা সত্ত্বেও কনে প্রসাধনের ব্যাপারে অনিচ্ছা আর লজ্জা প্রকাশ করে। নববধূর পক্ষে এটাই শোভন।

ওয়াঙ লাঙ, তার বাপ, তার চাচা, আর মেহমানের দল মাঝঘরে বসে প্রতীক্ষা করে। এ ঘরেই বিয়ের মজলিশ। কনে তার দাসী আর ওয়াঙের চাচির উপর ভর দিয়ে নববধূসুলভ আনতচোখ লজ্জা-কুণ্ঠিত পদক্ষেপে এ ঘরে প্রবেশ করে। এ বিয়েতে যেন ওর মত নেই এমনি অনিচ্ছুক তার গতি। এই লজ্জা-নম্রতা ওয়াঙের ভালো লাগে। সে আপনমনে ভাবে : ভালো বউ বটে।

তারপর আসে ওয়াঙের বড়ছেলে, নাঙ এন। পরে তার সেই লাল চাপকান আর কালো কোট। মাথায় চুল পরিপাটি, সদ্য-কামানো মুখমণ্ডল। তার পিছনে তার ছোটভাই দুটি। এই সুদর্শন আত্মজদের মিছিল দর্শনে গর্বে ওয়াঙের মন নৃত্য করে। এরাই তো তার বংশধারাকে দেহ থেকে দেহান্তরে প্রবহমান রাখবে। তার বুড়ো পিতা যেন এতক্ষণ ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি। মাঝে মাঝে কথার টুকরো তার কানে প্রবেশ করেছে মাত্র। এবার সহসা যেন ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বারবার চেঁচিয়ে ওঠে :

"বিয়ে হচ্ছে! বিয়ে মানেই তো সন্তান, সন্তানের সন্তান।"

বুড়োর উচ্ছ্বসিত হাসিতে সমবেত সবাই হেসে ওঠে। ওয়াঙ ভাবে, আজকের দিনে ওলান সুস্থ থাকলে, উৎসবানন্দে কোনো ফাঁক থাকত না।

ওয়াঙের গোপন দৃষ্টি ছেলের পানে নিবদ্ধ। ছেলে মেয়ের পানে তাকায় কিনা তাই সে লক্ষ করে। বর নববধূর পানে অপাঙ্গ দৃষ্টি হানে। বরের চোখেমুখে খুশি উপচে ওঠে। যাক, বউ ছেলের মনমতো হয়েছে। তার মনে গোপন গর্ব জাগে:

"তাহলে, ছেলের মনের মতো বউ-ই এনেছি।"

বর-কনে মিলে এবার প্রথম ওয়াঙের বুড়ো বাপকে, তারপরে ওয়াঙকে সালাম করে ওলানের ঘরে যায়। তাকেও আজ কালো দামি কোটটা পরানো হয়েছে। তার ঘরে ঢুকতেই ওলান উঠে বসে। তার গণ্ডদ্বয় সুখানন্দে রক্তিম হয়ে ওঠে। ওয়াঙ ভুল করে ভাবে এ রক্তিমাভা বুঝি স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সে আনন্দাতিশয্যে চেঁচিয়ে ওঠে, "এবার ও ভালো হয়ে যাবে।"

ছেলে আর বউ তাকে সালাম করতেই সে তার বিছানা দেখিয়ে দিয়ে বলে :

"এখানে বসে তোমরা দুজন আমার চোখের সামনে বিয়ের পানীয় আর অন্ন গ্রহণ করো, আমি নিজের চোখে দেখে যেতে চাই। আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। আমি চলে গেলে এই বিছানায়ই তোমরা দুজনে শোবে।

বর-কনে সলজ্জভাবে নিঃশব্দে পাশাপাশি বসে। ওলানের কথায় কেউ সাড়া দেয় না। ওয়াঙের স্থূলাঙ্গিনী চাচি ব্যস্তত্রস্ত হয়ে দুই বাটি উষ্ণ পানীয় নিয়ে হাজির হয়। বর-কনে প্রথম দু'বাটি থেকে আলাদাভাবে পান করে, তারপর দুই বাটির সবটুকু একসাথে মিশিয়ে পান করে। এবার তারা প্রথম আলাদা আলাদা অন্ন গ্রহণ করে, পরে দুজনের অন্ন একত্র মিশিয়ে গ্রহণ করে। এই পানীয় আর অন্নের মিশ্রণ তাদের দুটি সত্তার অভিন্ন হয়ে মিশে যাওয়ার প্রতীক।

এমনি করে তাদের বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। তারপর আবার ওলান ও ওয়াঙকে সালাম করে বেরিয়ে গিয়ে সমবেত মেহমানদের অভিবাদন জানায়।

এবার ভোজন-পর্ব শুরু হয়। ঘর আর আঙিনায় টেবিল সাজানো হয়েছে। খাদ্যবস্তুর গন্ধে আর হাসি-কোলাহলে বাড়ি মুখরিত হয়ে উঠেছে। বহু দূর-দূরান্তর থেকে অভ্যাগতরা এসেছে। যারা রবাহূত তারা জানে ওয়াঙ ধনবান। বিয়ে উপলক্ষে সেখানে খাবার অভাব হবে না। কোকিলা শহর থেকে বাবুর্চি এনেছে। এমন অনেক ভালো দামি খাবার তৈরি হয়েছে—সাধারণ চাষির বাড়িতে যা হয় না। বাবুর্চির দল সগর্বে দাগ-পড়া এপ্রন গায়ে দিয়ে খাদ্যবস্তুর ঝুড়ি নিয়ে সাগ্রহে ছুটোছুটি করে। মেহমানের দল যে যত পারে খায়, প্রাণভরে খেয়ে তুষ্ট হয়।

ওলান ঘরের সব দরজা খুলে পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। সে নিজের কানে হাস্যকোলাহল শুনতে চায়, খাদ্যের ঘ্রাণ শুঁকতে চায়। বারবার ওয়াঙ দেখতে আসে ও কেমন আছে। ওলান তাকে বারবার প্রশ্ন করে :

"সবাই পুরো পেট খেয়েছে তো? মিঠে পোলাওয়ের পাত্রটা মাঝামাঝি সময়ে দেওয়া হয়েছে তো? তাতে বেশ করে চর্বি, চিনি আর আট রকমের ফল দেওয়া হয়েছে তো?"

তার ইচ্ছামাফিক সব হয়েছে জেনে ওলান তৃপ্তিতে শুয়ে বাইরের কলরব শোনে।

ভোজনপর্ব শেষে মেহমান-দল একে একে বিদায় নেয়। বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে যায়, রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে। বাড়ির কলরব-মুখরতা আর উৎসবানন্দ থেমে যাওয়ার সাথে সাথে ওলানের উপরও অবসাদ আর দুর্বলতা নেমে আসে। নবদম্পতিকে কাছে ডেকে বলে :

"আমার কোনো সাধ অপূর্ণ নেই, এবার আমি তৃপ্তি নিয়ে মরতে পারব। খোকা, তোমার বাপ আর দাদুকে দেখো! বউ, তোমার স্বামীর সেবা কোরো, শ্বশুর আর দাদাশ্বশুরের যত্ন কোরো, আর দেখো আমার ওই হতভাগী বোবা মেয়েটাকে, আর কারো প্রতি তোমার কোনো কর্তব্য নেই।"

শেষ কথাটা সে পদ্মকে লক্ষ করে বলে, এরপরেই সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আবার কথা বলার জন্য যেন সে জেগে উঠে। কেউ তার কাছে আছে কিনা

সে-কথা সে ভুলে যায়। তার চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে গেছে, সে মাথাটা এদিক-ওদিক হেলিয়ে বিড়বিড় করে চোখ বন্ধ করে বিকারগ্রস্তের মতো প্রলাপ বকে :

"আমি কুরূপা হলেও আমি সন্তানের জননী; আমি দাসী হলেও আমার পুত্রসন্তান রয়েছে।" তারপর সহসা জোরে বলে ওঠে, "আর ওটা আমার স্বামীকে আমার মতো খাওয়াতে, যত্ন করতে পারবে কেমন করে?'

বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে ওলান প্রলাপ বকে। ওয়াঙ সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করে। একলা তার শয্যাপার্শ্বে বসে তাকে দেখে, তার প্রলাপ শোনে। এ মুহূর্তেও মৃত্যুপথযাত্রিণীর মুখখানা তার কাছে কদর্য মনে হচ্ছে ভেবে, আত্মধিক্কারে মন আর বিষিয়ে উঠে। ওলান একবার বিস্ফারিত চোখ মেলে চারদিকে তাকায়। চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা আবছা কুয়াশার আবরণ। সে নিষ্পলক চোখে ওয়াঙের পানে তাকায়। সে যেন ওয়াঙকে আর চিনতে পারে না। অপরিচয়ের আবরণে যেন তার দৃষ্টিপথ আবৃত হয়ে আছে।

সহসা ওলানের মাথাটা বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়ে। একবার দেহটা কেঁপে উঠে স্থির হয়ে যায়।

মৃত ওলানের নৈকট্য ওয়াঙ সহ্য করতে পারে না। সে তার চাচিকে ডেকে শেষ-কৃত্যের জন্য মৃতদেহটাকে গোসল দিতে বলে। গোসল শেষ হলে সে নিজে কাছে না গিয়ে তার চাচি, ছেলে আর ছেলের বউকে দিয়ে দেহটা উঠিয়ে কফিনে পুরে ফেলে। এই হারানোর দুঃখ ভুলে থাকার জন্য সে নিজকে ব্যস্ত রাখে।

রীতি অনুসারে কফিন সিল করার জন্য সে শহরে লোক আনতে যায়। এক গণকঠাকুরের কাছে গিয়ে কফিন দাফনের একটা শুভদিন জেনে নেয়। তিন মাস পর একটা শুভদিন ধার্য হয়। ওয়াঙ গণকঠাকুরের প্রাপ্য দিয়ে এবার শহরের মন্দিরে গিয়ে পুরুতের সাথে দর-কষাকষি করে কফিনটা তিন মাস রাখার জন্য একটু জায়গা ভাড়া করে। সেখানে কফিনটা তিন মাস থাকবে। বাড়িতে তিনটি মাস তার চোখের সামনে কফিনটা থাকবে, ওয়াঙ তা সহ্য করতে পারবে না।

ওয়াঙ মৃতের প্রতি কর্তব্য পালনে এতটুকু ত্রুটি হতে দেয় না। বাড়ির প্রত্যেককে শোকচিহ্ন ধারণ করতে হয়। পুরুষের পরতে হয় মোটা সাদা কাপড়ের জুতো, তাদের গোড়ালিতে বাঁধতে হয় সাদা কাপড়ের ফিতে। মেয়েদের চুল বাঁধতে হয় সাদা ফিতে দিয়ে।

যে-ঘরে ওলান শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেছে, সে-ঘরে থাকাটা ওয়াঙ সহ্য করতে পারে না। সে তার সবকিছু নিয়ে পদ্ম'র মহলে চলে যায়। বড়ছেলেটাকে ডেকে বলে :

"যে-ঘরে তোমার মা বাস করেছে, যে-ঘরে তোমার মা তার সন্তান প্রসব করেছে, আজ থেকে সে-ঘরে তুমি তোমার বউ নিয়ে বাস করবে। সে-ঘরেই তোমাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করুক।"

ছেলে-বউ খুশি হয়ে সে-ঘরে উঠে যায়।

যে-বাড়িতে একটা মৃত্যু ঘটেছে সে-বাড়ি থেকে মৃত্যু যেন বিদায় নিতে পারে না। এবার আসে ওয়াঙের বুড়ো বাপের মৃত্যু। ওলানের দেহ কফিনে রাখতে দেখার পর থেকেই বুড়ো কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এক রাত্রে খাওয়াদাওয়া করে বুড়ো ঘুমোতে গেল। পরদিন সকালে ছোটমেয়ে তার চা নিয়ে গিয়ে দেখে বুড়োর শক্ত দেহটা বিছানায় পড়ে আছে। মাথাটা বালিশের পিছনে এলিয়ে পড়া, খোঁচা-খোঁচা দাড়িগুলো আকাশমুখো।

এ দৃশ্য দেখে খুকি চিৎকার করতে করতে বাপের কাছে ছোটে। ওয়াঙ এসে দেখে, তার বাপের হালকা কৃশ-দেহ রিক্তপত্র গ্রন্থিবহুল পাইনগাছের মতো শক্ত হয়ে পড়ে আছে। অনেকক্ষণ আগে মরেছে—হয়তো শোয়ার পরক্ষণেই। ওয়াঙ বুড়ো বাপের দেহ নিজেই গোসল করিয়ে কোমল হাতে কফিনে পুরে রাখে, সিল করিয়ে নেয়। আপনমনে বলে :

"দুটো মৃতদেহ একদিনেই দাফন করা হবে। একটুকরো পাহাড়ি জমি বেছে, সেখানেই দুজনকে দাফন করব। আমি মরলে, আমার দেহও সেখানেই দাফন হবে।"

তার কথামতোই সব হল। বুড়োর কফিন সিল হয়ে গেলে ওয়াঙ কফিনটা মাঝঘরে দুটো বেঞ্চের উপর রেখে দেয়। নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত ওটা সেখানেই থাকে। ওয়াঙের মনে হয়, তার বাপের মৃত আত্মা সেখানেই শান্তি পাবে, সে-ও তার বাপের নৈকট্য অনুভব করে। এই অনুভূতি হারানোর বেদনাকে লাঘব করে দেয়। বাপের মৃত্যুতে তার দুঃখ হয়নি। বাপ তো বহুদিন বেঁচেছে এবং এ কয় বছর তো আধমরা হয়েই পড়েছিল। তার দুঃখ হয় বাপের নৈকট্য হারিয়ে বাপের বিচ্ছেদে।

বসন্তের মাঝামাঝি দাফন-ক্রিয়ার নির্দিষ্ট দিন আসে। ওয়াঙ 'তাও' মন্দিরের পুরোহিতদের ডেকে আনে—হলদে পোশাক-পরা; দীর্ঘকেশ মাথার উপর চুড়ো করে বাঁধা। বৌদ্ধমন্দিরের পুরোহিতের দল আসে—দীর্ঘ গৈরিক আলখাল্লা পরা; মুণ্ডিত মস্তকে নয়টি রেখার পবিত্র চিহ্ন আঁকা। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পুরোহিতের দল সারারাত মৃতের আত্মার শান্তি-সদ্‌গতির জন্য মন্ত্র পাঠ করে। মন্ত্রপাঠ বন্ধ করলেই ওয়াঙ তাদের হাতে টাকা গুঁজে দেয়। তারা দম নিয়ে আবার মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করে, সকাল পর্যন্ত এমনি মন্ত্রপাঠ চলে।

ওয়াঙ লাঙ নিজের জমিতে খেজুরগাছের নিচে একটা উঁচু ঢিবি বেছে নেয়। চিঙ দুটো কবর খুঁড়িয়ে চারদিকে মাটির পাঁচিল উঠিয়ে দেয়। এই মাটির পাঁচিলের মাঝখানে অনেক জায়গা পড়ে থাকে ওয়াঙের দেহ দাফনের জন্য— তার পরিবারের আগত অনাগতদেরকে কবর দেওয়ার জন্য। জমিটা গম-ফসলের জন্য খুব ভালো, কিন্তু ওয়াং সানন্দে এ জমিটা ছেড়ে দেয়। আপন মাটিতে তার পরিবারের প্রতিষ্ঠা—স্থিতি আর লয়, এ জমিটা তারই স্বাক্ষর বহন করবে। জীবনে-মরণে এ পরিবার আপন মাটি আঁকড়ে ধরে থাকবে; এ পরিবারের আভিজাত্য এখানেই।

পুরোহিতদের মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হলে, বাড়ির সকলে এবার শোক-পোশাক পরে— সাদা মোটা কাপড়ের পোশাক। শহর থেকে বাড়ির সবার জন্য সিডান চেয়ার আনা হয়। গরিব-সাধারণের মতো পায়ে হেঁটে সমাধিস্থলে যাওয়া তাদের মানায় না। জীবনে এই প্রথম ওয়াঙ সিডান-চেয়ারে বসে। ওলানের কফিনের পিছনে প্রথম ওয়াঙ, আর তার বাপের কফিনের পিছনে প্রথম তার চাচা। যে পদ্ম ওলানের জীবদ্দশায় কোনোদিন তার সামনে আসতে পারেনি, সে-ও একটা চেয়ারে বসে শবদেহের অনুসরণ করে— যাতে লোকে বলে যে, স্বামীর প্রথমা স্ত্রীর প্রতি সে যথারীতি সম্মান দেখিয়েছে। সবার সাথে ওয়াঙ তার হাবা মেয়েটাকে শোক-পোশাক বানিয়ে দিয়েছে। ওর জন্যও চেয়ার এনেছে, এ মেয়েটা কিছুই বোঝে না, সে কেবল কর্কশকণ্ঠে হাসে।

কেঁদে কেঁদে বিলাপ করে মিছিল কবরস্থানের পানে চলে। চিঙ আর জনমজুরেরাও সাদা জুতো পায়ে মিছিলের পিছনে যায়। ওয়াঙ দুটো কবরের পাশে দাঁড়ায়। বাপের কফিনটা আগে কবরে স্থাপন করা হয়। ওয়াঙ দাঁড়িয়ে কফিনদুটোকে কবরে স্থাপন পর্যবেক্ষণ করে। সে অন্যের মতো কাঁদে না, তার চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। সে ভাবে, যা হবার হয়েছে। তার কর্তব্য সে সমাধা করেছে।

কবরের উপর মাটি দিয়ে উপরটা পরিপাটি করা হলে সে তার চেয়ারটা বিদায় করে দিয়ে একলা পায়ে হেঁটে চলে। তার ব্যথাক্লিষ্ট মনে বারবার একটা অদ্ভুত ব্যথাই সব ব্যথাকে ছাপিয়ে ওঠে; তার মনকে আরও ব্যথিয়ে তোলে। ওলান যেদিন পুকুরে কাপড় কাচছিল, সেদিন সে যদি ওলানের কাছ থেকে সেই মুক্তোদুটো না নিত! কেন সে মুক্তোদুটো নিল! সে পদ্মকে আর মুক্তোদুটো পরতে দেবে না।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে একলা পথ চলতে চলতে সে আরও ভাবে :

"এই মাটিতে আমার জীবনের ভালো অর্ধেক—হয়তো আরো বেশি, সমাধিস্থ হয়ে রইল। মনে করব, আমার সত্তার অর্ধেক এইখানে রয়ে গেল, বাকি অর্ধেক যা রইল তা হবে একবারে ভিন্ন; আমার জীবন হবে আগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।"

এবার সহসা তার চোখ ফেটে অশ্রু বেরিয়ে পড়ে। ছেলেমানুষের মতো হাতের পিছনদিকটা দিয়ে চোখের পানি মুছে ফেলে সে।

সাতাশ

বাড়িতে দু-দুটো মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আর ছেলের বিয়ের উৎসব আয়োজন নিয়ে ওয়াঙ এতদিন এমনি ব্যস্ত ছিল যে, জমিজমার খোঁজ-খবর নেবার ফুরসৎ পায়নি। একদিন চিঙ এসে বলে :

"এবার যখন মৃত্যুশোক আর বিয়ের উৎসবানন্দ শেষ হয়েছে, তখন ক্ষেতখামার সম্বন্ধে তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।"

"বলো!" ওয়াঙ বললে, "এতদিন আমার যে কিছু জোত-জমি আছে, সে-কথাই আমি ভুলে গেছলাম, আমার পরলোকগত স্বজনদের দাফন-কাফন নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।"

ওয়াঙের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত চিঙ সম্ভ্রমে চুপ করে থাকে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে :

"উপরওয়ালা যেন না করেন, মনে হচ্ছে এবার ভয়ংকর বন্যা হবে। গ্রীষ্মকালও আসেনি, ইতিমধ্যেই পানিতে মাঠে সয়লাব হয়ে গেছে।"

ওয়াঙ লাঙ রেগে বলে :

"স্বর্গের ঐ বুড়োর কাছ থেকে যদি কোনোদিন কোনো উপকার পেয়ে থাকি। ও বেটাকে পুজো দাও আর না দাও, বেটা নষ্টামি করবেই। এসো একবার ক্ষেতখামার দেখে আসি।" এই কথা বলেই ওয়াঙ উঠে দাঁড়ায়।

চিঙ বড় ভীতু-ভীরু মানুষ। সময় যত খারাপই হোক, ওয়াঙের মতো উপরওয়ালাকে গালাগালি করতে তার সাহস হয় না। সে শুধু বলে, "উপরওয়ালার ইচ্ছা!" অনাবৃষ্টি আর অতিবৃষ্টি সবকিছু সে বিনা-প্রতিবাদে মেনে নেয়। ওয়াঙ লাঙ কিন্তু এমন নিরীহ প্রকৃতির নয়। সে তার ক্ষেতখামার ঘুরে দেখে। চিঙ ঠিকই বলেছে। হোয়াঙদের কাছ থেকে কেনা খাতের পাড়ের জমিগুলো নিচু থেকে পানি চুষে কাদা হয়ে গেছে, তাই ক্ষেতের গম-চারাগুলো আধমরা আর হলদে।

খাতটা হ্রদের মতো আর খালগুলো রীতিমতো নদীর মতো হয়ে গেছে। স্রোতে আবর্ত উঠছে। একটা বোকাও বুঝতে পারে যে, গ্রীষ্মের বৃষ্টিপাতের আগেই যখন এ-অবস্থা তখন বন্যা অবশ্যম্ভাবী। মানুষ এবার না-খেয়ে মরবে। ওয়াঙ নিজের জমিগুলো ছুটে ছুটে দেখে আর চিঙ ছায়ার মতো তাকে অনুসরণ করে। তারা দুজন মিলে একটা হিসেব করে কোন্ জমিতে ধানের চারা রোপণ করা চলবে, আর কোন্ জমিগুলো চারা রোপণের আগেই ডুবে যাবে। খালগুলো কানায় কানায় ভরা দেখে ওয়াঙ গালাগালি করে বলে :

"স্বর্গের বুড়ো বেটা উপরে বসে তামাশা দেখবে, কে ডুবে আর কে অনাহারে মরে, ও বেটা এতেই আনন্দ পায়।"

কথাগুলো ওয়াঙ রেগে চেঁচিয়ে বলে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিঙ বলে :

"শত হোক, তিনি আমাদের চেয়ে মহান আর শক্তিধর। তাকে অমন করে গালি দিও না।"

কিন্তু ওয়াঙ ধনী, দেবতার পরোয়া সে করে না। সে রেগে আগুন হয়ে যায়। ফিরতি পথে তার এমন জমি আর এত ভালো ফসলগুলো পানিতে ডুবে গেছে বলে সে বকাবকি করে।

ওয়াঙ যা আশঙ্কা করেছিল শেষপর্যন্ত তাই হল। বান এল, উত্তরাঞ্চলের নদীটার বাঁধ ভেঙে গেল। গ্রামবাসীরা বাঁধ মেরামতের জন্য পাগলের মতো ছুটোছুটি

করে চাঁদা সংগ্রহ করতে লাগল। প্রত্যেকেই আপন সাধ্যমতো চাঁদা দিল। কারণ এতে প্রত্যেকেরই স্বার্থ জড়িত রয়েছে। টাকা উঠিয়ে তারা জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে আমানত রাখল। এ লোকটা গরিবের ছেলে; এত পয়সা কোনোদিন একসাথে দেখেনি। নতুন কাঁচা-মানুষ; বাপের টাকার জোরে ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে। আবার জোরে বন্যার পানি আসতেই গ্রামবাসীরা একজোটে হৈ-হৈ করে ম্যাজিস্ট্রেটের গড়িমসি দেখে তার বাড়িতে ধন্না দেয়। ম্যাজিস্ট্রেট গা ঢাকা দেয়। কারণ সে সংগৃহীত তিন হাজার ডলার বাঁধ-মেরামতের কাজে না-লাগিয়ে নিজের কাজে খরচ করে ফেলেছে। গ্রামবাসীরা মারমুখো হয়ে তার বাড়ি চড়াও করল। তারা ম্যাজিস্ট্রেটকে খুন করে ফেলবে। সে তার মৃত্যু অবধারিত জেনে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরল। তার অপমৃত্যুতে গ্রামবাসীদের ক্রোধ প্রশমিত হল।

কিন্তু টাকা আর ফিরে পাওয়া গেল না। নদীর বাঁধ কাটার পর একটা একটা করে ভেঙে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নদীর পানি ফেঁপে-ফুলে অবাধ বিস্তৃতি পেয়ে ক্ষেতখামার ভাসিয়ে দেয়। গমক্ষেত ধানের চারা অথৈ সাগরের তলে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে গ্রামগুলো দ্বীপের মতো ভাসতে থাকে। অসহায় গ্রামবাসীদের চোখের সামনে পানি বেড়ে চলে। পানি তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছলে তারা তাদের তক্তপোশ ও টেবিল একত্র বেঁধে তার উপর দরজার পাল্লা স্থাপন করে ভেলা বানিয়ে নেয়। তারপর ভেলার উপর তাদের নারীশিশু এবং সম্পত্তির যতটুকু সম্ভব উঠিয়ে দিয়ে রক্ষা করতে চেষ্টা করে।

একদিন বন্যার পানিতে তাদের বাড়িঘরের মাটির পাঁচিল ভিজে নরম হয়ে পানির বুকে ধসে পড়ে। মর্তের পানির টানে আকাশের পানি বৃষ্টির-ধারা হয়ে নেমে আসে অঝোর-ঝোরায়।

ওয়াঙের বাড়িটা উঁচু টিলার উপর অবস্থিত বলে বন্যার পানি তার বাড়িটা এখনও ছুঁতে পারেনি। সে তার দোরগোড়ায় বসে বন্যার পানির অসীম বিস্তৃতি দেখে। বন্যার পানি তার ক্ষেতখামার ডুবিয়ে দিয়েছে, তার প্রিয়জনের কবর দুটো আবার ডুবিয়ে দেয় কি না, তাই সে লক্ষ করে। যদিও কাদা-মাখা ঘোলাটে পানির ক্ষুধিত-তরঙ্গ বারবার কবরের নিম্নপ্রান্তে আছড়ে ভেঙে পড়ে।

ফসলের নাম-নিশানা কোথাও নেই। অনাহার-জর্জরিত মানুষ দুর্ভিক্ষের পুনঃপ্রাদুর্ভাবে নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলেপুড়ে মরে। কেউ দক্ষিণাঞ্চলে চলে যায়। সাহসী যারা তারা ক্রোধে মরিয়া হয়ে ডাকাতদলে যোগ দেয়। ডাকাতের দল গ্রামাঞ্চলে অবাধ লুটতরাজ চালায়। তারা শহরও বাদ দেয় না। শহরবাসীরা একমাত্র পশ্চিম ফটকে সৈন্য মোতায়েন রেখে অন্যান্য ফটকগুলো তালাবদ্ধ করে আপনগৃহে বসে দিন কাটায়। দক্ষিণের যাত্রী আর ডাকাতদলে যোগদানকারীদের ছাড়া রয়েছে বয়োবৃদ্ধ ক্লান্ত ভীরুর দল। ভবিষ্যৎ আশাভরসাহীন, পুত্রসন্তানহীন চিঙের মতো লোক। তারাই শুধু আপন মাটি আঁকড়ে রইল। তারা উপোস করে, উঁচু

পাহাড়টিলা থেকে ঘাস-পাতা কুড়িয়ে এনে খায়; অনাহারে জলে-ডাঙায় ধুঁকে ধুঁকে প্রাণত্যাগ করে। কেউ তাদের খোঁজ রাখে না।

ওয়াঙ উপলব্ধি করে আরও ভয়ংকর হয়ে দেখা দেবে এ দুর্ভিক্ষ। সময়মতো বন্যার পানি নামে না। শীতের গম বোনা হয় না। সুতরাং আগামী মওসুমেও ঘরে ফসল উঠবে না। তাই সে বাড়ির খরচপত্র সম্বন্ধে সাবধান হয়, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আর আগের মতো অকৃপণ হাতে খরচ করে না। কোকিলার সাথে কথা-কাটাকাটি করে; কারণ সে এখনও রোজ শহর থেকে গোশ্‌ত কিনে আনে। শেষপর্যন্ত শহরে যাওয়ার পথ ডুবে গেলে, ওয়াঙ খুব খুশিই হয়। নৌকা ছাড়া শহরে যাওয়া চলে না; আর ওয়াঙের হুকুম ছাড়া নৌকার দড়ি কেউ খুলতে পারে না। কোকিলা চিঙের সাথে নৌকার জন্য ঝগড়াঝাঁটি করে, চিঙকে গালি দেয়; কিন্তু টলাতে পারে না।

বেচাকেনাও ওয়াঙের হুকুম ছাড়া হয় না। তার যা আছে, সে তা নিজের হাতে ব্যবস্থা করে। রোজকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজহাতে ছেলের বউকে দেয়। জনমজুরদের প্রয়োজনীয় খাবারের জিনিসপত্র সে চিঙের হাতে তুলে দেয়। এই জনমজুরদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হয় বলে তার দুঃখ হয়। শেষপর্যন্ত শীতকালে সে মজুরদের বিদায় করে দেয়। তাদের বলে দেয়, দক্ষিণে গিয়ে বসন্তকাল পর্যন্ত ভিক্ষে করে বা মজুরি করে নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে। এমনি করে সে তাদের আর বসিয়ে খাওয়াতে পারবে না। বসন্তকালে মনে চাইলে আবার এসে তার কাজে লাগতে পারে। লুকিয়ে পালিয়ে সে পদ্মকে চিনিটা, তেলটা দেয়। কারণ দুঃখ-কষ্টের জীবনে এ বেচারি অভ্যস্ত নয়। নববর্ষোৎসবটাও সে খুব সংক্ষেপে সেরে ফেলে। নিজেদের ধরা একটা মাছ আর একটা পোষা শুয়োর দিয়েই উৎসবটা শেষ করে।

তবে বাইরে যতটা দেখাতে চায়, ওয়াঙ লাঙ ততটা দরিদ্র নয়। তার ছেলে-বউ যে-ঘরে থাকে, সে-ঘরের দেওয়ালের গর্তে সে যথেষ্ট টাকা লুকিয়ে রেখেছে। অবশ্য তার ছেলে-বউ তা জানে। তা ছাড়া একটা কলসি-ভর্তি রুপো, এমনকি সোনাও লুকানো রয়েছে বাঁশঝাড়ের নিচে আর মাঠের ডোবার তলায়। গত বছরের উদ্বৃত্ত ফসলও রয়েছে, সে ফসল সে বাজারে ছাড়ে। তার বাড়িতে অনাহারের আশঙ্কা নেই।

কিন্তু তার চারদিকে বুভুক্ষের দল রয়েছে। তার মনে পড়ে, হোয়াঙ-মঞ্জিলের ফটকে সে একবার বুভুক্ষ জনতার সর্বনাশা সংহার-মূর্তি দেখেছিল। সে জানে তার নিজের এবং সন্তানদের পেটে দেওয়ার মতো যথেষ্ট খাদ্যসম্ভার আছে। এজন্য তার বিরুদ্ধে অনেকের আক্রোশ রয়েছে, তাই সে বাড়ির ফটক অহোরাত্র অর্গল-বন্ধ রাখে। পরিচিত জন ছাড়া কাউকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেয় না। এ সম্বন্ধে সে অবহিত যে, কেবল বদ্ধ-অর্গল তার ধনপ্রাণ রক্ষা করতে পারত না, তার চাচার দৌলতেই সে এখনও জান-মাল নিয়ে টিকে আছে। নইলে কবে ডাকাতের দল

তাকে শেষ করে তার টাকা-পয়সা লুটে নিত। বাড়ির মেয়েদের মান-ইজ্জত নষ্ট করত। তাইতো সে তার চাচি চাচা আর তাদের বদমায়েশ ছেলেটার সাথে ভদ্র ব্যবহার করে। এই তিনজন তো তার বাড়িতে রীতিমতো সম্মানিত মেহমানের হালে আছে। তাদের পানাহার বাড়ির সবার আগে সরবরাহ হয়।

এই তিনজন জানে যে, ওয়াঙ তাদের ভয় করে; তাই তারা উদ্ধত হয়ে ওঠে। তারা যখন-তখন যা-তা দাবি করে বসে, খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে নালিশ করে; বিশেষ করে ধুমসি মাগীটা তো তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। ভিতরমহলের চর্ব-চুষ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে সে তার স্বামীর কাছে নালিশ করে। তাদের নালিশের আর অন্ত নেই।

ওয়াঙ লাঙ বোঝে, তার চাচা বুড়ো হয়ে গেছে, নড়াচড়া কাজকর্ম পছন্দ করে না। নিজের প্রয়োজন মিটলে নালিশও করতে চায় না। তবে তার ধুমসি স্ত্রী আর গুণধর ছেলেটাই তাকে তাতিয়ে দেয়। একদিন ফটকে দাঁড়িয়ে ওয়াঙ শুনতে পায় এই দুজন তার চাচাকে বলছে :

"তার টাকা আছে, খাবার আছে, এই তো সুযোগ। তার কাছে টাকা-পয়সা দাবি করি না কেন?" বুড়ি বলে, "এমন সুযোগ আর আসবে না— বলে দিলাম। সে জানে তুমি তার বাপের ভাই চাচা না হলে, কবে ডাকাতের দল তার বাড়িঘর লুট করে সাবাড় করে দিয়ে যেত। একখানা ইটও থাকত না। তুমি লাল দেড়ে দলের সর্দার বলেই তো সে বেঁচে যাচ্ছে।"

এই কথা কানে আসতেই ওয়াঙ রাগে ফেটে পড়তে চায়, কিন্তু অনেক কষ্টে রাগ সামলে এদের নিয়ে কী উপায় করা যায়, তাই ভাবে। কিন্তু কোনো পথই সে খুঁজে পায় না। পরদিন তার চাচা এসে যখন বলল, "ওহে ভাইপো, কিছু টাকা চাই যে! আমার পাইপ আর তামাক কিনতে হবে; তোমার চাচিরও জামা ছিঁড়ে গেছে, একটা নতুন জামা না হলে আর চলছে না।" তখন অসহায় ওয়াঙ এর প্রতিবাদ করতে পারল না। ভালো ভাইপোর মতো পাঁচটি ডলার কোমর থেকে বের করে বুড়োর হাতে তুলে দিল। মনে মনে দাঁত কামড়াল শুধু। জীবনের দুর্দিনেও কাউকে টাকা দিতে তার এত কষ্ট হয়নি।

দুদিন পরেই তার চাচা আবার এসে টাকা চাইল। ওয়াঙ রাগে চেঁচিয়ে উঠল :

"এমনি করলে, শেষপর্যন্ত কি সবাই না-খেয়ে মরব!"

তার চাচা নির্লিপ্ত হাসি হেসে বলে :

"তুমি তো বাছাধন স্বর্গসুখে আছে। তোমার চেয়ে কম-পয়সাওয়ালা অনেকে তাদের বাড়ির পোড়া কড়ি-বর্গায় ঝলসে ঝুলছে।"

এই কথা শুনে ওয়াঙের গা থেকে ঠাণ্ডা ঘাম দরদর করে ঝরতে থাকে। সে নিঃশব্দে চাচার হাতে টাকা দিয়ে দেয়। এরপর থেকে ওয়াঙের নিজের ঘরে গোশ্‌তের ব্যবস্থা নেই, অথচ এই তিনজনের জন্য নিয়মিত গোশ্‌তের ব্যবস্থা হচ্ছে; ওয়াঙের নিজের ভাগ্যে তামাক জুটে না, কিন্তু বুড়োচাচা দিনরাত দিব্যি পাইপ টেনে খাচ্ছে।

নাঙ এন এতদিন নবপরিণীতা স্ত্রীর নেশায় ডুবে ছিল, চারদিকে তাকাবার ফুরসৎ পায়নি। শুধু তার বউকে তার চাচাত ভাইয়ের লুব্ধদৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছে। এখন এ দুজনের পুরনো বন্ধুত্ব উঠে গিয়ে শত্রুতায় পর্যবসিত হয়েছে। সে তার স্ত্রীকে সন্ধ্যার আগে ঘর থেকে বেরোতে দেয় না; সন্ধ্যার সময় বুড়োর ছেলে বাপের সাথে বেরিয়ে যায় আর সারাদিন দুয়ার বন্ধ করে ঘরে চুপটি মেরে বসে থাকে। এই তিনজন মিলে তার বাপকে নাচাচ্ছে দেখে নাঙ এন-এর মেজাজ বিগড়ে যায়। একদিন সে বাপকে রেগে বলেই ফেলে :

"তুমি যদি তোমার ছেলে, তোমার ভাবী-নাতির মা, ছেলের বউ—এদের বাদ দিয়ে, এই তিন-তিনটে নরখাদকের ভাবনাই ভাবো; তবে আমাদের আলাদা ঘর-সংসার পাততে দাও।"

যে-কথা কাউকে কোনোদিন বলেনি, আজ ছেলেকে ওয়াঙ সব কথা খুলে বলে :

"আমি এদের দু চোখে দেখতে পারি না; কিন্তু এদের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় পাচ্ছি না। এই বুড়ো ডাকাতদলের সর্দার। এদের খাইয়ে-দাইয়ে যতদিন তুষ্ট রাখতে পারবে, ততদিনই আমরা নিশ্চিন্ত। তাদের উপর চোখরাঙানি চলবে না।"

একথা শুনে ছেলের চোখ তো ভয়ে বিস্ময়ে মাথা থেকে ঠিকরে পড়ে আর কী। কিন্তু কতক্ষণ এ নিয়ে ভেবে, সে আরও রেগে যায়। বাপকে বলে :

"আচ্ছা, একটা উপায় করলে হয় না? রাতের অন্ধকারে এদের পানিতে ঠেলে দিই! বুড়ি ধুমসিটাকে চিঙই ফেলে দিতে পারবে; তুমি বুড়োটাকে ঠেলে ফেলবে আর আমি ওই বদমায়েশ ছেলেটাকে ফেলব। এই বেটা আমার দুচোখের বিষ। বেটা কিনা সুযোগ পেলেই তোমার বৌমার উপর উঁকিঝুকি মারে।"

কিন্তু ওয়াঙকে দিয়ে খুনাখুনি হবে না; যদিও তার কাছে ভার বলদের চেয়ে তার চাচার জীবনের দাম অনেক কম। শত ঘৃণা করলেও খুন সে কাউকে করতে পারবে না। সে ছেলেকে বলে :

"বাপের ভাই চাচাকে পানিতে ডুবিয়ে মারতে পারলেও মারব না, অন্য ডাকাতরা এ-কথা ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে আমাদের কী দশা হবে? বুড়ো বেঁচে থাকলে বরং আমরা নিরাপদ। সে মরে গেলে আমরাও অন্যের মতো অসহায় হয়ে পড়ব।"

দুজনই নীরব। কী উপায় করা যায় তাই ভাবে। ছেলে বুঝতে পারে, তার বাপের কথাই ঠিক। এ দুর্দিনে মৃত্যুটা বড় সহজ, তবে এতে সমস্যার সমাধান হবে না। অন্য উপায় দেখতে হবে, অনেকক্ষণ ভেবে ওয়াঙ লাঙই বলে ওঠে :

"এমন একটা উপায় যদি বের করা যায় যাতে ওরাও এখানে থাকবে অথচ গোলমাল করতে পারবে না। কিন্তু এমন জাদুমন্ত্র তো নেই। তা হয় না।"

নাঙ এন সহসা হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠে :

"পেয়েছি, তোমার কথাতেই উপায় বের করেছি। এসো ওদের আফিম কিনে দিই; বেশি পরিমাণে দিই, যত খুশি খেয়ে বড়লোকের মতো আমেজ করুক। ওই

বদমায়েশ ছেলেটার সাথে আবার বন্ধুত্ব করে ওকে শহরের চা-খানায় নিয়ে গিয়ে চণ্ডু খাওয়াব আর বুড়োবুড়ির জন্য আফিম কিনে আনব।"

ওয়াঙ সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে বলে :

"কিন্তু এতে যে অনেক পয়সা খরচ। আফিম যে মণিমুক্তোর মতো দামি জিনিস।"

"কিন্তু এদের এমনি করে পুষতে যে মণিমুক্তোর খরচের চেয়ে বেশি খরচ হচ্ছে।" ছেলে তর্কচ্ছলে বাপকে বলে, "তা ছাড়া তাদের উদ্ধত ব্যবহার আর ওই বদমায়েশটার কুদৃষ্টি যে একেবারে অসহ্য!"

ওয়াঙ লাঙ তখ্খুনি রাজি হয় না। একে তো কাজটা খুব সহজ নয়, তা ছাড়া ঝুড়ি ঝুড়ি টাকাও এতে খরচ হবে।

বন্যার পানি না-নামা পর্যন্ত এ পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হত কি না সন্দেহ। সবকিছু হয়তো এমনিভাবে চলত, একটা ঘটনাই সবকিছু তরান্বিত করে দিল।

ওয়াঙের চাচার ছেলের কুদৃষ্টি ওয়াঙের ছোটমেয়ের ওপর পড়ে। সম্পর্কে এ মেয়েটা তারই আপন বোনের মতো। মেয়েটা অতি সুন্দরী। মুখের আদল ওর মেজোভাইয়ের মতো, তবে ছোট্টখাটো গড়ন আর গায়ের চামড়া ততটা হলদে নয়; বাদামফুলের মতো স্নিগ্ধ গৌরবর্ণ। নাক ছোট, ঠোঁট পাতলা, রক্তিম, আর পাদুটো সুন্দর ক্ষুদ্রাকৃতি।

সেদিন মেয়েটা রাত্রিবেলায় বাবুর্চিখানা থেকে উঠোন দিয়ে একলা আসছিল, এমন সময় চাচার ছেলে ওকে চেপে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে হাত দেয়। মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠতেই ওয়াঙ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাচার ছেলের মাথায় বেদম মারতে থাকে : সে মাংস-চোর কুকুরের মতো মার খাবে, কিন্তু মাংসের টুকরো মুখ থেকে কিছুতেই ছাড়বে না। অবশেষে ওয়াঙ মেয়েকে জোর করে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। নির্লজ্জটা এতেও হেসে বলে :

"এ তো ঠাট্টা করছিলাম, ওর সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক তাতে কি আমার কোনো বদ মতলব থাকতে পারে?" কিন্তু তার চোখে তখনও লালসার আগুন জ্বলছে। ওয়াঙ গজগজ করতে করতে মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে যায়।

রাতে ওয়াঙ ছেলেকে সব কথা বলতেই সে গম্ভীর হয়ে বলে :

"এবার ছোটবোনকে ওর শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত। ওর শ্বশুর হয়তো বলবে যে, দুর্ভিক্ষের বছর বিয়ে হতে পারে না। সে-কথা মানলে চলবে না। নরখাদক বাঘ বাড়িতে রেখে ওর কৌমার্য রক্ষা করা সম্ভবপর হবে না।"

ওয়াঙ লাঙ তাই করে। পরদিন শহরে গিয়ে লিউকে বলে :

"আমার মেয়ের বয়স এখন তেরো বছর। বেশ ডাগরটি হয়েছে, বিয়ের যোগ্য তো বটেই।"

লিউ ইতস্তত করে জওয়াব দেয় :

"এবার ব্যবসায় ভালো লাভ হয়নি, এ অবস্থায় সংসার খরচ বাড়ানো সম্ভব নয়।"

লজ্জায় ওয়াঙ বলতে পারে না, "বাড়িতে আমার এক চাচার ছেলে রয়েছে, মানুষ নয়, বন্য-জানোয়ার।" সে শুধু বলে :

"মা-মরা মেয়ের দায়িত্ব আমি বহন করতে পারছি না। সুন্দরী মেয়ে, বিয়ে হলে সন্তানের মা হবার মতো সোমত্থ হয়ে উঠেছে। আমার বাড়িটা প্রকাণ্ড; নানা ধরনের লোকজন রয়েছে। তাকে তো সবসময় আর আমি চোখে-চোখে রাখতে পারি না। ও যখন আপনার পরিবারভুক্ত হতে যাচ্ছে তখন ওর কৌমার্য রক্ষার ভার আপনার হাতেই থাকুক। যখন খুশি তখন আপনি বিয়ের অনুষ্ঠান সমাধা করবেন।"

দয়ার্দ্রচিত্ত ভালোমানুষ লিউ জওয়াব দেয়,

"তাই যদি হয় তবে মেয়ে আমার বাড়িতেই আসুক। আমি ছেলের মাকে বুঝিয়ে বলব। বউ এসে, তার শ্বাশুড়ির সাথে নিরাপদে এখানে থাকুক। আগামী ফসলতোলার পরই না-হয় বিয়ের অনুষ্ঠান হবে।"

ওয়াঙ সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

শহর-ফটকের কাছেই চিঙ তার জন্য নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তামাক-আফিমের দোকানের পাশ দিয়েই তার নৌকোতে যাওয়ার পথ। নিজের জন্য মাথা-তামাক কেনা তার দরকার ছিল। তামাক ওজন করার সময় ওয়াঙ দোকানিকে অকারণে প্রশ্ন করে :

"আফিমের দর কত?"

দোকানি জওয়াব দেয়—"খোলা-জায়গায় আফিম বেচা নিষিদ্ধ। যদি সত্যি কিনতে চাও তবে ঘরের পিছনে আফিম বিক্রি হয়। এক ডলার করে আউন্স।"

আর কিছু না-ভেবেই ওয়াঙ বলে :

"আমি ছয় আউন্স আফিম কিনব।"

আটাশ

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে ওয়াঙ মেয়ে সম্বন্ধে ভাবনামুক্ত হয়ে চাচাকে একদিন বলে :

"তুমি আমার বাপের সহোদর! তাই তোমার জন্য একটু ভালো তামাক নিয়ে এলাম।"

এই বলে ওয়াঙ আফিমের কৌটোটা খুলে ধরে। এঁটেল সুগন্ধি জিনিস। ওয়াঙের চাচা জিনিসটা হাতে নিয়ে শুঁকে, হেসে উল্লসিত হয়ে বলে :

"আগেও এ তামাক এক-আধবার খেয়েছি, তবে খুব কম। দামি জিনিস। বড় ভালো লাগে।"

ওয়াঙ তাচ্ছিল্যের সুরেই বলে :

"সামান্য একটু এনেছি মাত্র। শেষদিকে রাত্রে বাবার ঘুম হত না, তাই বাবার জন্য এনেছিলাম। আজ দেখলাম, এটুকু পড়ে আছে। ভাবলাম, বাবা নেই,

বাবার ভাই তো রয়েছে। নিজে না-খেয়ে তাকেই বরং দিয়ে দিই। আমার তো বয়েস হয়নি; সুতরাং এটার দরকার নেই। তোমার বয়েস হয়েছে, এটাতে তোমারই উপকার হবে, যখন ইচ্ছা হয় খেয়ো। আর গায়ে বুকে ব্যথা হলে এটা বেশ উপকারী।"

বুড়ো লোভীর মতো ওয়াঙের হাত থেকে কৌটোটা নেয়। কী চমৎকার গন্ধ! বড়লোকের বিলাস-উপকরণ। একটা পাইপ কিনে সে সারাদিন শুয়ে-শুয়ে টানে। ওয়াঙ এসব দেখে কয়েকটা পাইপ কিনে এখানে-ওখানে রেখে দেয়। নিজে টানার ভান করে। একটা মাত্র পাইপ ঘরের ভিতর অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখে। দামি বলে সে পদ্মকে আর তার ছেলেদের আফিম ছুঁতে দেয় না। কিন্তু বুড়োকে, বুড়োর বউ আর ছেলেকে সেধে-সেধে খাওয়ায়। আফিমের ধোঁয়ার মিষ্টি গন্ধ বাড়িময় ছড়িয়ে পড়ে। এই অর্থব্যয়ে ওয়াঙের দুঃখ হয় না। কারণ, এ অর্থের বদলে সে জীবনে শান্তি পায়।

শীতের শেষে বন্যার পানি নেমে যাচ্ছে। ওয়াঙ এখন তার ক্ষেতের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে পারে। একদিন ওয়াঙ মাঠে বেড়িয়েছে। এমন সময় তার বড়ছেলে পিছন থেকে এসে গর্বের সুরে বলে :

"তোমার সংসারে আর একটা খাবার মুখ বাড়ছে—তোমার নাতির মুখ।" ওয়াঙ একথা শুনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। হেসে আনন্দে হাতে হাত ঘষে বলে, "আজ দিনটা শুভ বলতে হবে।"

আবার হেসে চিঙকে শহরে পাঠিয়ে ভালো মাছ, ভালো ভালো খাবার কিনে আনে। এগুলো বউয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বলে :

"এগুলো খেয়ে আমার নাতিকে সুস্থ সবল করে তোলো!"

সারা বসন্তকাল ওয়াঙ নাতির আগমন-সম্ভাবনার চেতনায় বিভোর হয়ে থাকে। তার কর্মব্যস্ততা আর উদ্বেগ অশান্তির ফাঁকে ফাঁকে বারবার এই চেতনা তার সুখের উৎস হয়ে থাকে।

বসন্ত পেরিয়ে গ্রীষ্মকাল আসে। বন্যার তাড়নায় যারা বিদেশে পালিয়েছিল তারা একে একে দলে দলে ক্লান্ত, শীতক্লিষ্ট দেহ নিয়ে মনের আনন্দে দেশে ফিরে। বন্যার তাণ্ডবে তাদের ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; পড়ে আছে কেবল গেরুয়া মাটির কাদা। কিন্তু এই কাদা দিয়েই তারা ঘর বাঁধবে। বাজার থেকে চাটাই কিনে ঘরের চাল তৈরি করবে। অনেকেই ওয়াঙের কাছে সুদে টাকা নিতে আসে। ওয়াঙ চড়া সুদে তাদের জমি বন্ধক রেখে টাকা কর্জ দেয়। ধার-করা টাকা দিয়ে জমির বীজ কিনে বন্যাপ্লাবিত উর্বর মাঠে তারা ফসল ফলাবে। তাদের বলদ কিনতে হবে; লাঙল, জোয়াল, কোদাল কিনতে হবে; এত কর্জ তাদের কে দেবে? তাই তারা তাদের জমির কিছুটা বিক্রি করে টাকা জোগাড় করে। বাকি জমি আবাদ করে। এ সমস্ত জমি বেশির ভাগই ওয়াঙ লাঙ সস্তা দরে কেনে; কারণ জমির মালিকদের টাকার প্রয়োজন। বেশি জমি দিয়ে কম টাকা পেলেও টাকা তাদের চাই।

কিন্তু এমন লোকও আছে, যারা জমি হাতছাড়া করে না। বীজ, লাঙল আর বলদ কেনার টাকা অন্য উপায়ে বন্দোবস্ত করতে না পারলে, তারা তাদের মেয়ে বেচে। তারাও ওয়াঙের কাছে মেয়ে নিয়ে আসে; কারণ তারা জানে, ওয়াঙ প্রতিপত্তিশালী পয়সাওয়ালা সহৃদয় লোক। তার কাছে গেলে উপায় একটা হবেই।

যে নাতি এখনও মায়ের গর্ভে এবং যে নাতিরা অন্যান্য ছেলের বিয়ে হলে আসবে, তাদের কথা ভেবে ওয়াঙ পাঁচজন দাসী কিনে ফেলে। তাদের মধ্যে দুজনের বয়েস বারো। প্রকাণ্ড পা, সুস্থ সমর্থ দেহ। দুজন এদের চেয়ে বয়েসে কিছু ছোট, তারা ফাই-ফরমাইশ খাটবে। বাকি জন পদ্ম'র জন্য। কারণ কোকিলার বয়েস হয়েছে। তাছাড়া ছোট্ট মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি চলে যাওয়ার পর কোকিলাই ঘর-সংসারের কাজকর্ম করে। পাঁচটা দাসী ওয়াঙ একদিনেই কিনে ফেলে। পয়সা আছে। সুতরাং একটা কিছু করবে মনস্থ করলে আর ইতস্তত করে না।

অনেকদিন পর একটা লোক বছর-সাতেকের একটা ছিপছিপে কৃশ মেয়েকে বিক্রি করতে নিয়ে আসে। প্রথমটা ওয়াঙ এ মেয়েটাকে কিনতে রাজি হয় না, ওর অল্প বয়েস আর রোগা শরীর দেখে। এ মেয়ে কোনো কাজেই আসবে না। কিন্তু এ মেয়েটাকে পদ্ম'র ভালো লাগে। আবদারের সুরে বলে, "এ মেয়েটাকে আমার চাই-ই। কী চমৎকার দেখতে! যে মেয়েটা এখন আছে, ওটা দেখতে বিশ্রী। ওর গা থেকে ছাগলের গন্ধ ভুরভুর করে বেরোয়, ওকে দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে।"

ওয়াঙ মেয়েটার পানে তাকায়। ওর ভীরু চকিত আয়ত চোখ। করুণ কৃশ দেহ তার চোখে পড়ে। কতকটা পদ্মকে খুশি করার জন্য আর কতকটা এ মেয়েটাকে খাইয়ে দাইয়ে একটু মোটাতাজা দেখার জন্য সে বলে :

"বেশ, তোমার অভিরুচি হলে রেখে দাও।"

মেয়েটাকে বিশ ডলার দিয়ে ওয়াঙ কিনে নেয়। মেয়েটা ভিতরমহলে থাকে; রাতে পদ্ম'র পায়ের কাছে ঘুমোয়।

ওয়াঙ ভাবে এবার সত্যি তার সংসারে শান্তি বিরাজ করবে। বন্যার পানি সরে গেছে। গ্রীষ্মকাল। জমিতে বীজ বোনার সময়। সে ঘুরে ঘুরে জমি দেখে, জমির ভালো-মন্দ সম্বন্ধে চিঙের সাথে আলোচনা করে; কোন্ ক্ষেতে কোন্ ফসল দিলে জমির উর্বরতা নষ্ট হবে না, আলাপ করে। ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যায়, সেই তো জমির দেখাশোনা করবে। সুতরাং এখন থেকেই এ কাজ শিখুক। ছেলেটা মাথা নিচু করে চলে, বাবার কথা শুনল কি না ওয়াঙ তা তলিয়ে দেখে না। ছেলেটা সব সময় বিষণ্ন থাকে। কী যে ভাবছে কেউ জানে না।

ছেলেটা বাপের পিছু পিছু নিঃশব্দে চলছে, এ ছাড়া ওয়াঙ কিছুই দেখে না। সব ঠিক করে তৃপ্ত ওয়াঙ বাড়ি যেতে যেতে ভাবে :

"আমার বয়েস হয়েছে। এখন আর নিজের পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই। কেনই-বা পরিশ্রম করব? আমার ক্ষেতখামার আছে, ছেলেরা রয়েছে, বাড়িতেও তো অশান্তি নেই।"

কিন্তু বাড়িতে শান্তি নেই। ছেলেকে বিয়ে দিয়েছে। সকলের সেবার জন্য দাসী কিনে দিয়েছে। চাচা আর চাচিকে নেশায় চুর করে রাখার জন্য আফিম কিনে দিচ্ছে। তবুও বাড়িতে তার অশান্তি। এই অশান্তির মূল তার ছেলে আর তার চাচার ছেলে।

তার চাচার ছেলের বিরুদ্ধে তার বড়ছেলের ঘৃণা আর কোনোমতেই নিরসন হচ্ছে না। সে নিজচোখে তার চরিত্রহীনতা দেখছে। তাই ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, নাঙ এন তার চাচার ছেলেকে সঙ্গে না নিয়ে চা-খানায় পর্যন্ত যায় না। সে তাকে চোখে-চোখে রাখে। যতক্ষণ তার চাচার ছেলে বাড়িতে থাকে ততক্ষণ নাঙ এনও বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। সে বাড়ির দাসীদের সাথে এমনকি ভিতরমহলে পদ্ম'র সাথেও সেই চরিত্রহীনটার নষ্টামির সন্দেহ করে। পদ্ম'র সম্বন্ধে সন্দেহটা অবশ্য তার অলস মস্তিষ্কের কল্পনা; কারণ পদ্ম দিনদিন মুটিয়ে বুড়িয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ত্যাগ করে এখন পদ্ম পানাহার নিয়েই মশগুল। চরিত্রহীনটা কাছে এলে ফিরেও তাকাবে না। ওয়াঙের সঙ্গটাও তার আর ভালো লাগে না। এ বয়সে ওয়াঙ লাঙ তার কাছে যত কম আসে ততই সে প্রীত হয়।

ওয়াঙ লাঙ ছোটছেলেকে নিয়ে বাড়ি আসা মাত্র বড়ছেলে তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলে :

"ওই নোংরা বদমায়েশটা সারাদিন অসম্বৃত পোশাকে উঁকিঝুঁকি মারবে, আর দাসী-বাঁদিদের পিছনে ঘোরাঘুরি করবে তা আর আমার সহ্য হচ্ছে না।"

"এমনকি ভিতরমহলে তোমার নিজের মানুষের প্রতিও উঁকিঝুঁকি মারতে সাহস পায়।" বাপের সামনে এ-কথা সাহস করে বলতে পারে না; কারণ এই কথা মনে করে তার অস্বস্তি জাগে যে, সে নিজেও একদা তার বাপের মেয়েমানুষের পিছন পিছন ঘুরেছিল। এখন প্রৌঢ় স্থূল দেহের পানে তাকিয়ে সে ঘটনাটা তার স্বপ্ন বলে মনে হয়। লজ্জায় মন তার সঙ্কুচিত হয়ে উঠে। তাই সে কোনোমতেই সেই পুরনো স্মৃতিটাকে বাপের মনে জাগিয়ে দিতে প্রস্তুত নয়। সে পদ্ম'র কথাটা চাপা দিয়ে শুধু দাসীদের কথাই বলে।

ওয়াঙ প্রসন্ন মনে মাঠ থেকে ফিরেছে। বাড়িতে ফিরেই এ নালিশ শুনে সে বিগড়ে যায়। ছেলেকেই দাবড়ি দিয়ে বলে :

"বে-অকুফের মতো এই কথা নিয়েই সারাদিন বসে বসে ভাবিস! দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে দিয়ে বউ-পাগলা হয়ে থাকা বেটা-ছেলের কাজ নয়। বউ তো বেশ্যা নয় যে, পুরুষমানুষ তার প্রেমে হাবুডুবু খাবে!"

বাপের তিরস্কার তার বড় লাগে। কেউ তাকে অন্যায় ব্যবহারের জন্য দোষারোপ করবে, সে এটাকে ভয় করে। কারণ অন্যায় ব্যবহার বা চালচলন অজ্ঞ ইতর জনসাধারণের পক্ষেই সম্ভব। তাই সে চট করে বলে :

"আমার বউয়ের জন্য এ-কথা বলছি না। আমার বাপের বাড়িতে এমন অনাচার হচ্ছে, তাই বলছি।"

ছেলের কথা ওয়াঙের কানে ঢুকে না। সে রেগে কী ভাবছিল। শেষে বলে :

"আমার জীবনে মেয়েমানুষ-সংক্রান্ত ঝামেলা কি আর শেষ হবে না? আমার বয়েস হয়েছে, রক্তও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মেয়েমানুষের প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছি। এবার আমার শান্তির দরকার। এখন কি আবার ছেলেদের নারীপ্রীতি আর ঈর্ষাপরায়ণতার ঝামেলা আমাকে সইতে হবে?" এক মুহূর্ত নীরব থেকে ওয়াঙ আবার বলে, "আমাকে এখন কী করতে হবে, বলে দাও।"

নাঙ এন এতক্ষণ বাপের মেজাজ ঠাণ্ডা হবার প্রতীক্ষা করছিল। এবার বাপের 'আমাকে এখন কী করতে হবে বলে দাও' কথায় ইঙ্গিত পেয়ে ধীর স্থির কণ্ঠে বলে,

"আমার মনে হয়, এ বাড়ি ছেড়ে শহরে গিয়ে থাকলেই আমাদের ভালো হত। চাষাদের মতো গাঁয়ে পড়ে থাকা আমাদের শোভা পায় না। এ বাড়িটা বুড়ো আর তার স্ত্রী-পুত্রকে দিয়ে শহরে গিয়ে নিরাপদে থাকতে পারি।"

এ কথায় ওয়াঙ তিক্ত সংক্ষিপ্ত হাসি হেসে ওঠে। ছেলের প্রস্তাবটা নিছক বাজে বলে উড়িয়ে দেয়।

"এ বাড়ি আমার," ওয়াঙ টেবিলের উপর বসে জোরালো কণ্ঠে বলে, "এখানে তুই থাকিস না-থাকিস, তোর অভিরুচি। এই বাড়ি এই মাটি আমার। মাটি না থাকলে অন্যের মতো আমাদেরকে উপোস থাকতে হত। তুই নিষ্কর্মা পণ্ডিতের মতো সেজেগুজে ঘুরে বেড়াতে পারতিস না। এই মাটির দৌলতেই তো চাষার ছেলে হয়ে এমন শৌখিন বাবুটি হয়েছিস।"

ওয়াঙ মহা-উষ্মায় মাঝের ঘরে গিয়ে দুপদাপ করে পায়চারি করতে থাকে। তার আভিজাত্যের খোলস খসে পড়ে। সে চাচার মতো মেঝেতে থুতু ফেলে। তার মনে যুগপৎ দুই বিপরীত চিন্তাধারা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। একদিকে ছেলের সুকৌমার্য আর সুমার্জিত বেশভূষায় সে গর্বিত—অপরদিকে ছেলের প্রতি ঘৃণায় ক্রোধে তার মন তিক্ত। তার গর্ববোধের কারণ তার ছেলেকে দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে, সে মাত্র এক-পুরুষ আগে হালচাষ ছেড়েছে।

কিন্তু ছেলে হাল ছাড়ে না। সে বাপের পিছনে পিছনে এসে বলে :

"হোয়াঙদের বড়বাড়িটা রয়েছে। বাড়ির সামনেটায় অবশ্য জাত-বেজাতের লোক রয়েছে। কিন্তু ভিতরমহলগুলো খালি; তালাবদ্ধ, সেটা ভাড়া নিয়ে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি। তুমিও ছোটভাইটাকে সঙ্গে নিয়ে জমি-জমার তদারক করার জন্য সেখান থেকে যাওয়া-আসা করতে পারো।" এই বলে সে বাপকে জোর করে ধরে; জোর-করা চোখের পানিতে গাল ভাসিয়ে দেয়। চোখের পানি না-মুছেই সে আবার বলে :

"আমি তো অবাধ্য ছেলে নই, জুয়ো খেলি না, আফিমের নেশা করি না, তুমি দেখেশুনে যার সাথে বিয়ে দিয়েছে তাকে নিয়ে বেশ সুখে ঘর-সংসার করছি। ওই কুকুরটার জ্বালা থেকে আমি নিষ্কৃতি চাই। আমি তো এর বেশি আর কিছুই তোমার কাছে চাই না।"

ছেলের চোখের পানিতে ওয়াঙের মন নরম হল কি না বলা যায় না, তবে 'হোয়াঙদের বড় বাড়িটার' নাম শুনে তার মন টলে যায়।

ওয়াঙ কোনোদিন ভুলতে পারেনি, একদিন সে শঙ্কায়-সঙ্কোচে সে-বাড়িতে মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল। সে-বাড়ির দরোয়ানের সাথে পর্যন্ত ভয়ে কথা বলতে সাহস পায়নি। সে কলঙ্কের স্মৃতি এখনও সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি, এখনও মনে হলে তার মন ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠে। সে জানত শহুরে লোকদের মতো সম্মানিত সে নয়। সবাই তাকে অবহেলার চোখে দেখে, কিন্তু জমিদারবাড়ির বুড়ি বেগমের সামনে গিয়ে তার এ ধারণা আরও সত্য, আরও প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তার ছেলে যখন বলল, "আমরা এই জমিদারবাড়িটাতে বাস করতে পারি।"—চকিতে তার মনের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গিয়ে বাড়িটা বাস্তব হয়ে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ওয়াঙ ভাবে, "বুড়ি বেগম যে আসনে বসে আমাকে যেমন করে ক্রীতদাসের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম দিয়েছিল, সেই আসনে আমিও ঠিক তেমন করে অন্য একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম দিতে পারব।" ওয়াঙ আবার চিন্তা করে আপন মনে বলে, "ইচ্ছা করলেই আমি তা পারি।"

এই ভাবনা নিয়ে সে খেলায় মেতে ওঠে। ছেলের কথায় কোনো জওয়াব না দিয়ে নিঃশব্দে খেলা করে; পাইপ তামাক সাজিয়ে টানে আর আপন ক্ষমতার স্বপ্নে ডুব দেয়। হ্যাঁ, ইচ্ছা করলেই সে তা পারে, তার এ ক্ষমতা আছে। ছেলের আবদারে নয়, তার চাচার ছেলের উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যও নয়; সে জমিদারগৃহে বাসা বাঁধার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে, তার আজন্মকল্পিত মহামান্বিত জমিদারগৃহ বলে।

সে প্রথমে তার বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছার কথা ছেলেকে জানতে দেয় না। তবে সেদিন থেকে সে তার চাচার ছেলের ওপর নজর রাখতে আরম্ভ করে। সে দেখতে পায় যে, ছেলে যা বলেছে সত্যি। বাড়ির দাসীর ওপর সত্যি তার চোখ। সে আপনমনে বলে :

"এই কামান্ধ কুকুরটার সাথে আর বাস করা যায় না।"

চাচার দিকে চেয়ে দেখে, সারাদিন আফিম ফুঁকে ফুঁকে বুড়ো অত্যন্ত রোগা হয়ে গেছে; রঙও তার ফ্যাকাশে-পাণ্ডুর হয়ে গেছে। শরীরে বাঁক ধরেছে, কাশির সাথে রক্ত ওঠে। ওদিকে বুড়ি বাঁধাকপিটির মতো গোলগাল হয়ে গেছে। সারাদিন আফিমের পাইপ টেনে টেনে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে। আফিম পেলেই এরা দুজন তৃপ্ত, বাড়িতে আর অশান্তি নেই। আফিমের দৌলতে তা হলে ওয়াঙের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে।

কিন্তু চাচার ছেলেটাকে নিয়ে মুশকিল। অবিবাহিত জোয়ান, বুনো জন্তুর মতো তার কাম-ক্ষুধা। তার বুড়ো মা-বাপ যত সহজে আফিমে কাবু হল, সে তা হয় না; নিদ্রা-ঘোরে সে কাম-সম্ভোগের স্বপ্ন দেখে। ইচ্ছা করেই ওয়াঙ লাঙ তার বিয়ে দেয়

না; এই জানোয়ারের ঔরসে জানোয়ার-বাচ্চাই হবে! এমন একটা হলেই তো যথেষ্ট। এই বখাটে কোনো কাজ করবে না; কারণ কাজ করার তার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য, রাত্রে তার বাইরে অবস্থানকে যদি কাজ বলা যায়, সেকথা আলাদা। তার রাত্রে বাইরে অবস্থানও হ্রাস পেয়েছে। কারণ ডাকাতের দল উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু এই আপদটা তাদের সঙ্গে না গিয়ে ওয়াঙের বদান্যতা উপভোগ করতে রয়ে গেছে। সংসারে তাই সে একটা কাঁটা হয়ে আছে। অর্ধোলঙ্গ দেহে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায় আর আলস্যে হাই তোলে।

একদিন ওয়াঙ শহরে গিয়ে তার মেজোছেলেকে প্রশ্ন করে :

"বল্ তো বাবা! বড়ভাই চাইছে, জমিদারবাড়ির একটা অংশ ভাড়া করে আমরা শহরে থাকি, এ সম্বন্ধে তোর মতামত কী?"

মেজোছেলে এখন পূর্ণ যুবক। অন্য কেরানিদের মতোই পরিপাটি আর মাজাঘষা চেহারা। গায়ের রঙ হলদে। ছোটখাটো গড়ন; বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। সে শান্তকণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"চমৎকার! আমারও সুবিধা হবে। আমি বিয়ে করে বউ নিয়ে সেখানেই থাকতে পারব। অভিজাত পরিবারের মতো আমরাও একসঙ্গে থাকতে পারব।"

ওয়াঙ লাঙ এ ছেলের বিয়ে সম্বন্ধে কোনোদিন ভাবেনি। শান্তশিষ্ট ছেলে, ঠাণ্ডা মেজাজ। তার মধ্যে ওয়াঙ কোনোদিন যৌবন-চাঞ্চল্য লক্ষ করেনি। অন্যান্য ঝামেলায় ওয়াঙ এ-সম্বন্ধে ভাববারও অবসর পায়নি। ছেলের ওপর অন্যায় করেছে মনে করে লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলে, "অনেকদিন অবধি ভাবছি তোর বিয়েটা শেষ করে দিই, কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাট ঝামেলায় ফুরসুৎ পাইনি। তারপর কী দুর্ভিক্ষটাই গেল! যাক দিনকাল যখন আবার ভালো হয়েছে, এবার এ কাজটা সমাধা করে ফেলব।"

এই বলেই কোথায় মেয়ে পাওয়া যেতে পারে আপনমনে ভাবতে থাকে। মেজোছেলে আবার বলে ওঠে :

"বেশ আমি বিয়ে করব। বাজে খেয়ালে টাকা না উড়িয়ে বিয়ে করে সংসারী হওয়া ঢের ভালো। আর ছেলে-সন্তানেরও তো দরকার। তবে শহুরে মেয়ে আমি চাই না, বড়ভাই যেমন এনেছে। শহুরে মেয়ে সারাদিন কেবল বাপের বাড়ির বড়াই করবে আর আমাকে দিয়ে এটা-ওটা কিনিয়ে টাকা খরচ করাবে। এতে আমার মনমেজাজ খারাপ হবে।"

ওয়াঙ লাঙ একথা অবাক হয়ে শোনে। বড়বউ এ-ধরনের সে তা জানত না। সে কেবল দেখেছে মেয়েটার চালচলন নিখুঁত, চেহারা ভালো। মেজোছেলেটা বেশ বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছে। ছেলের সংসার-বুদ্ধি আর অর্থসঞ্চয়ের ভাবনায় ওয়াঙ আনন্দিত হয়। এ ছেলেটার দিকে সে কোনোদিন বড় একটা চেয়েও দেখেনি। বড়ছেলের বলিষ্ঠতার আড়ালে সে বেড়েছে। তাছাড়া কারো মনোযোগ আকর্ষণ করার মতো কোনোকিছু ওর ছিল না। ছিল কেবল বাঁশির মতো সরু গলায় অনর্গল কথা বলা। সে কাজ করতে শহরে চলে আসার পর

ওয়াঙ তো প্রায় তাকে ভুলেই রইল। কেউ তাকে ছেলের সংখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয়, "আমার তিন ছেলে," এই যা।

এবার সে তার মেজোছেলের পানে চোখ তুলে তাকায়। সযত্নে ছাঁটা তেল-চকচকে পরিপাটি মাথার চুল। পরিধানে ধূসর রঙের রেশমি জামা। সুমার্জিত ধীর স্থির প্রখর চোখের দৃষ্টি। ওয়াঙ অবাক হয়ে ভাবে : "এ-ও তো আমার ছেলে!" ছেলেকে বলে :

"তুই তা হলে কেমন মেয়ে চাস?"

আগে থেকেই যেন সব ঠিক করা, এমনি ধীর শান্তকণ্ঠে ছেলে জওয়াব দেয় :

"আমি চাই গেঁয়ো ক্ষেতখামারওয়ালা ভালো গেরস্তের মেয়ে। তার কোনো গরিব আত্মীয়-স্বজন থাকবে না, বাপের বাড়ি থেকে মোটা যৌতুক নিয়ে আসবে। চেহারা চলনসই হলেই চলবে। ভালো রান্নাবান্না জানা চাই। নিজের রাঁধতে না হলেও যাতে চাকরবাকরের রান্নার দেখাশোনা করতে পারে। হিসেবি হতে হবে, ভাত-রাঁধার সময় যাতে একমুঠো চাউল বেশি না হয়; কাপড় কিনলে যাতে জামা ছেঁটেকেটে এক-আধটা সামান্য টুকরোর বেশি নষ্ট না হয়। আমি অমন মেয়ে চাই।"

ছেলের কথাগুলো শুনে ওয়াঙ আরও বিস্মিত হয়। এ তারই ছেলে অথচ একে এতদিন সে চিনেনি। এ ছেলে সম্পূর্ণ অন্য ধাতুর তৈরি। তার বড়ছেলে বা তার মতো এর দেহে রক্তধারার কামনার আবেগ নেই। এ ধীর স্থির। এ ছেলের বুদ্ধিমত্তায় খুশি হয়ে ওয়াঙ হেসে বলে :

"আমি তোর জন্য এমন মেয়েই দেখব। চিঙ গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজে এমন মেয়ে বের করবে।"

হাসতে হাসতে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ওয়াঙ হোয়াঙ-মঞ্জিলের পথ ধরে। ফটকের প্রস্তর-নির্মিত সিংহমূর্তিদ্বয়ের সামনে সে কয়েকমুহূর্ত ইতস্তত করে ভিতরে প্রবেশ করে। তাকে বাধা দেবার কেউ নেই আজ। বাইরের মহলগুলো সে তার বড়ছেলের ব্যাপারে বেশ্যাটাকে খুঁজতে এসে যেমনটি দেখেছিল, ঠিক তেমনি আছে। গাছগুলোতে শুকোবার জন্য কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা এখানে-ওখানে বসে গল্প করছে, আর জুতোর সুখতলা সেলাই করছে। অনাবৃত নোংরা দেহে শিশুর দল আঙিনায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। ইতর-শ্রেণীর লোকদের গায়ের বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধে জায়গাটা ভরপুর। এরা এমনি করে চিরকাল ধনীদের পরিত্যক্ত মহলে এসে ভিড় করে।

সে চলতে চলতে সেই বেশ্যাটার ঘরের পানে তাকায়। দরজাটা ভেজানো। সে নেই। অন্য এক বুড়ো সেখানে এখন বাস করে। ওয়াঙ হাঁক ছেড়ে এগিয়ে যায়।

আগের দিনে—হোয়াঙ-পরিবারের সমৃদ্ধির দিনে—ওয়াঙ নিজেকে এই ইতর-জনসাধারণের স্বগোষ্ঠী আত্মীয় মনে করত। এই অভিজাত-পরিবারের লোকদের ভয়-ঘৃণা করত। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সে এখন বিত্তবান—তার জমি আছে, নিরাপদ স্থানে লুকানো নগদ টাকা আছে। এখন সে এই নিতান্ত সাধারণ মানুষগুলোকে ঘৃণা করে; তাদের দেহের দুর্গন্ধ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য শ্বাস

বন্ধ করে নাক উঁচিয়ে চলে। সে যেন হোয়াঙ-পরিবারেরই অন্যতম, এমনি মনোভাবের বশবর্তী হয়ে বর্তমান অধিবাসীদের বিরুদ্ধে মন তার বিষিয়ে ওঠে।

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, অলস-কৌতূহলে সে মহলের পর মহল পেরিয়ে যায়। অন্দরমহলে প্রবেশপথের ফটকটা তালাবন্ধ। তার পাশে এক বুড়ি বসে ঝিমোচ্ছে। ওয়াঙ চিনতে পারে, এই বুড়ি দরোয়ানের মুখে-বসন্তের-দাগওয়ালা বউ। সে অবাক বিস্ময়ে বুড়ির পানে ভালো করে তাকায়। সেই হাস্যময়ী, মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটার এ অবস্থা! কী বিশ্রী হয়ে গেছে দেখতে! বলিবহুল মুখ! কুঁচকানো দেহ-ত্বক, পক্ব কেশ, মাড়িতে হলদে নড়বড়ে দাঁত। বুড়ির পানে তাকিয়ে তার মনের সায়রে স্মৃতির ঢেউ ভেসে ওঠে। তরুণ ওয়াঙ তার নবজাত ছেলেকে কোলে নিয়ে এ-বাড়িতে এসেছিল! সে আজ কত কালের কথা! কালের স্রোত কত দ্রুত হয়ে বয়ে গেছে। এই প্রথম ওয়াঙ উপলব্ধি করে, সে বুড়িয়ে যাচ্ছে।

"জেগে ওঠো, আমি ভিতরে যাব।" বিষাদ-ভরা কণ্ঠে এসে বুড়িকে শুধায়। বুড়ি চমকে উঠে, চোখ পিট্‌পিট্ করে শুকনো ঠোঁট চেটে বলে, "ভিতরমহলের পুরোটা যে ভাড়া নেবে, তাকেই খুলে দেব, অন্যকে নয়!"

ওয়াঙ সহসা বলে উঠে :

"হ্যাঁ, পছন্দ হলে, আমিই নিতে পারি।"

বুড়িকে সে নিজের পরিচয় দেয় না। সে বুড়ির পিছনে পিছনে যায়। এ পথ তার ভালো করেই মনে আছে। মহলগুলো স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে। এই তো ছোট ঘরখানা যেখানে তার ঝুড়িটা রেখে ভিতরে গিয়েছিল। এই তো দীর্ঘ বারান্দার কারুকার্য-করা লাল স্তম্ভগুলো। তারা বড় হলঘরটায় যায়। তার মনে পড়ে, কত দ্রুত দিনগুলো কেটে গেছে। এই তো সেদিন সে এই বাড়ির একটা বাঁদিকে বিয়ে করার জন্য এখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার সামনেই তো কারুকার্য-খচিত মঞ্চখানা পড়ে আছে। এ মঞ্চেই সযত্নে প্রসাধিত ক্ষীণ মসৃণ অঙ্গখানি রুপালি সাটিন পোশাকে আবৃত করে বাড়ির কর্ত্রী বসেছিলেন।

এক অদ্ভুত আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওয়াঙ এগিয়ে গিয়ে মঞ্চটার উপর বসে সামনের টেবিলটার উপর কর্ত্রীর মতন দুহাত রাখে। এই সম্মানিত আসন থেকে সে বুড়ির কুৎসিত মুখের পানে তাকায়। বুড়ি পিট্‌পিট্ করে তার পানে তাকিয়ে অপেক্ষা করে। সারাজীবনের কামনার পূর্ণতায় ওয়াঙের বুক এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে ভরে উঠে। টেবিলে আঘাত করে সে সহসা বলে উঠে :

"আমি এ বাড়িটা নেবই।"

ঊনত্রিশ

অধুনা মনে-মনে একটা সঙ্কল্প করলে, ওয়াঙ আগের মতো তাড়াতাড়ি সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে পারে না। অথচ বয়েস হওয়ার সাথে সাথে সে সবকিছু তাড়াতাড়ি

গুছিয়ে ফেলার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। সে চায় জীবনের শেষ দিনগুলো আলস্যে শান্তিতে উপভোগ করতে। সে চায়, নিজের জমিগুলো একবার দেখে এসে একটু ঘুমোতে; অস্তগামী সূর্যের পানে তাকিয়ে থাকতে। সে ছেলেকে তার সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে দিয়ে সবকিছু বন্দোবস্ত করতে বলে দেয়। বাড়ি বদলের ব্যাপারে বড়ছেলেকে তার সাহায্যের জন্য মেজোছেলেকে ডেকে পাঠায়। সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে, তারা বাড়িবদল করে। প্রথম যায় পদ্ম আর কোকিলা তাদের দাসী আর মালপত্র নিয়ে। তারপর বড়ছেলে তার বউ আর দাস-দাসী নিয়ে চলে যায়।

কিন্তু ওয়াঙ তখ্খুনি যায় না। ছোটছেলেকে নিয়ে সে থেকে যায়। যে মাটিতে তার জন্ম, সে মাটির বন্ধন ছিঁড়ে যেতে তার মন চায় না। বুক তার ব্যথায় টনটন করে ওঠে। ছেলেদের পীড়াপীড়িতে সে জওয়াব দেয় :

"আমার একলার জন্য একটা ঘর ঠিক করে রেখে দিস্। আমার যখন মন চায় চলে যাব। নাতির জন্মের আগেই আমি যাব। যখন খুশি আমি আবার আমার ভিটেতে চলে আসতে পারি।"

ছেলেরা কিছুতেই রাজি হয় না দেখে বলে :

"তা ছাড়া এই হাবা মেয়েটা রয়েছে একে নিয়ে কী করব, তা ঠিক করতে পারছি না। তবে তাকে নিয়ে যেতেই হবে। কারণ, তাকে দেখাশোনার তো কেউ নেই।"

এ কথাগুলো বড়ছেলের বউকে লক্ষ্য করে বলে। কারণ, বউ এই হাবা মেয়েটাকে কাছে আসতে পর্যন্ত দেয় না। কাছে এলেই দূর দূর করে। সর্বদা গালাগালি করে, "ও মরে না কেন? ওকে দেখলে আমার পেটের সন্তানটার সর্বনাশ হবে।" বড়ছেলে তার বউয়ের মনের খবর জানে, তাই চুপ করে যায়। কড়া কথাগুলো বলে ফেলে ওয়াঙের অনুতাপ হয়। সে-কথার সুর নরম করে আবার বলে :

"মেজোছেলের বিয়েটা ঠিক হলেই আমি চলে আসব। চিঙ এখানে আছে, আমি এখানে থাকলেই তাড়াতাড়ি কাজটার সুবিধা হবে।"

মেজোছেলেও আর পীড়াপীড়ি করে না।

সুতরাং এ বাড়িতে রয়ে যায় চাচা আর তার স্ত্রী-পুত্র, চিঙ আর জনমজুরেরা এবং ওয়াঙ লাঙ, ছোটছেলে আর হাবা মেয়েটা। পদ্ম যে-মহলে থাকত সে-মহলে চাচা সপরিবারে উঠে যায়। তারা এটাকে নিজেদের মহল বলেই ধরে নেয়। এতে ওয়াঙ মন খারাপ করে না। কারণ, সে জানে বুড়োর আয়ু ফুরিয়েছে। বুড়ো মরলে, তার পরিবারের ওপর ওয়াঙের কর্তব্যও ফুরোয়। এত বলা সত্ত্বেও বখাটে ছেলেটা যদি কোনো কাজকর্ম না করে, তবে ওয়াঙ তাকে তাড়িয়ে দেবে। তখন কেউ আর ওয়াঙের নিন্দে করতে পারবে না। চিঙ তার জনমজুরদের নিয়ে বাইরের ঘরগুলো দখল করে আর ওয়াঙ তার ছোটছেলে ও হাবা মেয়েটাকে নিয়ে ঘরে থাকে। তাদের কাজকর্মের জন্য ওয়াঙ একটা মোটা-মজবুত দেখে পরিচারিকা নিযুক্ত করে।

আরাম করে ঘুমিয়ে ওয়াঙের দিন কাটে। কোনোদিকে আর মন দেয় না। সহসা সে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাড়িতেও আর অশান্তি নেই। বিরক্ত করার মতো আর

কেউ নেই এখানে। ছোটছেলেটা কথা বলে কম, সবসময় বাপের কাছে থেকে দূরে দূরে থাকে। ও যে কেমন ছেলে, ওর স্তব্ধতা ভেদ করে ওয়াঙ তা বুঝতে পারে না।

তাড়াতাড়ি পাত্রী ঠিক করার জন্য ওয়াঙ চিঙকে তাড়া দেয়।

চিঙও বুড়ো হয়েছে। তার দেহটা শুকিয়ে নলখাগড়ার মতো শীর্ণ হয়ে গেছে। তবে প্রভুভক্ত বুড়ো কুকুরের মতো আপন শক্তি দিয়ে প্রভুর কাজ করে যায়। যদিও ওয়াঙ তাকে আর শক্ত কাজ করতে দেয় না, তবু অনেক কাজ করে চিঙ। জনমজুরদের কাজ দেখাশোনা করে; শস্য ওজন করার সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ওয়াঙের তাড়া খেয়ে সে হাত-মুখ ধুয়ে নীল জামাটা পরে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে, মেয়ে দেখে। একদিন ফিরে এসে ওয়াঙকে জানায় :

"তোমার ছেলের জন্য পাত্রী খুঁজতে গিয়ে আমারই-যে আবার নিজের জন্য পাত্রী খুঁজতে লোভ হচ্ছে। আমার জোয়ান বয়েস থাকলে আমি ওই মেয়েটাকেই পছন্দ করতাম। এ-গাঁ থেকে তিন গাঁ দূরে মেয়ের বাপের বাড়ি। মেয়েটা সদা-হাস্যময়ী, সুন্দরী আর খুব হুঁশিয়ার। যখন-তখন হাসিটাই তার একমাত্র দোষ। তার বাপও এ পরিবারের সাথে সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হতে খুব রাজি, এ দুর্দিনে যৌতুকও মন্দ দেবে না। লোকটার জমিজমাও যথেষ্ট আছে, তোমার মুখের কথা না-পেয়ে আমি তাকে কোনো কথা দিতে পারিনি।"

এ সম্বন্ধটা ওয়াঙের ভালোই লাগে। সে তাড়াতাড়ি কাজটা সমাধা করতে চায়। তাই সে চিঙকে তার সম্মতি জানিয়ে দেয়। বিয়ের দলিলপত্র নিয়ে এলে সে তাতে সিলমোহর বসিয়ে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে :

"আর একটা মাত্র ছেলে রইল, এর বিয়েটা হলেই বিয়ের পাট চুকে গেল। তখন বেশ আরামে শান্তিতে থাকতে পারব।"

বিয়ের তারিখ নির্ধারিত হয়ে গেলে সে রোদে বসে তার বাপের মতো দিব্যি ঘুমোয়।

ওয়াঙ বুঝতে পারে চিঙ দুর্বল হয়ে গেছে; আগের মতো খাটতে পারে না। অতি আহারে আর বার্ধক্যে তার নিজের শরীরটাও ভারি অলস হয়ে পড়ছে। ছোটছেলেটারও এখন পর্যন্ত দায়িত্ব নেবার বয়েস হয়নি, তাই সে গাঁয়ের অন্য চাষিদের হাতে দূরের জমিগুলো আধাআধি বন্দোবস্ত দিয়ে দেয়। ফসলের অর্ধেক মালিকের আর অর্ধেক চাষির। জমির সার সরবরাহ করবে ওয়াঙ। চাষিরা এই সারের বদলে ওয়াঙকে অর্ধেকের কিছু বেশি ফসল দেবে।

এ ব্যবস্থার পর ওয়াঙের অবসর। সে মাঝে মাঝে শহরের বাড়িতে গিয়ে রাত কাটিয়ে সকালবেলায় পুরনো বাড়িতে ফিরে আসে। জোতজমি দেখাশোনা করে। জমির সোঁদা গন্ধে তার বুক ভরে ওঠে। মাটির স্পর্শে সুখে তার মন আনন্দে দুলে ওঠে।

দেবতারা তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তার বুড়োবয়সে শান্তির পথ স্থায়ী করে দেয়। তার চাচার ছেলেটা নারীবর্জিত নিস্তব্ধ বাড়িটায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বাড়িতে স্ত্রীলোকের মধ্যে পরিচারিকাটা মাত্র—একজন জনমজুরের স্ত্রী।

উত্তরে কোথায় যুদ্ধ বাধার খবর পেয়ে তার চাচার ছেলে এসে ওয়াঙকে বলে :

"শুনলাম, উত্তরে কোথায় যুদ্ধ বেধেছে। আমি সে যুদ্ধে যাব। এখানে হাত-পা গুটিয়ে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না। দেশ-বিদেশ ঘোরাও হবে। বিছানাপত্র, কাপড়চোপড়ের জন্য কিছু টাকাপয়সার প্রয়োজন।"

উল্লাসে ওয়াঙের বুক নেচে ওঠে। মনের আনন্দ গোপন করে দুঃখের ভান করে জওয়াব দেয় :

"চাচার একমাত্র ছেলে। চাচা মারা গেলে তার শবদেহ বইবার কেউ থাকবে না। তুই চলে গেলে তার কী দশা হবে?"

চাচার ছেলে হাসিমুখে বলে:

"আমি কাঁচা নই। যেখানে দাঁড়ালে বিপদ হতে পারে, সেখানে যাবই না। যুদ্ধে আমি যাবই আর শেষপর্যন্ত থাকবও। একঘেয়েমি আর ভালো লাগে না। দেশ-বিদেশ দেখে আসি। বুড়ো হলে তো আর পারব না!"

আর কথা না-বাড়িয়ে ওয়াঙ টাকা বের করে দেয়। এ টাকা চাচার ছেলের হাতে তুলে দিতে তার দুঃখ হয় না। টাকা দিতে দিতে ভাবে :

"শেষ পর্যন্ত গেলে হয়। আমার বাড়িটা অভিশাপ-মুক্ত হোক। যুদ্ধ তো কোথাও-না-কোথাও হচ্ছেই। আমার কপাল ভালো হলে ও যুদ্ধে মারা যাবে। যুদ্ধে তো লোক আকসার মরছে।"

মনের আনন্দ চেপে ওয়াঙ পুত্রবিরহকাতরা চাচিকে সান্ত্বনা দেয়। তাকে আরও আফিম দিয়ে পাইপটা ধরিয়ে দিতে দিতে বলে :

"নিশ্চয়ই সে যুদ্ধে গিয়ে একজন হোমরাচোমরা হয়ে ফিরবে। তাকে দিয়ে আমাদের পরিবারের সম্মান-প্রতিপত্তি বাড়বে।"

এবার বাড়িতে অনাবিল শান্তি। দুই বুড়োবুড়ি আফিম খেয়ে খেয়ে গ্রামের বাড়িতে ঘুমোয়।

শহরের বাড়িতে এদিকে নাতির প্রসবের ক্ষণ এগিয়ে আসে। এ সময়টা ওয়াঙ বেশির ভাগ শহরের বাড়িতেই থাকে নাতির মুখদর্শন প্রতীক্ষায়। সে বাড়ির আঙিনায় পায়চারি করে আর ভাবে। কী ঘটে গেল ভাবতেই মন তার বিস্ময়মুগ্ধ হয়ে উঠে। যে-বাড়িতে একদিন বনেদি হোয়াঙ-পরিবার বাস করত, সে-বাড়িতে এখন সে তার পরিবার নিয়ে বাস করে। এ বাড়িতেই তার পরিবারের তৃতীয় বংশানুক্রম তার নাতি।

তার অন্তরের পরিধি ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। তার হাত দরাজ হয়ে যায়। সে বাড়ির সবার জন্য সাটিন আর রেশমি কাপড় কিনে। দক্ষিণাঞ্চলের কালো কাঠের আসবাবের সাথে তাদের নীল সুতোর পোশাক মানায় না। বাড়ির দাসী-চাকরের জন্যও সে লাল-নীল ভালো সুতোর কাপড় কিনে। ছেঁড়া-ময়লা পোশাক আর কাউকে পরতে হবে না। তার বড়ছেলের শহুরে বন্ধুরা এসব দেখবে বলে সে নিজকে গর্বিত বোধ করে।

ওয়াঙ লাঙ এবার ভালো আহারের দিকে মন দেয়। আগের মতো মোটা আটার রুটিতে রসুন পুরে তৃপ্ত হওয়ার দিন তার ফুরিয়ে গেছে। এখন অনেক বেলায় তার ঘুম ভাঙে। কারণ, নিজ হাতে কাজ করার জন্য তাকে আর মাঠে যেতে হয় না। এটা-ওটা খেয়ে আর তার তৃপ্তি হয় না। অগ্নিমান্দ্য-বড়লোকের মতো সে এখন বাঁশের কোঁড়, বাইরে থেকে আমদানি-করা ভালো সুস্বাদু মাছ, পায়রার ডিম ইত্যাদি খায়। সবার জন্য খাবার এই ব্যবস্থা। এসব দেখে কোকিলা হেসে বলে :

"আমি এই মহলে থাকার সময় যেমনটি ছিল, সবই আবার সে-রকমটি হয়েছে। আমারই কেবল যৌবন নেই। এই শুকনো পোড়া দেহখানা বাড়ির বুড়ো মালিকেরও অযোগ্য হয়ে গেছে।"

কথা বলে সে ওয়াঙ লাঙের পানে বাঁকা-চোখে তাকিয়ে আবার হাসে। ওয়াঙ কোকিলার এই রতি-রঙ্গ-ভরা কথা না-শোনার ভান করে। তবে পুরনো দিনের বুড়ো জমিদারের সাথে তার তুলনা করছে বলে কোকিলার ওপর গোপনে প্রসন্ন হয়।

এমনি করে আলস্যে-বিলাসে ওয়াঙের জীবন কাটে। সে খায়-দায় ঘুমোয় আর নাতির প্রতীক্ষা করে।

একদিন সকালবেলা সে নারীকণ্ঠের কাতরানি শুনতে পায়। সে বড়ছেলের মহলে যেতেই ছেলে বলে :

"সময় হয়েছে, কিন্তু কোকিলা বলছে, রোগা বলে সময় নেবে, কষ্টও হবে।"

ওয়াঙ লাঙ নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে কাতরানি শোনে। বহু বছর পর তার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়; সে দেবতার সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করে। সে গিয়ে ধূপকাঠি কিনে। ধূপকাঠি নিয়ে সে করুণাদেবীর মন্দিরে যায়। মন্দিরের নিষ্কর্মা পূজারির হাতে টাকা দিয়ে নিবেদন করে :

"আমার এ কাজে আসাটা অন্যায় জানি, কিন্তু উপায় নেই। বাড়িতে আর স্ত্রীলোক নেই যে, ধূপকাঠি গুঁজে দেবে। আমি বিপত্নীক। আমার নাতি হবে, বৌমার বড় কষ্ট হচ্ছে, শহুরে মেয়ে। বড় রোগা কিনা তাই।"

পূজারি ধূপকাঠি জ্বেলে ছাইয়ে গুঁজে দেয়। হঠাৎ ভয়ে ওয়াঙের গা শিউরে উঠে। "যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়।" সে তাড়াতাড়ি মানত করে :

"নাতি হলে দেবীকে লালকাপড় পোশাক দেব আর মেয়ে হলে কিচ্ছু দেব না।"

ছেলে না হয়ে মেয়ে তো হতে পারে, একথাটা তার আগে মনে হয়নি। সে উদ্বিগ্ন-চিত্তে আবার বেরিয়ে গিয়ে আরও ধূপকাঠি কিনে আনে। প্রখর রোদে হাঁটু সমান ধুলো ভেঙে সে গায়ের ছোট্ট মন্দিরে যায়, সেখানে যুগলমূর্তি অহোরাত্র ক্ষেতের উপর প্রহরা দিচ্ছে। সে ধূপকাঠি ধরিয়ে গুঁজে দিয়ে যুগলমূর্তির কাছে প্রার্থনা জানায় :

"আমরা পুরুষানুক্রমে তোমার সেবা করে আসছি; এবার আমার ছেলের দেহের ফল আসছে। যদি নাতি না হয়, তবে তোমাদের সেবা এইখানেই শেষ।"

এসব করে সে ক্লান্তদেহে আপন মহলে ফিরে আসে। তার ইচ্ছা হয় একটা দাসী তাকে গরম চা এনে দিক আর অন্য দাসী গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে

নিয়ে আসুক। গা-হাত-পা মুছে সে একটু জুড়িয়ে নিক। সে হাততালি দেয়, কিন্তু কেউ তার হাততালিতে সাড়া দেয় না। সবাই ছুটোছুটি করছে। কাউকে থামিয়ে যে জিজ্ঞেস করবে, সন্তান হল কি না আর কী সন্তান হয়েছে, সে সাহস তার হয় না। সে ধুলোমাখা ক্লান্তদেহে বসে থাকে, কেউ তার খোঁজ নেয় না।

সে অনেকক্ষণ এমনিভাবে বসে থাকে। সন্ধ্যা নেমেছে, রাতের অন্ধকার এখনই চারদিকে ঢেকে দেবে। এমন সময় পদ্ম তার বিরাট দেহভার কোকিলার উপর ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদ্র পা'দুটোর উপর টলতে টলতে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে। চেঁচিয়ে বলে :

"ওগো, তোমার নাতি হয়েছে। মা-বেটা সুস্থ আছে। আমি দেখেছি, বেশ সুস্থ ডাগরটি হয়েছে।"

ওয়াঙও হাসে। আনন্দে হাততালি দিয়ে বলে :

"আমি এখানে বসে ভয়ে ভয়ে মরছি; যেন আমারই প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছে।"

পদ্ম আপন ঘরে চলে গেলে ওয়াঙ আবার চিন্তার জাল বুনতে থাকে :

"আমার বড়ছেলের জন্মের সময়ও আমি এত ভয় পাইনি।" তার মনে পড়ে সেদিনের স্মৃতি, যেদিন তার স্ত্রী একলা নিজের অন্ধকার ঘরে গিয়ে নীরবে তার সন্তান প্রসব করল। তার বড়ছেলে। তারপর আরও ছেলে, আরও মেয়ে এমনি নীরবে প্রসব করেছে। একটার পর একটা। সন্তান প্রসবের পরেই আবার তার পাশে মাঠে এসে তার কাজের অর্ধেকটা আপন হাতে তুলে নিয়েছে। আর তার ছেলের বউ প্রসব-বেদনায় শিশুর মতো কেঁদেছে। দাসী-বাঁদিদের বাড়িময় ছুটিয়ে বাড়ি তোলপাড় করে তুলেছে। তার বড়ছেলে সারাক্ষণ আঁতুড়ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বহুদিনের পুরনো স্মৃতি স্বপ্নের মতো ওয়াঙের মনে পড়ে। কাজ করতে করতে বিশ্রামের ছলে ওলান সন্তানের মুখে তার বুকের শুভ্র দুগ্ধধারা ঢেলে দিত; দুগ্ধের উচ্ছ্বসিত ধারা মাটির বুকে ছড়িয়ে পড়ত। সে কতদিনের কথা।

তার ছেলে স্মিত গর্বিত মুখে এসে ওয়াঙকে জানায় :

"ছেলে হয়েছে, বাবা! এখন ছেলের জন্য একজন দুধের দাই দরকার। ছেলেকে বুকের দুধ খাইয়ে তোমার বউমা'র চেহারা খারাপ হবে, স্বাস্থ্য নষ্ট হবে, তা আমি চাই না। শহরের কোনো অভিজাত ঘরেই ছেলেকে মায়ের বুকের দুধ খেতে দেওয়া হয় না।"

অকারণ বিষণ্ণকণ্ঠে ওয়াঙ জওয়াব দেয় :

"বেশ এটা যদি এতই প্রয়োজনীয় মনে করো, বউ যদি ছেলেকে সত্যি বুকের দুধ না দেয়, তবে দাই আনোগে।"

শিশুর বয়েস একমাস হতে নাঙ এন তার ছেলের জন্মোৎসব পালন করে। শহরের বহু পরিচিত বন্ধুবান্ধব, তার শ্বশুর-শাশুড়ি এ উপলক্ষে তার বাড়িতে আসে। শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও নিমন্ত্রিত হয়। লাল-রঙ-করা শত শত মুরগির ডিম

মেহমানদের দেওয়া হয়। পানাহারের জাঁকজমকপূর্ণ ব্যবস্থা হয়, উৎসবানন্দ চলে। ছেলেটা হয়েছে বেশ সুদর্শন, নাদুসনুদুস। দশদিন পর্যন্ত চলে জীবনের ভয়। সে ভয় কেটে গেছে, তাই উৎসবানন্দে বাড়ি মুখর।

জন্মোৎসবের আনন্দ শেষ হতেই বড়ছেলে এসে বাপকে বলে :

"এই বাড়িতে তিন-পুরুষ একসঙ্গে হয়েছে। এবার বনেদি-পরিবারের রীতি অনুসারে পূর্বপুরুষদের তালিকা পাথরে খোদাই করে রাখতে হবে। প্রতি উৎসবে এই ফলকগুলোর পুজো হবে। আমরা এখন বনেদি পরিবার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।"

এ প্রস্তাবে ওয়াঙ লাঙ অত্যন্ত প্রীত হয়। বিনাদ্বিধায় সে ছেলেকে তার সম্মতি জানায়। এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করতেও বিলম্ব হয় না। বড় হলঘরে পূর্বপুরুষদের নামের ফলক লাগানো হয়। প্রথম ওয়াঙের দাদার, তারপর ওয়াঙের বাপের নাম। বাকি জায়গা খালি পড়ে থাকে। মরলে পরে, ওয়াঙের নাম, তার ছেলেদের নাম ফলকে খোদাই করা হবে। ওয়াঙের ছেলে একটা ধূপদানি কিনে এনে ফলকের তলায় রেখে দেয়।

এসব হয়ে গেলে, ওয়াঙের মনে পড়ে করুণাদেবীকে সে লাল-পোশাক মানত করেছিল। সে শহরে গিয়ে পুরোহিতের হাতে টাকাটা দিয়ে আসে।

দেবতারা হয়তো মুক্তহস্তে বর দান করেন না; দানের সাথে অভিশাপও জুড়ে দেন। করুণাদেবীর মন্দির থেকে ফিরতেই কে একজন ছুটে এসে ওয়াঙকে খবর দেয় যে, চিঙ সহসা মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। ওয়াঙকে মৃত্যুর সময় দেখতে চায়। লোকটার কথা শুনে ওয়াঙ রেগে বলে :

"বুঝেছি, শহরের করুণাদেবীকে লাল কাপড় দিয়েছি বলে ক্ষেত্রদেবতার মন্দিরের যুগলমূর্তি ঈর্ষান্বিত হয়েছে। এই যুগলমূর্তি হয়তো জানে না সন্তান-প্রসবে ওদের কোনো হাত নেই; ওদের জারিজুরি ক্ষেতের ওপর।

এদিকে দুপুরের খাবার প্রস্তুত। পদ্ম'র অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে ওয়াঙ চিঙকে দেখতে বেরিয়ে যায়। কথায় কান দিচ্ছে না দেখে পদ্ম এক দাসীর হাতে একটা ছাতা ওয়াঙের পিছনে পিছনে পাঠায়। কিন্তু ওয়াঙ এত দ্রুত চলে যে, তার সাথে তাল রেখে মাথায় ছাতাটা ধরে রাখতে মোটা দাসীটার বেগ পেতে হয়।

ওয়াঙ সোজা চিঙের ঘরে যায়। সে প্রশ্ন করে, "কেমন করে এমন হল?"

ঘরময় জনমজুরদের ভিড়। তার কথায় সবাই একসাথে জওয়াব দিয়ে ওঠে। কথার জট পেকে যায়।

"নিজেই মাড়ানির কাজ করতে যাবে..."

"এ বয়সে এ কাজ করতে নিষেধ করলাম..."

"নতুন একটা কামলা এসেছে..." মাড়ানিটা পর্যন্ত ধরতে জানে না। চিঙ নিজে তাকে মাড়ানি ধরতে দেখিয়ে দিতে যায়—বুড়োমানুষ এতটা পারবে কেন..."

ওয়াঙ গর্জন করে ওঠে :

"ধরে আন্ সে বেটাকে।"

তারা লোকটাকে ওয়াঙের সামনে ঠেলে দেয়। লোকটা ভয়ে কাঁপে, হাঁটু ঠক্‌ঠক্ করে। বিরাট গেঁয়ো জোয়ান; লালচে রঙ, কুৎসিত চেহারা। উপরের দাঁতের পাটি নিচের ঠোঁটের উপর চেপে বসে আছে; বলদের চোখের মতো ভাবব্যঞ্জনাহীন দুটো গোলাকার চোখ। লোকটাকে দেখে ওয়াঙের দয়ার উদ্রেক হয় না। সে ঠাস ঠাস করে লোকটার দু গালে চড় কষিয়ে দেয়; দাসীর হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে লোকটার মাথায় ঘা কতক লাগায়। কেউ সাহস করে বাধা দেয় না, পাছে বাধা পেয়ে তার রাগ আরও বেড়ে যায়; রাগ বেড়ে গেলে হয়তো তার বৃদ্ধ দুর্বল দেহের ক্ষতি হবে।

চিঙ কাতরিয়ে উঠতেই ওয়াঙ ছাতা ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে :

"আমি এই উজবুকটাকে মারছি, আর এদিকে ঐ লোকটা মরে যাচ্ছে।"

ওয়াঙ চিঙের পাশে বসে ওর হাতটা আপন হাতে নেয়। হাতখানা শুকিয়ে ঝরা ওকপাতার মতো হয়ে গেছে। এ হাতে একবিন্দু রক্ত নেই। চিঙের ফ্যাকাশে পাণ্ডুর মুখখানা কালো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে লাল দাগ পড়েছে। আধবোজা চোখে ছায়ান্ধকার নেমে এসেছে; কষ্টে শ্বাস-নিশ্বাস ফেলছে। ওয়াঙ নুয়ে চিঙের কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার করে :

"আমি এসেছি, বাবার কফিনের মতো কফিন তোমার জন্য কিনে আনব।"

চিঙের কান রক্তে ভরে গেছে। ওয়াঙের কণ্ঠস্বর তার কানে পৌঁছে না। পৌঁছলেও তা বোঝা যায় না। কণ্ঠশ্বাসে দেহটা কয়েকবার কেঁপে কেঁপে ধীরে ধীরে নিঃসাড় হয়ে গেল।

চিঙের মৃতদেহের উপর পড়ে ওয়াঙ অনেকক্ষণ কাঁদে। তার বাপের জন্যও সে এত কাঁদেনি। চিঙের জন্য সে খুব ভালো দেখে কফিন কেনে; পুরোহিত ডাকে, সাদা পোশাক পরে পায়ে হেঁটে শবানুগমন করে। ছেলেদেরও পায়ে সাদা পটি বাঁধতে হয়। যেন আপন পরিবারেরই কেউ মারা গেছে। বড়ছেলে আপত্তি করেছিল :

"ও তো ছিল আমাদের ভৃত্য মাত্র, যদিও উঁচুদরের। ভৃত্যের জন্য শোকধারণ শোভনীয় নয়।"

কিন্তু ওয়াঙ সে আপত্তি শোনেনি। তিনদিন অবধি শোকচিহ্ন ধারণ করতে ছেলেদের বাধ্য করে। ওয়াঙের ইচ্ছা ছিল, তার বাপ এবং ওলানের পাশে পাঁচিল-বেষ্টিত জায়গায় চিঙের কবর দেব। কিন্তু ছেলেরা আপত্তি তোলে :

"তা হলে কি আমাদের মা আর দাদা এক ভৃত্যের সাথে কবরস্থ হবে? আমরাও তাই হব?"

এই বুড়ো বয়েসে ওয়াঙ বাড়িতে অশান্তি সৃষ্টির ভয়ে তাদের বিরোধিতা করে না। পাঁচিলের প্রবেশপথে চিঙকে কবরস্থ করে সাধ্যমতো যতটুকু করতে পেরেছে—তাতেই নিজকে সান্ত্বনা দেয়। মনে মনে বলে :

"সত্যি, চিঙ এ সম্মানের যোগ্য। শত বিপদ-আপদে সে অভিভাবকের মতো আমাকে ঘিরে রেখেছিল।" সে তার ছেলেদের নির্দেশ দেয়, মরলে তাকেও যেন চিঙের পাশে কবর দেওয়া হয়।

এরপর থেকে ওয়াঙ ক্ষেতখামার দেখাশোনা আরও কমিয়ে দেয়। কারণ, চিঙের অনুপস্থিতি তার বুকে ছুরির মতো বিঁধে । তা ছাড়া দেহ তার বার্ধক্যে অবসন্ন। চষা-ক্ষেতের উপর হাঁটলে দেহ ব্যথিয়ে বিষিয়ে ওঠে। তাই সে তার সব জমি বর্গা দিয়ে দেয়। সবাই আগ্রহে তার জমি নেয়। কারণ তারা জানে জমিগুলো উর্বরা, সুফলা। ওয়াঙ লাঙ এক ইঞ্চি জমিও বিক্রি করে না। কেবল সালকাবারি চুক্তিতে বর্গা দেয়। জমির স্বত্ব তারই থেকে যায়।

একজন কিষাণকে তার পরিবার নিয়ে তার নতুন বাড়িতে জায়গা দেয়। তারা তার আফিমখোর চাচা-চাচিকেও দেখাশোনা করবে। ছোটছেলে তার পানে আকুল দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে দেখে বলে :

"তুইও চল্ আমার সঙ্গে। হাবা মেয়েটাকেও নিয়ে যাব। ও আমার সঙ্গে আমার ঘরে থাকবে। চিঙ নেই; তুই একলা এখানে থাকতে পারবিনে। চিঙ নেই; তোকে চাষাবাদের কাজকর্মই-বা কে শেখাবে।"

ওয়াঙ লাঙ তার ছোটছেলে আর হাবা মেয়েটাকে নিয়ে শহরের বাড়িতে চলে আসে। এর পরে সে গাঁয়ের বাড়িতে বড় একটা আসে না। এলেও বেশিক্ষণ থাকে না।

ত্রিশ

ওয়াঙ লাঙের জীবনে সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। বিনা পরিশ্রমে বিনা যত্নে তার জমি থেকে হাতে বিস্তর টাকা আসছে। সে এখন হাবা মেয়েটাকে পাশে নিয়ে চেয়ারে বসে দিব্যি আরামে হুঁকো টানতে পারে।

তাই হয়তো হত, কিন্তু বাধ সাধে তার বড়ছেলেটা। সবকিছু প্রচুর পরিমাণে পেয়েও সে তৃপ্ত নয়। সে আরও চায়। একদিন সে বাপকে এসে বলে :

"আমাদের আরও এটা-ওটার প্রয়োজন। বনেদিবাড়ির অন্দরমহলে বাস করলেই বনেদি হওয়া যায় না। বনেদি হতে হলে আরও অনেক আসবাবপত্র প্রয়োজন। মেজোভাইয়ের বিয়ের মাত্র ছয়মাসও বাকি নেই। মেহমানদের বসবার মতো যথেষ্ট সংখ্যক চেয়ার নেই, তাদের খেতে দেবার মতো বাসন-পেয়ালা নেই; সবকিছুরই অভাব রয়েছে। সদরে যা একদল ইতর জুটেছে, তাদের গয়ের গন্ধে বমি আসে। ভদ্রলোকদের ফটক পেরিয়ে এদের হট্টগোলের মাঝখান দিয়ে আসতে বলতেও লজ্জা করে। মেজোর বিয়ে হচ্ছে, ছেলে-পুলে হবে, আমারও ছেলে-পুলে হবে। সংসারে লোক বাড়বে, সুতরাং বাইরের মহলটাও আমাদের দরকার।"

ওয়াঙ তার ফুলবাবু ছেলের পানে কতকক্ষণ তাকিয়ে চোখ বুজে হুঁকোতে একটা জোর দম দিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে :

"তারপর?"

নাঙ এন বুঝতে পারে তার বাপ তার ওপর বিরক্ত হয়েছে, কিন্তু তাতে দমে না। কণ্ঠস্বর আরও উঁচুপর্দায় চড়িয়ে বলে যায় :

"আমি বলতে চাই, বাইরের মহলটা আমাদের নিজেদের জন্য দরকার। আর দরকার আমাদের মতো সমৃদ্ধশালী পরিবারের উপযুক্ত আসবাবপত্র সাজসরঞ্জাম।"

হুঁকোতে মুখ রেখেই ওয়াঙ অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে :

"জমি আমার, এতে তুই কোনোদিন হাত লাগাসনি!"

"শোনো বাবা।" নাঙ-এন চেঁচিয়ে ওঠে, "তোমার ইচ্ছায়ই আমি লেখাপড়া শিখেছি আর এখন আমি বিত্তশালী লোকের উপযুক্ত পুত্র হয়ে চলতে চাইছি বলে তুমি আমাকে বকাবকি করছ। তুমি চাও, আমি বউ নিয়ে মূর্খ চাষির মতো চলি।" এই কথা বলে সে ঝড়ের মতো বেগে বেরিয়ে যায়। মনে হয় সে বুঝি আঙিনার পাইনগাছটায় মাথা ঠুকতে যাচ্ছে।

ওয়াঙ লাঙ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এ ছেলে সবসময়ই বড় বদমেজাজি, হয়তো নিজেকে জখমই করে ফেলবে। সে তাই চেঁচিয়ে বলে দেয়, "তোর যা খুশি কর্‌গে—যা খুশি কর্‌গে। শুধু আমাকে জ্বালাতন করিসনে।"

এ-কথা শুনে ছেলে কালবিলম্ব না করে খুশিমনে সে স্থান ত্যাগ করে। পাছে তার বাপ আবার মত বদলে ফেলে। যত শিগগির সম্ভব সে সূচাও থেকে কারুকার্য করা চেয়ার কিনে আনে। দরজায় ঝোলাবার জন্য রেশমি পর্দা। দেয়ালে ঝোলাবার জন্য ভালো ভালো ছবি আনে আর আনে ছোট বড় রকমারি ফুলদানি। অনেকগুলো সুন্দরী নারীর ছবিও নিয়ে আসে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখার জন্য। দক্ষিণদেশে সে কৃত্রিম পাহাড় দেখে এসেছে। আঙিনায় সেরকম কৃত্রিম পাহাড় তৈরি করার জন্যে রঙবেরঙের পাথর নিয়ে আসে। এসব কাজে সে অনেকদিন লেগে থাকে।

এসব কাজে তাকে বহুবার বাইরের মহল দিয়ে আনাগোনা করতে হয়। বাইরের মহলের ইতর লোকগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় সে নাক উঁচিয়ে চলে। সে এ লোকগুলোকে সহ্য করতে পারে না। সে চলে গেলে লোকগুলো তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে বলে :

"বাপের বাড়ির দোরগোড়ায় গোবরের ঢিবির দুর্গন্ধের কথা ভুলে গেছে বাপধন!"

বড়লোকের ছেলের মুখের সামনে কেউ একটা কথা বলতে সাহস পায় না। নতুন বছরে নতুন ভাড়া ধার্য হলে সদর-মহলের ভাড়াটেরা দেখতে পায় তাদের ভাড়া অনেক বেড়ে গেছে। ওরা না দিলে অন্য একজন নির্ধারিত ভাড়া দিতে রাজি আছে, তাই তাদের পাততাড়ি গুটাতে হয়। তারা জানতে পারে, ওয়াঙ লাঙের বড়ছেলেটা তাদের না-জানিয়ে পুরনো জমিদারের সাথে বিদেশে চিঠিপত্র দিয়ে এসব করেছে। জমিদারের ছেলে কেমন করে কোথাও বেশি টাকা ভাড়া পাওয়া যায়, তাই চায়।

ভাড়াটেরা তাদের ছেঁড়া ভাঙা জিনিসপত্র নিয়ে বিদায় নেয়। বিদায়বেলায় ধনীলোকদেরকে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার জন্য গালাগালি দিয়ে যায়। তারা রাগে গরগর করে বলে, "একদিন তারা এখানে ফিরে আসবে। ধনীদের বাড় বেশি বেড়ে গেলে সর্বহারার দল যেমন করে ফিরে আসে, তারাও তেমনি করে ফিরে আসবে।"

ওয়াঙ লাঙ এসব জানে না; কারণ, সে এখন ভিতরমহলেই পড়ে থাকে। খায় ঘুমোয়। বার্ধক্যের ধর্ম মেনে নিয়ে সে বড়ছেলের হাতে সংসারের ভার ছেড়ে দিয়েছে। বাইরে বড় একটা আসেই না। বড়ছেলে কাঠমিস্ত্রি আর রাজমিস্ত্রিদের ডেকে ঘরগুলো আর সদর আর অন্দরমহলের মাঝখানকার চাঁদ-ফটকটা মেরামত করে নেয়। ইতর লোকগুলো এসব নষ্ট করে ফেলেছিল। জলাশয়গুলো মেরামত করিয়ে সে এগুলোতে আবার সোনালি মাছের ঝাঁক ছেড়ে দেয়; জলাশয়গুলো তার সাধ্যমতো মনোরম করে তাতে পদ্মফুল লাগিয়ে দেয়। তার দক্ষিণদেশে দেখা সব সৌন্দর্য দিয়ে বাড়িটা শোভিত করে তোলে। তার বউ মাঝে মাঝে এসে স্বামীর কৃতিত্ব দেখে; তারা দুজন ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। বউ ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ করে স্বামীকে বলে, স্বামী প্রয়োজনমতো সে ত্রুটি সংশোধন করে।

লুপ্ত-শ্রী জমিদারবাড়িটায় আবার এক ধনীপরিবারের বাস আর এ-বাড়ির লুপ্ত-শ্রী পুনরুদ্ধারের কাহিনী শহরে ছড়িয়ে পড়ে। যারা এতদিন ওয়াঙকে চাষি বলে সম্বোধন করেছে, এখন তারা সম্ভ্রমে ওয়াঙকে, 'ধনী ওয়াঙ' বা 'বড়লোক ওয়াঙ' বলে সম্বোধন করে।

এই হত-শ্রী পুনরুদ্ধারে অল্পঅল্প করে যে কত টাকা ব্যয় হয়েছে, ওয়াঙ তা বুঝতে পারে না। কারণ, এ টাকা একসাথে দেওয়া হয়নি। বড়ছেলে এসে হয়তো বলে, "এ কাজটার জন্য একশো ডলার দরকার" বা "ফটকটা একটু মেরামত করতে হবে; সামান্য খরচ করলেই একদম আনকোরা দেখাবে," অথবা, "একটা লম্বা টেবিল না পাতলে হয় না।"

ওয়াঙ চেয়ারে বসে দিব্যি আরামে পাইপ টানতে টানতে ছেলের হাতে বারবার টাকা তুলে দিয়েছে। টাকা দিতে অসুবিধা হয়নি। প্রতিবার ফসল-তোলার সময় অঢেল টাকা ঘরে আসে; চাইলেই টাকা আসে। সুতরাং টাকা দিতে ওয়াঙের বাধে না। একদিন সকালবেলা তার মেজোছেলে নাঙ-ওয়েন তার কাছে এসে না বললে, সে জানতেই পারত না এই কাজের জন্য কত টাকা সে বড়ছেলেকে দিয়েছে। মেজোছেলে এসে বলে :

"বাবা! এই অর্থব্যয়ের কি আর শেষ হবে না? রাজপ্রাসাদে না থাকলে কি আমাদের চলছে না? এ টাকা সুদে খাটালে টাকার কাঁড়ি ঘরে আসত। এসব জলাশয়, ফুলগাছ কী কাজে লাগবে? গাছে ফল হলেও না-হয় খাওয়া যেত।"

ওয়াঙ বুঝতে পারে, এ নিয়ে দু-ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ বাধবে; আবার সংসারে অশান্তি দেখা দেবে। তাই সে ছেলেকে তাড়াতাড়ি জওয়াব দেয় :

"এসব তো তোর বিয়ে উপলক্ষেই করা হচ্ছে।"

ছেলে শুষ্ক বক্র হাসি হেসে বলে,

"বিয়ে উপলক্ষে বউয়ের দামের দশগুণ খরচ করা বড় বিশ্রী ব্যাপার। এসবে আমি নেই। এ বড়ভাইয়ের বড়লোকি চাল। তুমি মরে গেলে এ সম্পত্তি আমাদের মধ্যে সমান ভাগ হবে। বড়ভাই তার বাজে বড়মানুষি খেয়াল চরিতার্থ করতে এ সম্পত্তি ওড়াবে, তা অন্যায়।"

ওয়াঙ মেজোছেলের জেদ জানে। এ নিয়ে কথা তুললে, একটা হেস্তনেস্ত না করে এ-ছেলে ছাড়বে না। তাই সে ব্যস্ত হয়ে বলে :

"বেশ, আমি এসব বন্ধ করে দিচ্ছি। আর একপয়সাও দিচ্ছি না। তোর বড়ভাইকে আমি বলে দেব। হ্যাঁ, তুই ঠিক কথাই বলেছিস।"

বড়ভাই কত টাকা খরচ করেছে, মেজোছেলে তার একটা ফর্দ নিয়ে এসেছিল। লম্বা ফর্দটা দেখেই ওয়াঙ বলে দেয় :

"আমার এখনও খাওয়া হয়নি। এ বয়েসে সকালবেলা মুখে কিছু না দিলে, বড় কাবু হয়ে পড়ি। অন্য সময় এটা দেখব।" এই বলে সে আপন ঘরে ঢুকে ছেলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়।

সেদিন বিকেলবেলা সে বড়ছেলেকে বলে :

"বাড়ি রঙ-পালিশ হয়ে গেছে। আর নয়, এবার ক্ষান্ত হও। আমরা গেঁয়োমানুষ, এত বড়লোকি আমাদের দরকার নেই।"

বড়ছেলে গর্বের সুরে বলে :

"আমরা গেঁয়োমানুষ নই। শহরে বড়লোক বলে ওয়াঙ-পরিবারের সুনাম রটে গেছে। এ সুনামের মর্যাদা রক্ষা করে আমাদের চলতে হবে বৈকি। মেজো যদি টাকাটাই কেবল চিনে, তবে আমি আর আমার বউ দুজনে মিলেই এ পরিবারের সুনাম রক্ষা করব।"

শহরে তার পরিবারের এত মান-মর্যাদা হয়েছে ওয়াঙ সে-খবর রাখে না। কারণ, বার্ধক্যের দরুন সে বড় একটা বেরোয় না। এমনকি চা-খানায়ও যায় না। শস্যপট্টীতেও তাকে যেতে হয় না। মেজোছেলেই সেখানে দেখাশোনা করছে। বড়ছেলের কথায় তার মনে গোপন আনন্দ জাগে। ছেলেকে বলে :

"বনেদি, জমিদার, যাই বলো, সবারই শিকড় গাড়া রয়েছে মাটিতে।"

নাঙ সপ্রতিভ কণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"তা সত্যি, কিন্তু তারা সারাজীবন মাটি আঁকড়ে গাঁয়ে পড়ে থাকে না। তাদের ডালপালা গজায়; ডালপালায় ফুল-ফল হয়।"

এমনি সহজ সপ্রতিভ জওয়াব ওয়াঙের অসহ্য মনে হয়, তাই সে ছেলেকে রুক্ষকণ্ঠে বলে :

"আমার যা বলার বলেছি। অনেক পয়সা ঢালা হয়েছে, আর নয়। গাছের ফুল-ফল পেতে হলে শিকড়টাকে জিইয়ে রাখতে হবে।"

সন্ধ্যা নেমেছে। কথা-কাটাকাটি ওয়াঙের আর ভালো লাগে না। সে শান্ত গোধূলিতে নিভৃতি উপভোগ করতে চায়। ছেলেটা আপন ঘরে চলে যাক। কিন্তু ছেলে কোনোদিন তাকে শান্তি দেয়নি, দেবে না। ছেলে ভাবে, আপাতত যা দরকার, বাড়ির ততটুকু সংস্কার হয়ে গেছে। সুতরাং সে এখন বাবার কথা মেনে নিতে পারে। তবু সে তার হাল ছাড়ে না। বাবাকে বলে :

"যাক, থামিয়েই দিচ্ছি সব, তবে আর একটা কথা আছে।"

ওয়াঙ হাতের পাইপটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে চেঁচিয়ে ওঠে :

"আমাকে কি কোনোদিন একটু শান্তি দিবিনে? এমন জ্বালাতন করবি?"

নাঙ এনও জেদ ধরে :

"আমি আমার বা আমার ছেলের হয়ে কোনো কথা বলতে চাই না। আমি তোমারই ছেলে আমার ছোটভাইটার কথাই বলতে চাই। ও এমন অকাট মূর্খ হয়ে থাকবে, ভালো দেখায় না। তাকেও সামান্য লেখাপড়া শিখানো দরকার।"

ওয়াঙ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। এ যেন নতুন কথা! এ-ছেলের ভবিষ্যৎ সে অনেক আগেই ঠিক করে রেখেছে। সে ছেলেকে বলে :

"এ বাড়িতে আর পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই। দুজন পণ্ডিতই যথেষ্ট। আমি মরে গেলে ছেলে জোত-জমি দেখবে।"

"আর এজন্যই ও রাতে শুয়ে-শুয়ে চোখের পানি ফেলে। এজন্যই সে শুকিয়ে রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!"

ওয়াঙ লাঙ ছোটছেলেকে কোনোদিন তার মতামত জিজ্ঞেস করেনি। সে ঠিক করে ফেলেছে এক ছেলেকে জোত-জমি দেখতেই হবে। বড়ছেলের কথায় ওয়াঙ আহত হয়। নীরবে মেঝে থেকে পাইপটা উঠিয়ে ছোটছেলে সম্বন্ধে ভাবতে থাকে। এ ছেলেটা বড়ভাইদের থেকে একেবারে আলাদা প্রকৃতির, মায়ের মতন স্বল্পবাক। এই নীরবতা একে সকলের দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে। কারো মনোযোগ ওর দিকে পড়ে না।

ওয়াঙ সন্দিগ্ধমনে বড়ছেলেকে শুধায় :

"ও কি এমন কোনো কথা বলেছে?"

"তুমি নিজেই তো জিজ্ঞেস করতে পারো।" নাঙ এন জওয়াব দেয়।

"কিন্তু একজনকে তো জমিজমা দেখতেই হবে।" ওয়াঙ যুক্তি দেয়।

"কিন্তু বাবা, তোমার তো কোনো চাষি ছেলের প্রয়োজন নেই।" নাঙ অনুরোধের সুরে বলে, "তোমার তা শোভা পায় না। লোকে বলবে তুমি কৃপণ, তুমি নিজে রাজার হালে থেকে একটা ছেলেকে চাষা বানিয়েছ।"

চতুর ছেলে এবার মোক্ষম-অস্ত্র ব্যবহার করেছে। সে জানে, লোকে তার সম্বন্ধে কী বলে, এ সম্বন্ধে বাবা বড় সচেতন। তাই সে বলে যায়,

"বাড়িতে তার জন্য একজন শিক্ষকও তো রাখা যায়। বাড়িতে আমি আছি তোমাকে সাহায্য করতে, মেজো ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। ইচ্ছা করলে, ছোটকে

দক্ষিণে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া যায়। ও যা চায় সেখানে গিয়ে করুক।"

ওয়াঙ শেষপর্যন্ত বলে :

"দে ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে।"

কিছুক্ষণ পর ছোটছেলে এসে সামনে দাঁড়ায়। ওয়াঙ ছেলের পানে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তাকায়—ছেলের বুকের ভাষা পড়তে চায়। লম্বা ছিপছিপে গড়ন, বাপ-মা কারো মতোই সে নয়। কেবল মায়ের নীরব গাম্ভীর্যটুকু পেয়েছে। কিন্তু মায়ের চেয়ে সুন্দর। ছোটমেয়েটা ছাড়া বাড়ির সবার চেয়ে এর চেহারা ভালো। সে মেয়ে অবশ্য শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে পর হয়ে গেছে। ওয়াঙ-পরিবারের কেউ নয়। কিন্তু ছেলের কপালজোড়া ঘন কৃষ্ণ ভ্রুযুগল তার সৌন্দর্যে বরং হানি ঘটিয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে আছে। তার কচি পাণ্ডুর মুখে এ ভ্রু বেমানান মনে হয়। ঘন ঘন ভ্রু-সঙ্কোচন তার মুদ্রাদোষ। কোঁচকানো ভ্রু-জোড়া একসঙ্গে মিলে তার কপাল-জুড়ে ঘন-কালো রেখার সৃষ্টি করে।

ছেলেকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করে :

"তোর বড়ভাই বলছে, তুই নাকি লেখাপড়া করতে চাস?"

ছেলে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে জওয়াব দেয়, "হ্যাঁ।"

পাইপের ছাই ঝেড়ে পাইপে নতুন তামাক দিয়ে বুড়ো-আঙুলে টিপতে টিপতে ওয়াঙ আবার প্রশ্ন করে :

"তা হলে, জোত-জমির দেখাশোনা করা তোর ইচ্ছা নয়। এতগুলো ছেলে থাকতে একটা ছেলেও জোত-জমি দেখবে না; আমারও কপালে শান্তি জুটবে না, তাই না?"

তিক্তকণ্ঠে ওয়াঙ এ-কথাগুলো বলে; কিন্তু ছেলে কোনো সাড়া দেয় না। গ্রীষ্ম-বেশে আচ্ছাদিত দেহে অনড় দাঁড়িয়ে থাকে। তার নীরবতায় ক্রুদ্ধ হয়ে ওয়াঙ লাঙ চেঁচিয়ে ওঠে :

"কথা বলছিস-না কেন? তুই জমিজমার দেখাশোনায় থাকতে চাস না, এই কি সত্যি?"

ছেলে এবারও সংক্ষেপে জওয়াব দেয়, "হ্যাঁ।"

ছেলের পানে তাকিয়ে ওয়াঙ ভাবে, এই বুড়োবয়েসে এই ছেলেগুলো তার কাল হয়েছে, তারা তার মাথার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে এদের নিয়ে কী যে করবে ভেবে পায় না। ছেলেদের দুর্ব্যহারের কথা ভেবে গর্জন করে ওঠে :

"যা খুশি কর্‌গে! আমার কিছু আসে যায় না, এবার আমার সামনে থেকে দূর হ।"

ছেলেটা দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়। একলা বসে ওয়াঙ ভাবে, আমার মেয়েদুটো এ ছেলেগুলোর চেয়ে অনেক ভালো। হাবা মেয়েটা পেটের ভাত আর খেলার উপকরণ—একটুকরো কাপড় ছাড়া কিছুই চায় না। ছোটমেয়েটা তো শ্বশুরবাড়িই চলে গেছে। এসব ভাবতে ভাবতে গোধূলির ছায়া নেমে আসে। ওয়াঙ লাঙ একলা পড়ে থাকে।

মনের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ওয়াঙ বরাবর যা করে এবারও তার ব্যতিক্রম হয় না। ছেলেরা নিজেদের মর্জিমাফিক চলুক। বড়ছেলেকে ডেকে বলে :

"ছোটছেলের জন্য একজন শিক্ষক রেখে দে। ও যা-খুশি করুক গে। আমাকে যেন ঝঞ্ঝাট পোহাতে না হয়, এই আমি চাই।"

তারপর মেজোছেলেকে ডেকে বলে :

"জোত-জমি দেখার মতো ছেলে যখন আমার নেই তখন জমির বর্গার টাকা আর ফসল আদায়ের ভার তোর ওপরই রইল।"

মেজোছেলে এতে খুশি হয়; অন্তত টাকাটা তার হাত দিয়ে যাবে। জমি থেকে কত টাকা আয় হল, এটা তার জানা থাকবে। বাড়িতে বেশি খরচ হলে, সে বাবার কাছে নালিশ করতে পারবে।

মেজোছেলেটা ওয়াঙের কাছে অদ্ভুত মনে হয়। তার বিয়ের দিনেও সে মদ-মাংসে টাকাপয়সা খরচের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে। সে নিমন্ত্রিত লোকদের পানাহারের বেলায় দু'ভাগে বসিয়ে দেয়। ভালো খানা ভালো মদ তার শহরের বন্ধুদের পরিবেশন করে—যারা ভালোর মর্ম বুঝবে। তাদের প্রজাবৃন্দ আর গ্রামবাসীদের আঙিনায় বসিয়ে দিয়ে তাদের সামনে মামুলি খানা পরিবেশনের বন্দোবস্ত করে। কারণ তাদের দৈনন্দিন আহারের চেয়ে একটু উন্নত ধরনের খাবারব্যবস্থাকেই তারা অতি উত্তম বলে উপভোগ করবে।

বাইরে থেকে বিয়ে উপলক্ষে যে উপঢৌকন আসে, সেদিকেও মেজোছেলে কড়া হিসেবি নজর রাখে। চাকর-চাকরানিদের বখশিশ দেবার বেলায়ও যা। না-দিলে নয়, তাই দেয়। কোকিলার হাতে এমনি সামান্য বকশিশ পড়াতে সে নাক সিঁটকে সবার সামনেই বলে দেয় :

"বনেদি পরিবার টাকাপয়সার ব্যাপারে এত কৃপণতা করে না। যে-কেউ এ কৃপণতা দেখলে বলবে, এ বাড়ির আসল লোক এরা নয়, কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!"

এ-কথা শুনে বড়ছেলে লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। কোকিলার ক্ষুরধার মুখ চাপা দেবার জন্য সে ওর হাতে আরও টাকা গুঁজে দেয়। মেজোভাইয়ের বিরুদ্ধে তার মন রাগে বিগড়ে যায়। বিয়ের দিনে সমাগত অতিথিদের সামনেও এ দুজনের মধ্যে একপশলা কথা-কাটাকাটি হয়ে যায়।

বড়ছেলে তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিয়ে উপলক্ষে বেশি দাওয়াত করেনি, পাছে মেজোর কিপটে স্বভাবের জন্য বন্ধুবান্ধবদের সামনে তাকে লজ্জা পেতে হয়। আর বিয়েটাও তো হচ্ছে একটা গেঁয়ো-মেয়ের সাথে। কোন্ মুখে সে শহরের ভদ্রলোকদের দাওয়াত করবে! সে একপাশে দাঁড়িয়ে অবজ্ঞার সুরে বলে :

"আমার মেজোভাই মাটির হাঁড়ি বেছে নিয়েছে। অথচ আমাদের বাপের যে যশ-প্রতিপত্তি তাতে সে ইচ্ছা করলে মণিমাণিক্যের পাত্র আনতে পারত।"

বউ নিয়ে মেজোভাই তাকে সালাম করতে এলে সে সামান্য একটু মাত্র মাথা নেড়ে সালাম গ্রহণ করে। বড়বউও চালচলনে নিখুঁত। তার যা সামাজিক মর্যাদা

সে মর্যাদাটুকু বাঁচিয়ে যতটুকু মাথা নোয়ানো সম্ভব ততটুকু মাথা নুইয়ে সে তাদের সালাম গ্রহণ করে।

এই রাজপুরীর অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র ওয়াঙের শিশু-নাতি ছাড়া আর কেউ শান্তিতে নেই।

পদ্ম'র পাশের ঘরের কারুকার্যখচিত খাটে শুয়ে ওয়াঙ স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে ওঠে। স্বপ্নে সে তার পল্লিগৃহের অন্ধকার অনাড়ম্বর মেটে পাঁচিলের ঘরে ফিরে যায়। সেখানে জীবনের কোনো বাঁধা-ধারা নিয়ম নেই, যেমন খুশি চলতে পারে। পেয়ালার চা নির্বিবাদে মেঝেতে ঢেলে দিতে পারে; অসাবধানতায় বিপর্যয় ঘটাবার আশঙ্কা থাকে না। ঘর থেকে এক পা বাড়ালেই উন্মুক্ত আকাশের নিচে তার আপন মাটির স্নেহময় স্পর্শ।

ওয়াঙ লাঙের দুই ছেলের মধ্যে মনোমালিন্য লেগেই আছে। বড়ছেলের ভয়, খরচ কমিয়ে দিলে লোকের চোখে তাদের মর্যাদার হানি হবে। গাঁয়ের ইতর লোক বাড়িতে ঢুকলে তার শহরের বন্ধুদের কাছে সে লজ্জা পাবে। মেজোছেলের ভয়, পাছে অর্থের অপচয় ঘটে। আর ছোটছেলে চাষার ছেলে বনতে গিয়ে জীবনের যে-সময় নষ্ট করেছে, তার ক্ষতিপূরণ করতে সচেষ্ট।

বাড়িতে একমাত্র নাঙ এনের ছেলেই আপন জীবনে পরিতৃপ্ত। সে নিরুদ্বেগ আনন্দে টলে টলে বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়। এ বিশাল বাড়িটাই তার কর্মজগৎ। বাড়িটার বিশালতা বা সংকীর্ণতার প্রশ্ন তার মনে স্থান পায় না। এ বাড়িটা তার, এই তার কাছে পরম সত্য। এ বাড়িতে তার মা, বাবা, দাদু, সবাই তার সেবক-সেবিকা; আজ্ঞাবহ দাস-দাসী। এই ছেলেটাই ওয়াঙের একমাত্র শান্তির উৎস। সে এ ছেলের সঙ্গে হাসে, খেলে; ছেলেটা পড়ে গেলে বুকে তুলে নেয়। দিনভর ছেলেটাকে দেখে, তবু তার মন ভরে না। তার বাপ তার বড়োছেলেকে নিয়ে যা করত, তা তার মনে পড়ে যায়। সে-ও নাতির কোমরবন্ধে একটা ফিতে বেঁধে পিছনে পিছনে এ আঙিনা থেকে অন্য আঙিনায় ঘুরে বেড়ায়, যাতে চলতে গিয়ে ছেলেটা পড়ে না যায়। ছেলেটা ছোট ছোট আঙুল দিয়ে মাছের খেলা দেখায়, খলখল করে হাসে। ফুলগাছের ডগাটা ছিঁড়ে নেয়, তার মনে কোনো অস্বস্তি-উদ্বেগ নেই। এই শিশু-সঙ্গেই মাত্র ওয়াঙ শান্তি পায়।

এই একটি মাত্র শিশুই নয়। শিশুর সংখ্যা বেড়ে চলে। বড়বউ সুগৃহিণীর মতো প্রতিবৎসর পুত্রসন্তান উপহার দিয়ে চলে। প্রতি শিশুর জন্য নতুন বাঁদি আসে। মহলে প্রতিবৎসরই শিশু-সংখ্যা আর বাঁদির সংখ্যা বাড়তে থাকে। যদি কেউ এসে ওয়াঙকে বলে, "আগামী মাসে বড়ছেলের মহলে আর একটা মুখ বাড়ছে," ওয়াঙ হেসে জওয়াব দেয় :

"বেশ আসুক, মাটির দৌলতে ঘরে ভাতের অভাব নেই।"

মেজোবউ যথাসময়ে কন্যাসন্তান জন্ম দিলে ওয়াঙ খুশি হয়। এ যেন বড়বউয়ের সম্মানরক্ষার্থে। পাঁচ বছরে ওয়াঙ লাঙ চার নাতি আর তিন নাতনির দাদু হয়ে বসে। সারাবাড়িটা শিশুদের হাসি-কান্নার কোলাহলে ভরে ওঠে।

মানুষের জীবনে পাঁচবছর কাল কিছুই নয়, কিন্তু শিশু আর বৃদ্ধের বেলায় নয়। এই পাঁচটি বছর একদিকে ওয়াঙকে যেমন জনসমৃদ্ধি দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তার আফিমখোর স্বপ্নচারী চাচাকে ছিনিয়ে নেয়। সে তার চাচাকে প্রায় ভুলেই ছিল। তবে চাচা-চাচির অন্ন-বস্ত্র আর মৌতাত জুগিয়ে এসেছে।

পঞ্চম বছরে যে শীত পড়ল এমন শীত গত ত্রিশ বছরে পড়েনি। শহর পাঁচিলের চারদিককার খাত পর্যন্ত শীতে জমে গেল। খাতের উপর দিয়ে মানুষ হেঁটে বেড়াতে লাগল। তার ওপর ঈশান কোণের কনকনে বাতাস চামড়া আর পশমের পোশাক পর্যন্ত ভেদ করে গায়ে বিঁধতে লাগল। ওয়াঙের বাড়িতে কাঠকয়লা জ্বালিয়ে আগুন করা হল। কিন্তু তাতেও শীতের দৌরাত্ম্য বড় একটা কমল না।

ওয়াঙ লাঙের চাচা-চাচি বহুদিন আগেই আফিমের সাথে তাদের দেহের মাংসও খেয়ে ফেলেছে। একজোড়া শুকনো কাঠির মতো তারা দিনরাত তাদের ঠাণ্ডা বিছানায় পড়ে থাকে। ওয়াঙ লাঙ খবর পায় যে তার চাচা বিছানা থেকে উঠতে পারে না; একটু নড়াচড়া করলেই তার রক্তবমি হয়। তাই সে চাচাকে দেখতে যায়, দেখে বুঝতে পারে চাচা আর বেশিদিন টিকবে না।

ওয়াঙ লাঙ তাদের জন্য দুটো ভালো কাঠের কফিন কিনে—অবশ্য খুব ভালো কাঠের নয়—তার চাচার ঘরে নিয়ে যায়। বুড়ো অন্তত মরার আগে এই সান্ত্বনাটুকু নিয়ে যাক যে, তার অস্থি-মজ্জা রাখার একটা বন্দোবস্ত হয়েছে। কফিন দেখে বুড়ো ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে বলে :

"সত্যি বাপ, তুই-ই আমার ছেলে। সেই ছন্নছাড়া নিজের ছেলেটার চেয়েও আপন।"

তার চাচি—এখনও বুড়োর চেয়ে সবল—বলে :

"আমার ছেলের দেশে প্রত্যাবর্তনের আগে যদি আমি মরে যাই, আমাকে কথা দে, ভালো একটা মেয়ে দেখে ওকে বিয়ে দিবি। যাতে আমাদের বংশধারা লোপ না পায়।"

ওয়াঙ প্রতিজ্ঞা করে।

ঠিক কোন্ সময়ে বুড়ো মারা গেল ওয়াঙ জানতে পারল না। শুধু শুনল, দাসীটা তার খাবার দিতে গিয়ে দেখে বুড়ো মরে পড়ে আছে। এক তীব্র শীতের দিনে ওয়াঙ তাদের পরিবারিক কবরস্থানে তার বাবার কবরের পাশেই চাচার কবর দেয়। তার বাবার কবরের একটু নিচে, আর তার নিজের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের ঠিক উপরে।

ওয়াঙ পরিবারের সবাইকে দিয়ে শোকচিহ্ন ধারণ করায়। সবাই একবছর শোকচিহ্ন ধারণ করে রাখে। এ শোকচিহ্ন শোকপ্রকাশের প্রতীক নয়, কারণ এই বুড়োর মৃত্যুতে কারো মনে দুঃখ হয়নি, বরং এ বুড়ো বেঁচে থাকতে জ্বালাতনই শুধু করেছে। আত্মীয়-বিয়োগে শোকচিহ্ন ধারণ বনেদি-পরিবারের রেওয়াজ বলেই তারা শোকচিহ্ন ধারণ করে।

বুড়িকে আর একলা গাঁয়ের বাড়িতে না-রেখে ওয়াঙ শহরের বাড়িতে নিয়ে আসে; তাকে মহলের কোণের একটা ঘর দিয়ে দেয়। কোকিলাকে বুড়ির সেবা-শুশ্রূষার জন্য একজন দাসী নিযুক্ত করে, তার তত্ত্বাবধানে রাখতে বলে দেয়। বুড়ি পরম তৃপ্তিতে আফিমের পাইপ টানে আর দিনরাত ঘুমোয়। তার কফিনটাও তার পাশেই পড়ে থাকে।

ওয়াঙ ভেবে বিস্মিত হয়, যে-স্থূলকায়া ক্ষুরধার-রসনা গেঁয়ো স্ত্রীলোকটিকে সে এককালে ভয় করত, সে স্ত্রীলোকটি শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে। তার মুখ দিয়ে কথা ফোটে না। অবলুপ্ত-গৌরব হোয়াঙ-জমিদারবাড়ির কর্ত্রীর কথা ওয়াঙের মনে পড়ে।

একত্রিশ

ওয়াঙ সারাজীবন যুদ্ধের কথা শুনে আসছে; কিন্তু চোখের সামনে কোনোদিন সে যুদ্ধ দেখেনি। একবার মাত্র যৌবনে সেই দক্ষিণের শহরে সে যুদ্ধের আভাস পেয়েছিল। এর চেয়ে যুদ্ধের কাছাকাছি সে কোনোদিন যায়নি। যদিও শৈশব থেকে সে লোকের মুখে শুনে এসেছে, "এবার পশ্চিমে যুদ্ধ হচ্ছে" বা "পূর্বে বা উত্তর-পূর্বে যুদ্ধ হচ্ছে।"

তার মতে যুদ্ধ আকাশ-মাটি আর পানির মতো জিনিস। কেন হয়, তা কেউ জানে না। মাঝে মাঝে সে লোকদের বলতে শোনে— "আমরা যুদ্ধে যাব।" দুর্ভিক্ষের সময় এ-কথাগুলো বেশি শোনা যায়। ভিক্ষাবৃত্তির হীনতার চেয়ে যুদ্ধের দুঃখ-কষ্ট তারা পছন্দ করে। অনেকে—যেমন তার চাচার ছেলে—বাড়িতে থেকে অস্থির হয়ে উঠলে এ-কথা বলে। এতদিন দূরেই যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু অকারণ হাওয়ার মতো সহসা যুদ্ধটা তার ঘরের কোণে এগিয়ে আসে।

ওয়াঙ লাঙ তার মেজোছেলের মুখেই এ-কথাটা প্রথম শুনতে পায়। দুপুরবেলায় খেতে এসে বাপকে বলে :

"শস্যের বাজার হঠাৎ চড়ে গেছে। দক্ষিণের যুদ্ধ নাকি এদিকে এগিয়ে আসছে। শস্য বিক্রি না দিয়ে ধরে রাখাই ভালো। যুদ্ধ যত এগিয়ে আসবে বাজারও তত চড়বে। শেষপর্যন্ত খুব চড়া দাম পাব।"

খেতে খেতে ওয়াঙ একথা শুনে বলে :

"যুদ্ধটা একটা মজার ব্যাপার। আমার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সারাজীবন কানেই শুনলাম, চোখে দেখলাম না।"

তার মনে পড়ে সেবার সিপাইরা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে বলে কী ভয় সে পেয়েছিল। এখন সে ভয় নেই। একে তো বয়েস হয়েছে, তার ওপর তার টাকা হয়েছে। বুড়োমানুষ যুদ্ধের কাজে লাগে না, আর ধনী লোকের তো কোনো ভয়ই নেই। টাকার জোরে সে সব ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে। যুদ্ধ সম্বন্ধে তার

এতটুকু কৌতূহল মাত্র আছে। তাই এ সম্বন্ধে সে আর মাথা ঘামায় না। নির্লিপ্ত কণ্ঠে ছেলেকে বলে :

"যা ভালো মনে করিস তাই কর্। শস্য বিক্রি করা না-করা তোর হাতে।"

ওয়াঙ এখন মেজাজ ভালো থাকলে নাতি-নাতনীদের সঙ্গে খেলা করে; ভালো না-লাগলে খায়-দায় ঘুমায়। মাঝে মাঝে বাড়ির এককোণে বসা হাবা মেয়েটাকে দেখতে যায়।

গ্রীষ্মের প্রথমদিকে ঈশান-কোণ থেকে পঙ্গপালের ঝাঁকের মতো মানুষের ঝাঁক শহরে এসে পৌঁছে। সকালবেলায় ওয়াঙের এক নাতি ভৃত্যের সাথে দাঁড়িয়ে সারি সারি ধূসরবর্ণের কোট-পরা লোক দেখে ছুটে এসে দাদুকে বলে,

"দাদু এসে দ্যাখো কী আসছে!"

নাতিকে খুশি করার জন্য দাদু ফটকে গিয়ে দেখে অসংখ্য মানুষে পথ-ঘাট আর সারা শহর ছেয়ে গেছে। তাদের তালে তালে চলার দাপটে আলো বাতাস স্তব্ধ। ওয়াঙ তাদের নিরীক্ষণ করে। তাদের প্রত্যেকের হাতে মাথায় ছোরা-লাগানো একরকম অস্ত্র; মুখে বন্য ভীষণতা। তাদের মধ্যে বালকও রয়েছে; কিন্তু তাদের চেহারাও অন্যদের মতন। ওয়াঙ নাতিকে তাড়াতাড়ি কাছে টেনে এনে বলে :

"এসো মণি, ফটক বন্ধ করে চলে যাই; এরা লোক ভালো নয়!"

মুখ ফিরিয়ে নেবার আগেই, সহসা জনসমুদ্রের মাঝখান থেকে কে চেঁচিয়ে ওঠে :

"ঐ যে ভাই; আমার বুড়ো বাপের ভাইপো!"

ওয়াঙ ডাক শুনে চোখ তুলে তার চাচার ছেলেকে দেখতে পায়। তার পরনেও অন্যদের মতন ময়লা ধূসর পোশাক; কিন্তু তার চেহারা আরও বন্য, আরও ভয়াল। সে হেসে সঙ্গীদের বলে :

"সাথীরা, এখানে আমরা থাকতে পারি। বড়লোক। আমার আত্মীয়।"

ভীত ওয়াঙ সেখান থেকে নড়ার আগেই, মানুষের ঝাঁক তার পাশ কাটিয়ে ফটকের ভিতর ঢুকে পড়ে। অসহায় ওয়াঙ স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে থাকে। নর্দমার ময়লা পানির মতো সৈন্যদলে সারা আঙিনা ভেসে যায়। তারা যথেচ্ছভাবে বাড়ির মেঝের উপর শুয়ে গড়াগড়ি দেয়, জলাশয়ের পানি পান করে, হাতমুখ ধোয়। কারুকার্য-করা টেবিলে তাদের ছোরা ধার দেয়। যেখানে খুশি থুতু ফেলে, চেঁচামেচি করে। বাড়ির আবহাওয়াটাই তারা পঙ্কিল, বিষাক্ত করে তোলে।

নিরাশ মনে ওয়াঙ নাতিকে নিয়ে মহলে ঢুকে বড়ছেলের খোঁজ করে। আপন মহলে বসে বড়ছেলে তখন কী একটা বই পড়ছিল। বাবার মুখে এ কাহিনী শুনে আর্তনাদ করে ওঠে।

গোঙাতে গোঙাতে বাইরে এসে বখাটে বদমায়েশটাকে দেখতে পেয়ে গালাগালি করবে, না আপ্যায়ন করবে বুঝতে পারে না। পিছনে দণ্ডায়মান বাবাকে কান্নার সুরে বলে :

"প্রত্যেকের কাছে যে ছোরা রয়েছে!"

তাই সৌজন্য-সহকারে বলে :

"চাচা যে! এসো, এসো, এ যে তোমারই ঘরবাড়ি।"

চাচা দাঁতের পাটি বের করে হেসে বলে :

"কয়েকজন মেহমানও যে আমার সঙ্গে রয়েছে।

"তোমার বন্ধু! বেশ তো! তাদেরও নিয়ে এসো। আমি সবার আহারের বন্দোবস্ত করছি, যাতে তোমরা খেয়ে যেতে পারো।" নাঙ এন ভদ্রকণ্ঠে বলে।

তার চাচা তেমনি দাঁত বের করে বলে :

"তা করো কিন্তু এত তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করে, অবশ্য দু'দিনও হতে পারে, মাসও হতে পারে, আবার বছরও হতে পারে, অর্থাৎ যতদিন লড়াইয়ে যাওয়ার ডাক না পড়ে, ততদিন আমরা এখানেই থাকব।"

একথা শুনে পিতা-পুত্রের মনে নৈরাশ্যের ঝড় ওঠে; কিন্তু ছোরার ভয়ে নৈরাশ্য গোপন করে, যথাসম্ভব মুখে হাসি মেখে আপ্যায়নের সুরে বলে :

"সে তো আমাদের সৌভাগ্য! পরম সৌভাগ্য!"

বড়ছেলে যেন তাদের আহারের বন্দোবস্ত করতে ছুটছে; এমনি ভাব দেখিয়ে বাপকে নিয়ে ভিতরমহলে ঢুকে দরজায় আগল দেয়। ভীতি-বিহ্বল পিতা-পুত্র মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

মেজোছেলে ছুটতে ছুটতে এসে দুয়ারে করাঘাত করে। দুয়ার খুলে দিতেই ভিতরে হুমড়ি খেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে :

"শহরের প্রতি বাড়িতে সিপাইরা জায়গা নিয়েছে, গরিবদেরও বাদ দেয়নি। প্রতিবাদ কোরো না যেন, এ-কথা বলতেই ছুটে এলাম। আমার দোকানের এক কেরানির ঘটনা শুনলাম, সে বেচারি খবর পেয়ে বাড়ি গিয়ে দেখে তার রুগ্ণ স্ত্রীর ঘরে সিপাইরা আড্ডা নিয়েছে। সে প্রতিবাদ করতেই একজন সিপাই ছোরা বসিয়ে বেচারার বুক এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে দিল; শরীরটা যেন একটা চর্বির ঢেলা আর কী! এই সিপাইরা যা চায়, তাই যেন সরবরাহ করা হয়। শুধু প্রার্থনা করো, যুদ্ধটা যেন শিগগির অন্য অঞ্চলে সরে পড়ে, আপদগুলো বিদায় হোক।

তিনজন ক্লিষ্ট মুখে পরস্পরের পানে তাকায়। এই বুভুক্ষিত পশুগুলোর কামানল থেকে বাড়ির মেয়েদের কেমন করে রক্ষা করবে, এই তাদের ভাবনা। বড়ছেলে তার সুন্দরী স্ত্রীর কথা ভেবে বলে :

"সবচাইতে ভিতরমহলে সব মেয়েদের রেখে আগল দিয়ে দেওয়া যাক, দিনরাত চব্বিশঘণ্টা আমাদের পাহারা দিতে হবে। খিড়কি দরজাটা খোলা থাকবে, প্রয়োজন হলে যাতে পালানো যায়।"

তাই করা হয়। কোকিলা আর তার বাঁদি নিয়ে পদ্ম যে-মহলে থাকত, সেই ভিতরের মহলে সব মেয়ে আর শিশুদের রাখা হয়। অসুবিধার মধ্যে সেখানে

তাদের সময় কাটে। ওয়াঙ লাঙ আর বড়ছেলে পালা করে পাহারা দেয়। অবসর পেলে মেজোছেলেও আসে। এমনি করে দিনরাত কড়া পাহারা চলে।

কিন্তু তাদের বখাটে আত্মীয়কে কোনোমতেই ঠেকানো যায় না। সে এ-বাড়ির আত্মীয়; সুতরাং আইনত তার প্রবেশ নিষেধ করা যায় না। দরজা ধাক্কিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে। আপন মর্জিমাফিক হাতে চকচকে ছোরাটা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বড়ছেলে তিক্তমুখে তার অনুসরণ করে, ছোরার ভয়ে কিছু বলতে সাহস পায় না। তার চাচা সবকিছু দেখে, মেয়েদের রূপের প্রশংসা করে।

বড়ছেলের বউকে দেখে কর্কশ কুৎসিত হাসি হেসে বলে :

"চমৎকার শহুরে জিনিসটা তো জোগাড় করেছ বাপু! পদ্মকুঁড়ির মতো ছোট্ট সুন্দর পা-দুখানা!" মেজোছেলের বউকে দেখে বলে, "বাহ্, মোটাসোটা গেঁয়ো লাল মুলোটি—লাল গোশ্‌তের টুকরো!"

মেজোবউকে একথা বলার কারণ, মেয়েটি স্থূলকায় আর লালচে; দেখতে মন্দ নয়। বড়বউয়ের ওপর তার চোখ পড়তেই বড়বউ সঙ্কোচে মুখ লুকিয়ে সরে পড়ে; মেজোবউ এ রসিকতায় হেসে জওয়াব দেয় :

"লাল মুলোর বা লাল গোশ্‌ত পছন্দ করার মতো মানুষও আছে!"

তার কথায় সে চট করে জওয়াব দেয় :

"আমিই তা পছন্দ করি," বলেই সে যেন মেজোবউকে ধরতে এগিয়ে যায়।

মেজোবউয়ের এর সাথে কথা বলাই উচিত নয়। এই অবস্থায় তার এই বেহায়াপনায় নাঙ এন লজ্জায় মরে যায়, বিশেষত তার বউয়ের সামনে। তার বউ শহুরে মেয়ে; তাদের চেয়ে বংশমর্যাদায় উঁচু। বউয়ের সামনে নাঙ এনের এই ভীরুতা দেখে তার গুণধর চাচা তিক্তকণ্ঠে বলে ওঠে :

"এমন হিমশীতল বিস্বাদ মাছের চেয়ে লাল মুলোই আমার ভালো।"

এই কথায় বড়বউ মর্যাদা-গর্বিণীর মতো সেখান থেকে উঠে অন্দরমহলে চলে যায়। তার এমনি ক'রে চলে যাওয়া দেখে চাচা অট্টহাসি হেসে হুঁকো পানরত পদ্মকে বলে,

"শহুরে মেয়েরা এমনি খুঁতখুঁতে বটে! তাই নাকি বড়বিবি?" তারপর পদ্ম'র পানে ভালো করে তাকিয়ে বলে, "বড় বিবিই তো দেখছি! কী পাহাড়ের মতো মোটা হয়েছ! বড়লোকের বউ না হলে এমনটি হয়।"

'বড় বিবি' সম্বোধনে পদ্ম আনন্দে ফেটে পড়ে। কারণ বনেদি ঘরের বউদেরই এ সম্বোধন করা হয়। পদ্ম হেসে লুটিয়ে পড়ে হুঁকোর ছাইটা ফেলে বাঁদির হাতে দিয়ে কোকিলাকে ডেকে বলে, "এ লোকটা রসিকতা জানে বটে।"

এই কথা বলার সময় পদ্ম লোকটার পানে কামনাতুর দৃষ্টি হানে। তার চোখের আর সেই এপ্রিকট-আকৃতি নেই; এ দৃষ্টিতে আগের মতো মোহ-সৃষ্টি করতে পারে না। তার এ চোখের চাওয়ায় লোকটা অট্টহাসি হেসে চেঁচিয়ে ওঠে :

"এ যে এখনও সেই কুত্তিই রয়ে গেছে।" বলেই আবার হাসতে থাকে।

নাঙ নিষ্ফল ক্রোধ চেপে এসব দেখে যায়। কোনো কথা বলে না।

সবকিছু দেখা শেষ করে তার সিপাই চাচা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়। ওয়াঙ লাঙও তার সঙ্গে যায়। বুড়ি তার বিছানায় এমনি ঘুম ঘুমিয়ে আছে যে, ছেলে তার ঘুম ভাঙাতেই পারে না। মায়ের মাথার কাছে মেঝেতে বন্দুক ঠুকে শেষপর্যন্ত সে তার মায়ের ঘুম ভাঙাতে সক্ষম হয়। স্বপ্নভাঙা চোখে মা ছেলের পানে তাকায়। ছেলে অধীর কণ্ঠে বলে :

"তোমার ছেলে এসেছে, আর তোমার ঘুমই ভাঙছে না!"

বিস্মিত বুড়ি কোনোরকমে বিছানা থেকে সামান্য গা তুলে ফ্যালফ্যাল করে ছেলের পানে তাকিয়ে বলে :

"ছেলে—ওগো আমার ছেলে—" বলেই আর কী করবে ভেবে না-পেয়ে যেন ছেলেকে আফিমের পাইপটা এগিয়ে দেয়। এর চেয়ে ভালো কিছুর কথা ও যেন ভাবতেই পারে না। দাসীকে বলে :

"দে, ওকে সেজে দে।"

মায়ের পানে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে ছেলে বলে :

"না, আমার লাগবে না।"

তাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ওয়াঙ সহসা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ছেলে যদি তার কৈফিয়ৎ চেয়ে বসে, তার মায়ের এমন দশা হল কেন?

ওয়াঙ লাঙ নিজ থেকে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে :

"কত বলি, কিছুতেই আফিমের পরিমাণ কমাবে না। তার আফিমে রোজ মুঠো-ভরা টাকা যায়। এই বয়েসে তাকে চটাতেও পারি না।" সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অপাঙ্গে বুড়ির ছেলের পানে তাকায়। সে কোনো কথা না বলে নিষ্পলক চোখে মায়ের করুণ দশা দেখে। মা আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেই সে খুট্‌খুট্‌ করে বন্দুক ঠুকতে ঠুকতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বাইরের এতগুলো লোকের মধ্যে এ-বাড়ির লোকেরা তাদের আত্মীয়টির মতো কাউকে এত ভয়-ঘৃণা করে না। বাইরের লোকেরা যদিও তাদের বাড়িটার কম সর্বনাশ করে না। তারা বন্যপশুর মতো ফুল-ফলের গাছ ছেঁড়ে, বুটের আঘাতে কারুকার্য-করা চেয়ার টেবিল ভাঙে, সুন্দর জলাশয়গুলোতে আবর্জনা ফেলে। সুন্দর মাছগুলো মরে ফুলে চিৎ হয়ে ভেসে ওঠে।

তাদের আত্মীয় সিপাইটি বাড়িময় ঘুরে বেড়ায় আর দাসী-বাঁদিদের ওপর নজর দেয়। ওয়াঙ লাঙ আর তার ছেলেরা মুখ-দেখাদেখি করে। অনিদ্রায় তাদের চোখ কোটরে বসে গেছে। তাদের এ দশা দেখে কোকিলা একদিন তাদের পথ দেখিয়ে দেয় :

"একমাত্র উপায় ওকে একটা দাসী দিয়ে দাও। যতদিন থাকে ওটাকে নিয়েই পড়ে থাকুক। না হলে, যেখানে হাত দেবার নয় সেখানে হাত দেবে।"

ওয়াঙ সাগ্রহে কোকিলার প্রস্তাবটা মেনে নেয়। এই ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে বলে :

"কথাটা মন্দ নয়।"

কোকিলা ভাইকে জিজ্ঞেস করে আসুক, কোন্ দাসীটা সে চায়। সবাইকে তো সে দেখেছে!

কোকিলা ফিরে এসে জানায় :

"পদ্ম'র সাথে যে মেয়েটা শোয়, সেই ছোট্ট রোগা মেয়েটিকে সে চায়।"

এই বাঁদিটার নাম কলি। একেই এক দুর্ভিক্ষের বছর ওয়াঙ কিনেছিল। এ তখন ছোট্ট ছিল—অনাহার অর্ধাহারে রোগা বিষাদ করুণ চেহারা। এর শরীরটা নাজুক বলে সবাই তাকে আদর করত। তাকে কোনো ভারী কাজ করতে দিত না। সে শুধু পদ্ম আর কোকিলার ফাই-ফরমায়েশ খাটত, পদ্ম'র তামাক ভরে দিত, চা ঢালত। এখানেই ওয়াঙের চাচার ছেলে একে দেখে।

কলি তখন পদ্ম'র চা ঢালছিল। কোকিলার কথা শুনেই কেঁদে ওঠে। তার হাত থেকে চা-দানি পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। ঘরের মেঝেয় চা গড়িয়ে পড়ে। কলির সেদিকে দৃকপাত নেই। সে পদ্ম'র পায়ের তলায় উবু হয়ে পড়ে, মেঝেতে মাথা খুঁড়ে আর কেবল কাঁদে :

"মা, মা, আমাকে নয়—আমাকে নয়—আমার ওকে ভয় লাগে!"

পদ্ম বিরক্ত হয়ে বলে :

"ও তো পুরুষ; বাঘ নয় যে খেয়ে ফেলবে! মেয়েমানুষের কাছে সব পুরুষ এক। এ নিয়ে এত ন্যাকামো আর হৈচৈ কেন?" কোকিলাকে লক্ষ করে বলে, "এ বাঁদিকে নিয়ে ওর কাছে দিয়ে আয়।"

এবার কলি করজোড়ে মিনতি জানিয়ে করুণ কান্না কাঁদে। ও যেন ভয়ে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে। তার ছোট্ট দেহ ভয়ে কাঁপে; সবার মুখের পানে কাকুতি-ভরা করুণ-চোখে তাকায়।

পদ্ম'র কথার বিরুদ্ধে ছেলেরা কথা বলতে পারে না, তাদের বউয়েরাও না। ছোটছেলেটা পদ্ম'র পানে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকে। তার হাতদুটো নিষ্ফল ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যায়; ভ্রু কুঁচকে ওঠে। বাড়ির শিশু আর দাসীর দল নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে; কেবল শোনা যায় এই ভীত শঙ্কিত বালিকার মর্মন্তুদ বিলাপ-ধ্বনি।

ওয়াঙ লাঙ অস্বস্তি অনুভব করে; সে স্বভাবকোমল মানুষ। পদ্মকে রাগাবার সাহসও তার নেই। সে ভীরু-দ্বিধা-ভরা চোখে কলির পানে তাকায়। কলি ওয়াঙের মুখের অভিব্যক্তিতে তার মনের ইচ্ছা বুঝতে পারে। ছুটে গিয়ে ওয়াঙের পাদুটো জড়িয়ে মাথা কুটতে থাকে। ওয়াঙ ভূলুণ্ঠিতা কলির পানে তাকায়। কী থর থর করে কাঁপছে এই ছোট্ট দেহখানা! তার চোখের সামনে তার চাচাত ভাইয়ের জানোয়ারের মতো বিরাট দেহটা ভেসে ওঠে। প্রৌঢ়ত্বে ঢলে পড়েছে সে-দেহের যৌবন, একথা ভাবতেই তার মন বিস্বাদে ভরে যায়। কোকিলা মৃদুকণ্ঠে বলে :

"মেয়েটার ওপর জবরদস্তি করা অন্যায়।"

পদ্ম খেঁকিয়ে ওঠে :

"না, যা হুকুম ওকে তাই করতে হবে। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত কান্নাকাটি আদিখ্যেতা। সব মেয়ের জীবনেই একদিন-না-একদিন এ ঘটবেই।"

ওয়াঙ প্রণয়ের সুরে পদ্মকে বলে :

"আহাহা, দেখাই যাক না অন্য কোনো উপায় করা যায় কি না। একে তোমার ভালো না-লাগলে অন্য বাঁদি তোমাকে কিনে দেব। যা চাও তাই তোমাকে দেব, কিছু করা যায় কি না, দেখা যাক।"

একটা বিদেশি ঘড়ি আর একটা চুনির আঙটির শখ পদ্ম'র মনে অনেকদিন অবধি রয়েছে। ওয়াঙের কথায় সে নীরব হয়ে যায়। ওয়াঙ এবার কোকিলাকে ডেকে বলে :

"তাকে গিয়ে বলো যে এ বাঁদিটার দেহে এক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি রয়েছে। এ সত্ত্বেও যদি সে তাকে চায়, আমাদের আপত্তি নেই। সে যদি এ-কথায় ভয় পায়, তবে তাকে বোলো যে, আমাদের ঘরে আর একটা নিটোল স্বাস্থ্যবতী বাঁদিও রয়েছে।"

এই বলে ওয়াঙ বাঁদিদের দিকে তাকায়, তারা মুখ ফিরিয়ে খিলখিল করে হাসে, যেন কত লজ্জা পেয়েছে। একজন কুড়ি-একুশ বছরের মোটাসোটা বাঁদি লজ্জায় লাল হয়ে হেসে বলে :

"বেশ, এ-সব কথা আমি অনেক শুনেছি। এ সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা আছে; অবশ্য যে যদি আমাকে গ্রহণ করে। দেখতেও তো লোকটা খুব কুৎসিত নয়, তার চেয়ে কুৎসিত পুরুষ অনেক আছে।"

ওয়াঙ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে :

"বেশ, তুই-ই যা।"

কোকিলা বলে ওঠে :

"আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়, খুব কাছে থাকিস কিন্তু। কারণ আমি জানি, এই বুভুক্ষু জানোয়ারটা সামনে যাকে পাবে তার ওপরই লাফিয়ে পড়বে।" এই বলে তারা দু'জন বেরিয়ে যায়।

কলি ওয়াঙের পা আঁকড়ে ধরে রাখে, কান্না থামিয়ে ঘটনাপ্রবাহ দেখে। কুপিতা পদ্ম একটি কথাও না বলে আপন ঘরে চলে যায়। ওয়াঙ লুণ্ঠিতা কলিকে ধরে তোলে। আনত চোখে ম্লান মুখখানা নিয়ে কলি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কোমল-পেলব ডিম্বাকৃতি মুখাবয়ব আর সুন্দর ম্লান, ছোট্ট মুখখানা ওয়াঙের চোখে পড়ে। সে দরদভরা কণ্ঠে কলিকে বলে :

"কয়দিন তোমার মনিবের চোখের সামনে থেকে দূরে দূরে থেকো। তার রাগটা পড়ুক, আর ঐ জানোয়ারটা এলে কিন্তু কাছে যেয়ো না! দেখলে হয়তো তোমাকে নিয়ে আবার টানা-হ্যাঁচড়া করবে।"

কলি মুখ তুলে পরিপূর্ণ আবেগ-ভরা কৃতজ্ঞদৃষ্টি মেলে ওয়াঙের পানে তাকিয়ে থাকে; তারপর ধীরে ধীরে ছায়ার মতো নীরবে সেখান থেকে চলে যায়।

ওয়াঙের চাচাত ভাই মাস-দেড়েক সেই মোটা দাসীকে যথেচ্ছ উপভোগ করে। দাসীটা গর্ভবতী হয়ে গর্বে বাড়ির সবাইকে বলে বেড়ায়।

সহসা ঝড়ের মুখে শুকনোপাতার মতো সিপাইরা নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। পিছনে পড়ে থাকে আবর্জনা আর ধ্বংস-চিহ্ন। ওয়াঙের চাচাত ভাই কোমরে ছোরা আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে রসিকতা করে বলে যায় :

"আর যদি ফিরে না আসি, দুঃখ নেই। আমার বংশধর অর্থাৎ মায়ের জন্য নাতি রেখে গেলাম। সবাই একজায়গায় দেড়মাস থেকে এমনি করে সন্তান রেখে যেতে পারে না। সৈনিকজীবনের এই সুবিধা আর কৃতিত্ব—সে তার বীজ ফেলে যায় আর অন্যেরা বীজ থেকে অঙ্কুরিত গাছ যত্নে বাঁচিয়ে তোলে।"

এই বলে হাসতে হাসতে সে সঙ্গীদের সাথে চলে যায়।

বত্রিশ

সৈন্যদের চলে যাওয়ার পর ওয়াঙ আর তার দুই ছেলের মধ্যে একটা ব্যাপারে অন্তত মতৈক্য দেখা গেল। ঐ বর্বর মানুষগুলোর সমস্ত অনাচারের চিহ্ন মুছে ফেলতে হবে। তারা কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি ডাকে। বাড়ির ভৃত্যেরা আঙিনায় আবর্জনা পরিষ্কার করে; কাঠমিস্ত্রিরা নিপুণ হাতে আসবাবপত্রগুলোর নষ্ট কারুকার্যের উদ্ধার করে; রাজমিস্ত্রিরা বাড়ির ভাঙাচোরা আর ক্ষতচিহ্নগুলো মেরামত করে; জলাশয়গুলোর ময়লা পানি নিষ্কাশন ক'রে আবার টাটকা পানি ভরা হয়। নাঙ এন নতুন করে সোনালি মাছ কিনে আনে, ফুলগাছ লাগায়; ধ্বংসাবশিষ্ট গাছগুলো কেটেছেঁটে ঠিক করে। একবছরের মধ্যে বাড়িটার পূর্ব শ্রী-শৃঙ্খলা ফিরে আসে; বাড়িটা আবার লতা-পুষ্পে মনোরম হয়ে ওঠে। ছেলেরা যার যার মহলে চলে যায়।

ওয়াঙের সৈনিক ভাইয়ের সন্তানসম্ভবা প্রিয়া দাসীটি ওয়াঙের নির্দেশে তার চাচির সেবার ভার গ্রহণ করে। মৃত্যুর পর বুড়ির মৃতদেহ কফিনে স্থাপনের ভারও তাকেই দেওয়া হয়। দাসীটির গর্ভে একটা কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করাতে ওয়াঙ খুশিই হয়। পুত্রসন্তান হলে গর্বিতা দাসী ছেলের জন্য এ বাড়িতে একটা পারিবারিক অধিকার দাবি করে বসত। দাসীর মেয়ে দাসীই হবে, এর বেশি অধিকার তার হতে পারে না।

ওয়াঙ দাসীর ওপর সুবিচার করে। ন্যায়পরায়ণতা তার স্বভাবসিদ্ধ। সে দাসীকে বলে দেয় বুড়ির মৃত্যুর পর সে ইচ্ছা করলে বুড়ির ঘরটা নিতে পারে। বুড়ির বিছানাটাও তারই রইল, বাড়ির ষাটখানা ঘরের মধ্যে একখানা ঘর দিয়ে দিলে ওয়াঙের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হবে না। দাসীকে সে সামান্য নগদ টাকাও দেয়। দাসী অত্যন্ত খুশি হয়, তবে তার আর একটা মাত্র আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। ওয়াঙ টাকাটা তার হাতে দিতে গেলে সে বলে :

"টাকাটা আমার যৌতুক হিসেবে আপনার কাছেই থাকুক। যদি আপনার কোনো অসুবিধা না হয়, তবে আমাকে আপনার কোনো কিষাণ বা কোনো গরিব

ভালোমানুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। এতে আপনার পুণ্য হবে। একবার পুরুষসঙ্গ ভোগ ক'রে নিঃসঙ্গ জীবনে আমার কষ্ট হচ্ছে।"

ওয়াঙ লাঙ কথা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার মনের পর্দায় এক ভুলে-যাওয়া স্মৃতি ভেসে ওঠে। একজন গরিবের হাতে তুলে দেবে বলে মেয়েটাকে সে কথা দিচ্ছে। একদিন সে-ও গরিব ছিল, ঠিক এই মহলেই সে তার জীবনসঙ্গিনী ভিক্ষা চাইতে এসেছিল। অথচ সেই জীবনসঙ্গিনী ওলানের কথা তার এখন মনেই পড়ছে না; ওলানের কথা মনে পড়লেও তার মন দুঃখ-ভারে নুয়ে পড়ে না; স্মৃতির ভারে ক্ষণিক বিষণ্ন হয় মাত্র। ওলানের মরচে-ধরা স্মৃতি তার মনকে ছুঁয়ে যায়। সে গভীর কণ্ঠে দাসীকে বলে :

"আফিমখোর বুড়ি শিগগিরই মরবে; তখন তোমাকে একজন পুরুষের হাতে তুলে দেব।"

ওয়াঙ তার কথার খেলাফ করে না। একদিন সকালবেলায় দাসী এসে জানায়, "এবার আপনার কথা রাখুন হুজুর। বুড়ি আজ খুব সকালে মারা গেছে। রাতের ঘুম আর তার ভাঙেনি, আমি তার মৃতদেহ কফিনে পুরে এসেছি।"

ওয়াঙ লাঙ তার কিষাণদের মধ্যে কাউকে পাওয়া যায় কি না, তাই খোঁজে। সেই দাঁত-উঁচু বোকা জোয়ান ছেলেটার কথা মনে পড়ে। সেই ছেলেটাই তো চিঙের মৃত্যুর কারণ, যদিও এতে তার কোনো দোষ ছিল না।

ওয়াঙ ছেলেটাকে ডেকে পাঠায়। আরও জোয়ান হয়েছে বটে কিন্তু চেহারা ঠিক আগের মতোই আছে। ওয়াঙের মাথায় এক অদ্ভুত খেয়াল চাপে। সে হলঘরের মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করে এ দুজনকে কাছে ডাকে। সে তার জীবনের এই পরম মুহূর্তটুকু উপভোগ করার মানসে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে—যেমন করে একদিন এ বাড়ির বড়বেগম তাকে আর ওলানকে বলেছিল, ঠিক তেমনি করে বলে—

"দ্যাখ্ বেটা! এই তোর মেয়েমানুষ। পছন্দ করে বিয়ে করতে পারিস! আমার চাচার ছেলে ছাড়া কেউ ওকে স্পর্শ করেনি।"

লোকটা কৃতজ্ঞচিত্তে মেয়েটাকে গ্রহণ করে। মেয়েটা শক্ত-সমর্থ, সাদাসিধে। তার মতো গরিবকে মেয়ে দেবে কে?

ওয়াঙ মঞ্চ থেকে নেমে আসে। আজ ওয়াঙের কামনা-বাসনা পূর্ণ হল। জীবনে সে স্বপ্নাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। এ অসম্ভব সাফল্য কেমন ক'রে হল, নিজেও তা জানে না। এবার তার জীবনে সত্যিকার শান্তি আসবে; সে নিশ্চিন্ত চিত্তে এবার রোদে বসে ঝিমোতে পারবে। নিশ্চিন্ত জীবনোপভোগের সময় তার এসেছে। তার বয়েস পঁয়ষট্টির কোঠায় পড়েছে। নাতিরা তার চারদিকে কচি বাঁশের মতো বেড়ে উঠছে। বড়ছেলের ঘরে তিনটে, মেজোছেলের ঘরে দুই ছেলে। ছোটছেলেটার বিয়েটা বাকি। তাড়াতাড়ি সারতে হবে। তবেই সব ঝামেলা ফুরিয়ে গেল। তবেই তার জীবন হবে নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিময়।

ওয়াঙের জীবনে শান্তি নেই। এই যেন ভাগ্যলিপি। বন্য মৌমাছির ঝাঁকের মতো সৈন্যরা তার বাড়িতে হুলের অভিশাপ রেখে চলে গেছে। এক মহলে থাকতে

দুই বউয়ের মধ্যে অন্তত ভদ্রতার মুখোশটুকু ছিল, কিন্তু দুই মহলে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর দুজনের হিংসা-বিদ্বেষ প্রকট হয়ে ওঠে। দুজনের মধ্যে কোন্দল লেগেই থাকে। এই কোন্দল ওদের ছেলেমেয়েদের উপলক্ষ করে। অবোধ ছেলেমেয়েরা একত্র খেলা করে, আবার আপোষে মারপিটও করে। এই মারামারির মাঝখানে তাদের মায়েরা এসে দাঁড়ায়। মেয়েলি কোন্দল। তারা আপন সন্তানের পক্ষ সমর্থন করে কোমর বেঁধে লাগে। এ ওর ছেলেকে মারে, ও এর ছেলেকে মারে। এমনি করে অহরহ তাদের কোন্দল চলে।

বড়বউ খোঁচা দিয়ে বলে :

"যে-মেয়ে পরপুরুষের সাথে বেহায়ার মতো কুৎসিত রসিকতা করতে সাহস পায়, সে-ছোটজাতের মেয়েকে পরিবারে ঠাঁই দেওয়া বিপদ।"

মেজোবউও এ-কথা শুনে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে :

"বড় জাকে ঠাণ্ডা মাছ বলেছিল বলে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরছে।"

দুজনের মধ্যে চোখরাঙানি চলে।

বংশমর্যাদা-গর্বিত বউ কথা-কাটাকাটি গালাগালি করে আপন মর্যাদা নষ্ট করে না; নীরবে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তার ছেলেমেয়ে মেজোবউয়ের মহলে গেলে চেঁচিয়ে ওঠে :

"ছোটলোকের বাচ্চাদের সঙ্গে যেতে তোদের বারণ করলাম, তবু যাচ্ছিস? দেখাচ্ছি মজা!"

মেজোবউকে শুনিয়ে দেখিয়ে সে এসব কথা বলে। মেজোবউও ছাড়ার পাত্রী নয়। সে-ও তার ছেলেমেয়েদের বলে :

"সাপের সাথে খেলা করিস না, ছোবল মারবে।"

এমনি করে দুজনের শত্রুতা বেড়ে চলে। দুই ভাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য এ শত্রুতায় ইন্ধন যোগায়। বড়ভাইয়ের ভয় তার উচ্চবংশসম্ভূতা বউয়ের কাছে তার বংশের নীচতা ধরা না পড়ে; মেজোভাইয়ের ভয় ভাগাভাগির আগেই বড়ভাইয়ের অপচয়ে তাদের এজমালি সম্পত্তি নষ্ট না হয়ে যায়। তা ছাড়া, বড়ভাইয়ের লজ্জা, মেজোর হাত দিয়েই সব আমদানি বাপের হাতে যায়; মেজো সংসারের আয়-ব্যয়ের সব খবর রাখে; অথচ বড় হয়েও সে সংসারের আয়-ব্যয়ের খবর রাখে না। তাকে প্রতিবার বাপের কাছে টাকার জন্য হাত পাততে হয়। এমনি করে দুই মহলে বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বাড়িতে এই অশান্তি দেখে ওয়াঙ গুমরে মরে।

তা ছাড়া, সেদিনের ঘটনার পর থেকে পদ্ম'র সাথে ওয়াঙের নিজেরও একটা গোপন মনোমালিন্য চলছে। সেদিন থেকে কলি পদ্মের চোখের কাঁটা হয়ে গেছে। কলি দিনরাত তার সেবা করে মন জুগিয়ে চলে, কিন্তু তবু তার মন পায় না।

কলির ওপর পদ্ম'র ঈর্ষা। ওয়াঙ ঘরে এলেই কলিকে ঘর থেকে বের করে দেয়। কলির ওপর নজর দেয় বলে ওয়াঙকে দোষারোপ করে। ওয়াঙ লাঙ এতদিন কলির কথা বিশেষ ভাবেনি। এই একফোঁটা মেয়েটাকে দেখলে হাবা মেয়েটার

প্রতি যেমন তার মায়া লাগে, তেমনি মায়া লাগে; এর বেশি নয়। পদ্ম'র অভিযোগে কলির দিকে ভালো করে দেখবার কথা তার মনে জাগে। কলিকে তার মনে হয়, কলি সত্যি সুন্দর; বড় সুন্দর তার মুখের স্নিগ্ধতা। বৃদ্ধ ওয়াঙের বহুদিনের সুপ্ত রক্তধারা অস্থির চাঞ্চল্যে জেগে উঠে।

"কী যে ছাই বলো, তুমিই জানো। আমি কি এখনও তরুণ আছি? তোমার ঘরেও তা সারাবছরে তিনবার আসি না।" পদ্মকে একথাগুলো হেসে বলার ফাঁকে ওয়াঙ গোপনে কলির পানে তাকায়। তার রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

অন্যান্য ব্যাপারে যতই অজ্ঞ হোক, পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধে পদ্ম'র জ্ঞান টন্‌টনে। নারীর প্রতি পুরুষের রীতিনীতি সে ভালো করেই শিখেছে। সে জানে, নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো বার্ধক্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছে পুরুষ একবার শেষবারের মতো সংক্ষিপ্ত যৌবনজ্বালায় জ্বলে উঠে। তাই কলির ওপর তার এই ক্রোধ। সে কলিকে সেই চা-খানাটায় বেচে দেবার কথাও বলে; কিন্তু পারে না। সে আয়েশি হয়ে গেছে। বয়েসের দরুন কোকিলা আর মনোমতো সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে না। কলি চটপটে তরুণী; তার যখন যা দরকার বলার আগেই কলি তা সামনে এনে দেয়। তাই কলিকে সে বিদায় করতে পারে না, কিন্তু তাকে কাছে রাখতেও তার মন চায় না। এই অদ্ভুত সংঘাতে পড়ে পদ্ম আরও রেগে যায়। তার এই মানসিক উত্তেজনার কালে ওয়াঙ দূরে সরে থাকে। ভাবে, তার ক্রোধ প্রশমিত না-হওয়া পর্যন্ত দূরেই না-হয় রইলাম। কিন্তু এই দূরে থাকার সময়টুকু তার মনের অগোচরে সে একখানা ম্লান সুন্দর মুখের ভাবনা ভেবে কাটিয়ে দেয়।

ওয়াঙের জীবনে এই নারীঘটিত অশান্তিই যেন যথেষ্ট নয়, তাই তার ছোটছেলে আরও অশান্তি নিয়ে আসে। এই শান্ত ছেলে সারাদিন বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে; সারাদিন তার শিক্ষক তার পিছনে লেগে থাকে। তাই কেউ তার কথা বড় একটা ভাবে না।

সৈন্যরা এ-বাড়িতে থাকতে সে সবসময় তাদের সঙ্গে রয়েছে; লড়াইয়ের দুঃসাহসিক কাহিনী মন দিয়ে শুনেছে। শিক্ষকের কাছ থেকে এমন সব বই নিয়ে পড়েছে যাতে যুদ্ধের গল্প, সিউ-হুদ এলাকার ডাকাতদলের গল্প থাকত। এ-সব পড়ে তার মনে এক স্বপ্নের জগৎ গড়ে উঠেছে।

একদিন সে তার বাবাকে এসে বলে :

"আমার ভবিষ্যৎ আমি ঠিক করে ফেলেছি। সিপাই হয়ে আমি লড়াইয়ে যাব।"

তার কথায় ওয়াঙ ভয়ে-হতাশায় শিউরে ওঠে। তার জীবনে এর চেয়ে বড় সর্বনাশ আর হতে পারে না। সে চিৎকার করে ওঠে :

"এ আবার কী পাগলামি! জীবনে তোরা কি আমাকে কোনোদিন শান্তি দিবিনে?" সে ছেলের সঙ্গে তর্ক করে; ছেলের প্রশস্ত কালো ভ্রূজোড়ার সঙ্কোচন লক্ষ করে মিষ্টিকথায় তাকে বোঝায়, "একটা প্রবাদ আছে, তার-কাঁটা তৈরি করতে ইস্পাত লাগে না, সিপাই বনতেও ভালো লোক লাগে না। তুই আমার ছোট্ট

আদরের ছেলে। তুই যুদ্ধে গিয়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ালে আমার চোখে ঘুম আসবে কেমন করে?"

সঙ্কল্পে অটল-ছেলে ভ্রু-কুঞ্চিত করে বাবাকে জানিয়ে দেয় :

"আমি যাবই।"

ওয়াঙ ছেলেকে আদরে ভোলাতে চেষ্টা করে :

"যে-স্কুলে তোর মন চায়, সে-স্কুলে তুই যা। তোকে আমি দক্ষিণদেশের স্কুলে পাঠাব। যদি চাস, বিদেশের স্কুলেও পাঠাতে পারি। নতুন জিনিস দেখবি; অদ্ভুত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করবি। আমার মতো বিত্তবান লোকের ছেলে সিপাই হবে, এ যে দুর্নামের কথা।" ছেলেকে নীরব দেখে সে আবার মন-ভুলানো স্বরে বলে :

"বল্ তো জাদু, কোন্ দুঃখে তুই যুদ্ধে যেতে চাস?"

কালো ভ্রু-র নিচে ছেলের চোখ দিয়ে ওঠে। সে বাপকে সহসা বলে দেয় :

"ভীষণ লড়াই হবে বাবা। এমন ভীষণ লড়াই কোনোদিন হয়নি। দেশে বিপ্লব হবে; দেশ স্বাধীন হবে।"

এমন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথা তার কোনো ছেলে আজ পর্যন্ত বলেনি।

"এসব বিপ্লব, কী বস্তু আমি বুঝি না।" ওয়াঙ বিস্ময়ে বলে, "দেশ তো স্বাধীন আছে—আমাদের সব জোত-জমি তো মুক্তই আছে। আমি আমার ইচ্ছামতো যাকে খুশি এ জমি বর্গা দেই, এ জমি থেকে টাকা আসে, ফসল আসে, তোরা খেয়ে পরে বাঁচিস। এর চেয়ে বেশি স্বাধীনতা তুই কী চাস, আমার মাথায় ঢোকে না।"

ছেলে বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"তুমি সেকেলে মানুষ! তুমি কিছু জানো না।"

ওয়াঙ আকাশ থেকে পড়ে, অবাক বিস্ময়ে ছেলের মুখের পানে তাকায়। মুখখানা কেমন যেন ব্যথাবিহ্বল। সে আপনমনে ভাবে :

"সবই তো ওকে দিয়েছি; তার জীবন পর্যন্ত আমারই দান। আমার একটা ছেলেকেও জোত-জমি দেখাশোনার জন্য না-রেখে ওকে জোত-জমি থেকে ছাড়িয়ে আনলাম। প্রয়োজন নেই, তবু ওকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি। এই ছেলের কোনো কামনাই তো অপূর্ণ রাখিনি।"

সে ছেলের পানে আরও ভালো করে নিরীক্ষণ করে। ছেলেটা পুরোপুরি ডাগর হয়ে উঠেছে; যদিও গায়ে এখনও মাংস লাগেনি। যৌবন-চাঞ্চল্যের কোনো লক্ষণ ওর নেই। সে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে আপনমনে বিড়বিড় করে :

"ও হয়তো, আর-একটা কিছু চায়।" তারপর ধীর স্পষ্ট কণ্ঠে বলে, "তোর বিয়েটাও শিগগিরই দিয়ে দিচ্ছি।"

সঙ্কোচিত ভ্রুর নিচে ওর ক্রোধদীপ্ত চোখ জ্বলে ওঠে। বাপকে ঘৃণাব্যঞ্জক কণ্ঠে বলে :

"তা হলে, আমি বাড়ি ছেড়ে যাবই। আমার ভাইদের মতো মেয়েমানুষই আমার জীবনের একমাত্র কাম্য নয়।"

ওয়াঙ আপন ভুল বুঝতে পেরে কৈফিয়তের সুরে বলে :

"না—না, বিয়ে তোকে দেব না; আমি বলছিলাম, যদি দাসী-বাঁদিদের মধ্যে কাউকে—"

যুক্ত হস্তদ্বয় বক্ষে স্থাপন করে মর্যাদামণ্ডিত চোখে বাপের পানে তাকিয়ে ছেলে বলে :

"অতি সাধারণ তরুণদের স্তরে আমি নই। আমার বুকে মহাস্বপ্ন রয়েছে। ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন। আমি মহিমান্বিত হতে চাই। সংসারে মেয়েমানুষের অভাব নেই।" সহসা কী ভুলে-যাওয়া স্মৃতি যেন তার মনের অতল থেকে জেগে ওঠে। তার মর্যাদাবোধ কোথায় উবে যায়; হাতদুটো শিথিল হয়ে পাশে ঝুলে পড়ে। এবার সে তার স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, "তোমার বাঁদিগুলোর মতো এমন কুৎসিত কুরূপা বাঁদি আর কোথাও দেখিনি। আমার এতে কোনো স্বার্থ আছে বলে এ-কথা বলছি না। অন্দরমহলের সেই ম্লানমুখী মেয়েটা ছাড়া আর একটা বাঁদিও দেখার যোগ্য নয়।"

ওয়াঙ বুঝে ছেলে কলির কথা বলছে। হঠাৎ তার বুকে ঈর্ষার আগুন জ্বলে ওঠে, নিজকে আরো বৃদ্ধ, আরো স্থবির বলে মনে হয়। অনাবশ্যক লোল-মাংসে সে স্থূলাঙ্গ, মাথার শুভ্রকেশে বার্ধক্যের স্পষ্ট স্বাক্ষর। আর তার সামনে তার আত্মজ, সুঠাম দীর্ঘদেহে তারুণ্যের দীপ্তি। মুহূর্তে তাদের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ লুপ্ত হয়ে যায়। তারা যেন দুটি পুরুষ। একজন বার্ধক্যজরায় শক্তিহীন আর একজন নবতারুণ্যে শক্তিমান। ঈর্ষাদীপ্ত ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে ছেলেকে বলে :

"বাড়ির দাসী-বাঁদিদের ওপর নজর দেওয়া ত্যাগ কর্। অন্যান্য বড়লোকদের বাড়ির তরুণদের মতো এখানে দাসী-বাঁদিদের নিয়ে অনাচার চলবে না। আমরা গেঁয়ো মানুষ; আমাদের চালচলনে ভদ্রতা রয়েছে। আমার বাড়িতে এসব নয়।"

ছেলে অবজ্ঞায় কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বাপের পানে কুঞ্চিত ভ্রু তুলে বলে :

"তুমিই তো একথা তুললে।" বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ওয়াঙ সেখানেই বসে থাকে। নৈরাশ্যে মন তার ভরে ওঠে; সে আপন মনে বিড়বিড় করে :

"এ বাড়িতে আমার ভাগ্যে আর শান্তি নেই।"

নানা ক্রোধে তার মনটা ঘুলিয়ে যায়; তবে অকারণে তার মনে এই ক্রোধটাই দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে যে, বাড়ির একটা ম্লানমুখী বাঁদির পানে তারই ছেলের চোখ পড়েছে; বাঁদিটাকে তার ভালো লেগেছে।

তেত্রিশ

কলি সম্বন্ধে ছোটছেলের কথাগুলো ওয়াঙ একমুহূর্তও ভুলতে পারে না। কলির আনাগোনার সময় সে কলিকে পর্যবেক্ষণ করে। তার মনের অজ্ঞাতসারে কলির ছবি তার মনের মুকুরে ভেসে থাকে।

এক গ্রীষ্মের রাতে সে আপনমহলে পুষ্পিত ক্যাসিয়া গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করছে। সুরভিঘন রাতের বাতাসে উষ্ণতার আমেজ। চারদিকে নিঝুম নির্জন। ক্যাসিয়াফুলের তীব্র সুরভিতে মন তার উতলা হয়ে ওঠে। তার দেহ-শোণিতে যৌবনের পাগল-করা উন্মাদনা জাগে। সারাদিন সে তার রক্তধারায় চাঞ্চল্য অনুভব করেছে। ইচ্ছা হয়, পায়ের জুতো-মোজা খুলে খালিপায়ে মাঠে বেরিয়ে আসতে। তার মন চায়, তার নগ্নপায়ে লাগুক মাটির স্নিগ্ধ স্নেহস্পর্শ।

সে এখন আর চাষা নয়; সে এখন শহরের একজন সম্ভ্রান্ত ঐশ্বর্যশালী জমিদার। তাই লজ্জায় সে নগ্নপায়ে বেরোতে পারে না। সে চঞ্চলচিত্তে আঙিনায় পায়চারি করে। পদ্ম তার আপন মহলের আঙিনায় বসে হুঁকো টানছে। সে পদ্ম'র থেকে দূরে থাকে, পাছে তার চিত্তচাঞ্চল্য এই চতুরা নারীর চোখে ধরা পড়ে যায়। তার তীক্ষ্ণ চোখকে ওয়াঙ ফাঁকি দিতে পারবে না। সে কারো সামনে যায় না। ছেলের বউ, নাতি সবাইকে সে এড়িয়ে চলে।

দেহ-ত্বকের গোপনে রক্তের জ্বালা নিয়ে তার দীর্ঘ নিঃসঙ্গ দিন কেটে যায়। ছেলের তারুণ্য-ভরা গাম্ভীর্য আর কলির ম্লান-সুন্দর মুখখানা সে ভুলতে পারে না। সে আপনমনে ভাবে :

"হয়তো ওরা দুজনই একবয়েসী—আঠারো হবে।"

সহসা তার মনে পড়ে, সত্তর বছরে পড়তে তার আর বেশি বাকি নেই। এ বয়েসে এই যৌবনসুলভ উন্মত্ততায় সে লজ্জিত হয়। সে আবার ভাবে :

"তাই ভালো, ছেলের হাতেই এই মেয়েটাকে সঁপে দিই।" বারবার সে এ-কথা বলে, আর প্রতিবার তার ক্ষতদেহে যেন তীক্ষ্ণ ছোরা আমূল বসে যায়। হ্যাঁ, তাকে নিজের হাতেই নিজের দেহে ছোরা বসাতে হবে; ব্যথা তাকে সইতেই হবে; উপায় নেই।

নিঃসঙ্গ দিনটা তার এমনি করেই কেটে যায়।

সন্ধ্যা নামে; রাতের অন্ধকার চারদিকে কালো আবরণ টেনে দেয়। ওয়াঙ তার মহলে একা। ক্যাসিয়াফুলের তীব্র গন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাসে মন তার উন্মনা, চঞ্চল।

আঙিনায় ক্যাসিয়াগাছের তলে অন্ধকারে নির্বান্ধব ওয়াঙ উপবিষ্ট। কে যেন তার পাশ দিয়ে চলে যায়। ওয়াঙ চকিত চোখে ছায়ামূর্তির পানে তাকায়। ওয়াঙের চিনতে দেরি হয় না, এ কলির ছায়ামূর্তি।

"কলি"! সে ডাকে, কণ্ঠস্বর কানাকানির মতো অস্পষ্ট।

কলি থমকে দাঁড়ায়; নতমুখে কান পাতে।

ওয়াঙ আবার ডাকে, "আমার কাছে আয়।" কণ্ঠের গণ্ডি থেকে স্বর যেন বেরোতে চায় না।

ওয়াঙের ডাক শুনে সে ভীত লঘুপদে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। অন্ধকারের সাথে ও মিশে যায় যেন; কিন্তু ওয়াঙ কলির উপস্থিতি তার পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব

করে। সে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কলির জামার কোণটা ধরে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে চুপি চুপি বলে, "মণি—!"

তার কথা স্তব্ধ হয়ে যায়। তার মনে পড়ে সে বৃদ্ধ; তার নাতি-নাতনিদের বয়েসও এই বালিকার কাছাকাছি। কী কেলেঙ্কারি! সে কলির জামায় হাত বুলোয়।

প্রতীক্ষমাণা কলি ওয়াঙের রক্তের উত্তাপ আপন দেহে অনুভব করে। বৃন্তচ্যুত পুষ্পের মতো মাটিতে পড়ে কলি ওয়াঙের পাদুটো জড়িয়ে ধরে থাকে। ওয়াঙ ধীর অনুচ্চকণ্ঠে বলে, "কলি! আমি যে বুড়ো—অত্যন্ত বুড়ো।"

ক্যাসিয়াবৃক্ষের সুরভিত নিশ্বাসের মতো কলির মৃদুকণ্ঠ অন্ধকারে ভেসে আসে :

"আমি বুড়োই ভালোবাসি—খুব ভালোবাসি—তাদের প্রাণে দয়ামায়া আছে—"

ওয়াঙ সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে বলে :

"তোর মতো তন্বী তরুণীর পাশে যে-কোনো সুঠাম সুদর্শন তরুণকেই মানাত।"

তার অন্তর "আমার ছোটছেলের মতো—" কথাটা জুড়ে দেয়। কিন্তু এ-কথাটা শুনিয়ে বলতে সে ভয় পায়। ওর মনে এ-কথাটা দানা বেঁধে উঠলে সে তা সহ্য করতে পারবে না।

কলি জওয়াব দেয় :

"তরুণদের মনে দয়ামায়া নেই; তারা নির্মম, পাষাণ!"

তার পদতল থেকে উঠে-আসা কম্পিত কণ্ঠের আধো-আধো বুলি শুনে ওয়াঙের ভালোবাসা উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। সে লুণ্ঠিত কলিকে কোমল হাতে ধরে তুলে আপন ঘরে নিয়ে যায়।

অনুষ্ঠান শেষে, তার এই বার্ধক্যের প্রেম তাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে দেয়। যৌবনের প্রেমানুষ্ঠানে সে এমন বিস্মিত হয়নি কোনোদিন। কলির প্রতি তার এই বুক-ভরা প্রেম সত্ত্বেও বিগত দিনের তীব্রতা কই? কই সেই আকুল আকাঙ্ক্ষায় জড়িয়ে ধরা?

না, আজ কলিকে সে তেমনি তীব্র আবেগে জড়িয়ে ধরেনি, সে ওকে কোমল হাতে ধরে আপন স্থূলদেহে ওর লঘু তারুণ্য অনুভব ক'রে তৃপ্ত হয়েছে। দিবসের আলোতে কলিকে চোখে দেখেই সে তৃপ্ত; নিশীথের অন্ধকারে কলির দেহাবৃত বসনের স্পর্শে, ওর শান্ত দেহের নৈকট্যেই তার মনের কামনা পরম তৃপ্তিলাভ করে। এ প্রেম তার মনের বিলাস মাত্র, বিচিত্র এ বার্ধক্যের প্রেম। যেমনি গভীর এর অনুভূতি, তেমনি সহজ এর তৃপ্তি।

আর কলি? ওর প্রেমেও ইন্দ্রিয়াতিশয্য নেই। পিতার পাশে কন্যার মতো ও নিতান্ত নির্ভরতায় ওয়াঙের বুক জড়িয়ে শুয়ে থাকে। ওয়াঙের কাছে ও যেন নারী নয়, শিশু মাত্র।

ওয়াঙের এ প্রেমকাহিনী সহজে প্রকাশিত হয় না। সে-ও কাউকে বলে না। কেন বলবে? সেই তো এ-বাড়ির মালিক, প্রভু।

কোকিলার চোখেই এ প্রেমলীলা প্রথম ধরা পড়ে। একদিন সকালবেলায় সে কলিকে ওয়াঙের ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে আসতে দেখে তার শ্যেনচক্ষু চিক দিয়ে ওঠে।

"বুড়োকর্তা তাহলে আবার মেতেছে!" কোকিলা হেসে বলে।

এ-কথা ওয়াঙের কানে আসতেই অসম্বৃত পোশাক ঠিকঠাক করে বেরিয়ে গর্বের হাসি হেসে বলে :

"তা, আমি ওকে বলছিলাম, কোনো জোয়ান পুরুষ বেছে নিতে; কিন্তু সে এই বুড়োকেই চাই।

"তা হলে এ সুখবরটা পদ্মকে গিয়ে দিই। বড় মজা হবে কিন্তু।" তার চোখেমুখে ক্রূর হাসি ফুটে ওঠে।

"কেমন করে যে ব্যাপারটা হয়ে গেল, আমি নিজেই বুঝতে পারিনি।" কৈফিয়তের সুরে ওয়াঙ বলে, "মহলে নতুন করে মেয়েমানুষের সংখ্যা বাড়ানোর ইচ্ছা আমার ছিল না। ব্যাপারটা আপনাআপনি ঘটে গেল।"

কোকিলা যখন বলল, "পদ্মকে এ খবরটা দেওয়ার দরকার।" ওয়াঙ পদ্ম'র ভয়ে মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলে, "তাকে বলতে হয়, বলো; কিন্তু তুমি যদি তার রাগ ঠাণ্ডা করতে পারো, তবে বখশিশ পাবে।"

কোকিলা হাসিমুখে কথা দিয়ে চলে যায়। ওয়াঙ আপন ঘরে ফিরে আসে। কতক্ষণ পরে কোকিলা এসে জানায় :

"খবরটা শুনে সে তো রেগে আগুন। তবে তাকে যখন মনে করিয়ে দিলাম যে, একটা বিদেশি ঘড়ি আর একটা চুনির আঙটির জন্য তার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা। তুমি তাকে এগুলো দেবে, এমনকি দুহাতের দু আঙুলে পরার জন্য দুটো আঙটি আর কলির বদলে একটা নতুন বাঁদিও দেবে— তখন তার মেজাজ ঠাণ্ডা হল। কলি যেন তার সামনে না যায়। তুমিও দিনকতক দূরে থেকো।"

ওয়াঙ ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, "তার যা ইচ্ছা তাই দেব।"

পদ্ম'র কাছে যেতে হবে না ভেবে সে খুশি হয়।

এবার বাকি রইল তার তিন ছেলেকে ব্যাপারটা জানানো। এ ব্যাপারে জড়িয়ে গিয়ে তার সত্যি লজ্জা হয়। সে মনকে বোঝায় :

"আমি কি এ বাড়ির মালিক নই? নিজের পয়সায় কেনা বাঁদিও কি আমি নিতে পারব না?"

তবু তার লজ্জা লাগে, তবে মনে-মনে গর্বও সে অনুভব করে। লোকে তাকে বুড়ো বলুক, আসলে সে বুড়ো হয়নি। সে যে-কোনো যুবকের মতো সমর্থ পুরুষ। সে তার মহলে ছেলেদের আগমন-প্রতীক্ষা করে।

এক এক করে তারা আসে। প্রথম আসে মেজোছেলে। সে এসে জমির কথা, ফসলের কথা, ব্যবসার কথা বলে। অধুনা ওয়াঙ লাঙ এসব কথায় কান দেয় না। আনন্দও পায় না। ফসল না হোক, তার সঞ্চিত অর্থ রয়েছে, গোলা-ভরা

গোপন ঈর্ষা ফুটে উঠে। ওয়াঙ আপনমনে হাসে। সে তার বড়ছেলের কামাতুর প্রকৃতির কথা জানে। তার শহুরে স্ত্রী বেশিদিন আর এই প্রবৃত্তির রশি টেনে রাখতে পারবে না। একদিন এই ছাই-চাপা প্রবৃত্তির আগুন বেরিয়ে পড়বেই।

বড়ছেলে আর কিছু না বলে বেরিয়ে যায়। যাবার বেলায় কী একটা নতুন ভাবনা যেন তাকে পেয়ে বসে। এই বার্ধক্যেও আপন মনোবাঞ্ছা পূরণে সাফল্যের গর্বে ওয়াঙ পাইপ টানতে থাকে।

ছোটছেলে সন্ধ্যার পরে একলা আসে। ওয়াঙ লাঙ তার ঘরের টেবিলে বসে পাইপ টানছে; কলি টেবিলটার অন্যধারে বসে আছে। টেবিলে লাল মোমবাতি জ্বলছে। কলির হাতদুটো আপন কোলে লতিয়ে পড়ে আছে। কলি শিশুসুলভ সরল ছলাকলাহীন দৃষ্টি মেলে ওয়াঙের পানে তাকায়। কলির পানে চেয়ে চেয়ে তার মন কৃতিত্বের গর্বে ভরে ওঠে।

সহসা আঙিনায় অন্ধকার থেকে সবার অলক্ষে ছোটছেলে তার সামনে ছিট্‌কে পড়ে। এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে থাকে যেন এখনই লাফিয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াঙের মনে পড়ে পাহাড় থেকে গাঁয়ের লোকদের ধরে-আনা একটা চিতাবাঘের ছবি। চিতাবাঘটা বন্দি ছিল, কিন্তু শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার ভঙ্গি ত্যাগ করেনি। বাঘটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আর চোখের দৃষ্টিতে ছিল জিঘাংসার স্পষ্ট অভিব্যক্তি। ছেলের অগ্নিদৃষ্টিও তেমনি করে ওয়াঙের ওপর পড়ছে; তার ঘন কালো ভ্রূযুগল হিংস্রতায় কুঞ্চিত হয়ে আছে। সে বাপকে অনুচ্চকণ্ঠে বলে :

"এবার চল্‌লাম—চল্‌লাম যুদ্ধে—"

কলির পানে সে তাকায় না। যে ওয়াঙ তার বাকি দুই ছেলেকে কোনোদিন গ্রাহ্য করেনি, সেই ওয়াঙ এই ছোটছেলের সামনে আজ শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

ওয়াঙ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ভাঙাচোরা কয়েকটা কথা বলে, কিন্তু মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিতেই তার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যায়। তার ছেলে তার পানে পলকহীন হিংস্র-চোখ মেলে আবার পুনরাবৃত্তি করে :

"এবার চল্‌লাম—চল্‌লাম যুদ্ধে।"

সহসা ছোটছেলে মুখ ফিরিয়ে কলির পানে তাকায়, কলিও তার পানে তাকায়। দুজনের চোখাচোখি হয়। সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ঠিতা কলি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলে। ছেলের ওপর থেকে তার দৃষ্টি ছিনিয়ে নিয়ে ছিট্‌কে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ওয়াঙ দরজার পানে তাকায়। বাইরে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। খোলা দরজার চতুষ্কোণ অন্ধকারের সমুদ্রে ছোটছেলে হারিয়ে যায়। চারদিক নৈঃশব্দে নিথর হয়ে ওঠে।

ওয়াঙের গর্ব চূর্ণ হয়ে যায়। সে কলির পানে তাকিয়ে বেদনার্ত কাকুতিভরা কণ্ঠে বলে :

"ওরে কলি, আমি জানি, আমি বুড়ো; আমি তোর অযোগ্য।"

কলির হাতদুটো মুখ থেকে খসে পড়ে। সে প্রবল কান্নায় উদ্বেল হয়ে বলে :

"তরুণেরা বড় নিষ্ঠুর; আমি বুড়োদেরই বেশি ভালোবাসি।"

পরদিন সকালে ছোটছেলে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু কোথায়? কেউ জানে না।

চৌত্রিশ

গ্রীষ্ম-শেষের কৃত্রিম উত্তাপটুকু উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়ে, হেমন্ত যেমন ক্ষণিক জ্বলে উঠে আবার শীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি করে কলির প্রতি ওয়াঙের প্রেমও ক্ষণিক জ্বলে নিভে গেল; ওয়াঙ কলিকে ভালোবাসে, কিন্তু এ ভালোবাসায় আর রক্তের চাঞ্চল্য নেই; তার রক্ত টগ্‌বগ্ করে ফুটে উঠে আবার জমে গেছে।

আগুন নিভে যাওয়ার পর সহসা দেহ তার বার্ধক্যের কনকনে হাওয়ায় হিম হয়ে গেছে। তবু কলিকে সে ভালোবাসে। তার মহলে কলির অবস্থানই তার জীবনের মহাপ্রশান্তি। মহাধৈর্যে প্রাণ দিয়ে কলি ওয়াঙের সেবাযত্ন করে। এই কাঁচা বয়সে এ সহিষ্ণুতা কল্পনাতীত। ওয়াঙও কলিকে স্নেহ করে। তার প্রতি ওয়াঙের প্রেম কামনার স্তর থেকে নেমে কন্যা-বাৎসল্যের প্রশান্তিতে নেমেছে।

ওয়াঙের খাতিরে কলি তার জড়বুদ্ধি বোবা মেয়েটাকে স্নেহবন্ধনে বেঁধে বুড়ো বাপের বুকে শান্তি দিয়েছে। একদিন ওয়াঙ কলিকে তার বহুদিনের গোপন ইচ্ছা প্রকাশ করে দেয়। সে মরে গেলে মেয়েটার কী দশা হবে; এ নিয়ে ওয়াঙ অনেক ভেবেছে। সে ছাড়া বাড়ির কেউ তো মেয়েটা বাঁচল কি মরল সে খোঁজখবরও নেবে না। তাই সে বহুদিন পূর্বে এক পুরিয়া বিষ কিনে এনে রেখেছে। যখন সে বুঝবে যে, তার মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই, তখন মেয়েটাকে এ বিষ খাইয়ে দেবে। মেয়েটার সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা থাকবে না; মেয়েটাও মরে বাঁচবে। কিন্তু মেয়েটাকে বিষ খাইয়ে মারার ভাবনা, তার নিজের মৃত্যুর চেয়ে তার কাছে ভয়ংকর মনে হয়। কলি মেয়েটাকে স্নেহের চোখে দেখেছে বলে ওয়াঙ স্বস্তি অনুভব করে।

কলিকে কাছে ডেকে সে একদিন বলে :

"আমার মৃত্যুর সময় তোমার হাতেই এই হাবা-বোবা মেয়েটার ভার দিয়ে যেতে হবে; তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যে এ ভার নিতে পারে। এ মেয়েটা হয়তো অনেকদিন বাঁচবে। কারণ, তার কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই, কোনো দুঃখ নেই। আমি জানতাম, আমি চলে গেলে মেয়েটাকে শীত-বৃষ্টির সময় কেউ ঘরে আনবে না—রোদে বসিয়ে দেবে না। ওটাকে পথে বের করে দেবে। এই পুরিয়াতে তার মুক্তির উপায় রয়েছে। আমার মৃত্যুর পর, ভাতের সঙ্গে এটা মিশিয়ে মেয়েটাকে খাইয়ে দিয়ো। সে মরে নিষ্কৃতি পাবে, আমার আত্মাও শান্ত হবে। আমি আর ওর মা দুজনে মিলে ওকে এতদিন যত্ন করেছি।"

কলি মোড়কটা দেখে ভয়ে পিছিয়ে যায়। ধীরে ধীরে বলে :

"একটা পোকা মারতে আমার বুক কাঁপে, একটা মানুষ মারব কেমন করে? না প্রভু! তা হবে না। আমি এ মেয়েটাকে আপন সন্তানরূপে গ্রহণ করব। আপনি ছাড়া এ দুনিয়ার কেউ আমাকে একটু দরদ দেখায়নি। আপনিই আমার একমাত্র দরদী। তাই মেয়েটার ভার গ্রহণ করে যদি আপনার অনুগ্রহের সামান্য প্রতিদানও দিতে পারি।"

এ-কথায় কৃতজ্ঞতায় ওয়াঙের চোখ ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠে। এমন সান্ত্বনার বাণী আজ পর্যন্ত কেউ তাকে শোনায়নি। কলির প্রতি তার আসক্তি বেড়ে যায়। সে বলে :

"তবু এ মোড়কটা রেখে দাও। তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না। বলতে বাধে, তুমিও অমর হয়ে আসোনি। তোমার ডাক এলে, কেউ মেয়েটাকে দেখবে না। ছেলের বউয়েরা ওদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেরা পুরুষমানুষ। মেয়েটার দিকে তাকাবার অবসর কোথায় তাদের জীবনে?"

ওয়াঙের কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে কলি মোড়কটা হাতে নয়। ওয়াঙ ওর হাতে মেয়েটাকে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়।

ওয়াঙ ধীরে ধীরে সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে বার্ধক্যের জীবনে প্রবেশ করে। তার জীবনে এখন একমাত্র এই দুটি প্রাণীই, কলি আর হাবা মেয়েটা—একমাত্র সঙ্গিনী। মাঝে মাঝে সে মাথা তুলে কলির পানে তাকায়। মন তার ব্যথিত হয়ে ওঠে। বিষণ্ণকণ্ঠে বলে :

"এই নিরুত্তাপ নিরানন্দ জীবন যে তোমার এই কাঁচাবয়েসে অসহনীয়, কলি!"

শান্ত কৃতজ্ঞ কণ্ঠেকলি জওয়াব দেয় :

"তা হোক, এ জীবনে শান্তি আছে; নিরাপত্তা আছে।"

মাঝে মাঝে ওয়াঙ বলে :

"আমি যে বুড়িয়ে জুড়িয়ে ছাই হয়ে গেছি, কলি।"

কলি তেমনি কৃতজ্ঞকণ্ঠে জওয়াব দেয় :

"তোমার দরদই আমার জীবনে একমাত্র কাম্য; অন্য পুরুষের প্রয়োজন আমার নেই!"

একদিন কৌতূহলী হয়ে ওয়াঙ প্রশ্ন করে :

"এই অল্পবয়েসে পুরুষের প্রতি তোমার এমন বিদ্বেষভাব হল কেন?"

উত্তরের প্রতীক্ষায় ওয়াঙ কলির পানে তাকায়। এ কী! কলির চোখে এই শঙ্কার ছায়া কেন? কলি দু'হাতে মুখ ঢেকে চাপা কণ্ঠে বলে :

"আপনাকে ছাড়া আমি সব পুরুষকেই ঘৃণা করি, এমনকি আমার বাপকেও! বাপ হয়ে কিনা মেয়েকে বেচে দিল! পুরুষদের কেবল মন্দটাই আজীবন দেখেছি।"

ওয়াঙ অবাক হয়ে আবার শুধায় :

"কিন্তু আমার বাড়িতে তো তোমার কোনো অশান্তি ছিল না!"

"আমার বুকে কেবল ঘৃণা," কলি মুখ ফিরিয়ে জওয়াব দেয়, "কেবল ঘৃণা, সব পুরুষকে আমি ঘৃণা করি, বিশেষ করে যুবকদের।"

কলি এর বেশি কিছু বলে না। বিস্মিত ওয়াঙ ভাবে, পদ্ম তার দুঃখ-কলঙ্কময় জীবনেতিহাস বলে ওর মন বিষিয়ে দিল না তো? কোকিলা পুরুষদের সর্বনাশা লালসার কাহিনী শুনিয়ে তার মনে পুরুষভীতি জাগিয়ে দেয়নি তো? না কি, ওর জীবনে এমন কোনো রহস্যময় ঘটনা ঘটে গেছে, যে-রহস্য ও উদ্‌ঘাটন করতে চায় না!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওয়াঙ এ-প্রশ্ন নিয়ে মাথা-ঘামানো ত্যাগ করে। সে এ নিয়ে আর নিজেকে বিড়ম্বিত করতে চায় না। সে চায় অনাবিল শান্তি; সে চায় কলি আর মেয়েটাকে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে।

এমনি ক'রে ওয়াঙ বসে থাকে। দিন, মাস, বছর কেটে যায়। ওয়াঙ আরো বুড়িয়ে যায়। বাপ যেমন করে রোদে বসে ঝিমোত, তেমনি করে ওয়াঙ এখন ঝিমোয়। ওয়াঙ ভাবে, তার জীবনের সব সমস্যার সমাধান হয়েছে; সব সাধ পূর্ণ হয়েছে। তৃপ্তিতে ভরে ওঠে তার মন।

মাঝে মাঝে অন্য মহলে ঘুরতে যায়; পদ্ম'র মহলেও যায়, তবে কদাচিৎ। পদ্ম আর কলির কথা তোলে না। ওয়াঙকে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। পদ্মও বুড়ো হয়েছে। সে এখন পানাহার আর চাওয়া মাত্র টাকা পেলেই তুষ্ট! ও আর কোকিলা তাদের পুরনো কর্ত্রী-পরিচারিকার সম্বন্ধ ভুলে গিয়েছে। এখন তারা সখী। তারা একত্রে বসে গল্প-গুজব করে, অতীতের প্রণয়-রহস্যের কাহিনী নিয়ে কানাকানি করে। তারা খায় দায় ঘুমোয়। এই তাদের জীবন।

ছেলেদের মহলে গেলে ছেলেরা আর ছেলের বউরা তার আদর আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। সে তাদের শেষ সন্তান দেখতে চায়। ভুলে গিয়ে বারবার একই প্রশ্ন করে,

"আমার এখন নাতি-নাতনির সংখ্যা কত?"

"এগারোটা নাতি আর এগারোটা নাতনি।"

বুড়ো খলখলিয়ে হেসে বলে :

'ফি-বছর দুটো করে, সোজা হিসাব।"

একটুখানি বসে সমবেত নাতি-নাতনিদের খুঁটে খুঁটে দেখে। বেশ বড়সড় হয়েছে নাতিগুলো। আপনমনে বিড়বিড় করে :

"এটা হয়েছে আমার বাপের মতো, ওটা ওর নানা লিউর মতো। আরে! এটা যে হয়েছে ঠিক আমার মতো! আমার জোয়ান বয়সের চেহারা।" নাতিদের প্রশ্ন করে :

"স্কুলে যাস তো?"

"হ্যাঁ, দাদু।" তারা একসাথে চেঁচিয়ে উঠে।

"ধর্মগ্রন্থ পড়িস তো?"

কচিমুখে অবজ্ঞার হাসি হেসে তারা জওয়াব দেয়, "না দাদু! বিপ্লবের পর কেউ আর ধর্মগ্রন্থ পড়ে না।"

দাদু একটু ভেবে জওয়াব দেয় :

"হ্যাঁ, বিপ্লবের কথা শুনেছিলাম বটে, কিন্তু তখন অবসর পাইনি বলে বিপ্লবে যোগ দিতে পারিনি, জমিজমার ঝামেলা নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম।"

একথা শুনে নাতিরা নাসিকা কুঞ্চন করে। বুড়ো এবার উঠে পড়ে। তার মনে হয়, ছেলেরা তার পর হয়ে গেছে। তাদের মহলে সে এখন মেহ্‌মান মাত্র।

এর পর থেকে সে আর ছেলেদের মহলে যায় না। মাঝে মাঝে কোকিলাকে প্রশ্ন করে :

"এখন দুই বউয়ের মধ্যে সদ্ভাব আছে ত?"

কোকিলা ঘেন্নায় থুতু ফেলে বলে :

"এই দুই বউ? বাব্বা! দুই বিড়ালের ঝগড়া লেগেই আছে। বড়বউয়ের নালিশের জ্বালায় তো বড়'র হাড় কালি হয়ে গেছে। আর সবসময় তার মুখে বাপের বাড়ির বড়াই। এমন মেয়েমানুষ নিয়ে বেটাছেলে ঘর করতে পারে? শুনেছি, বড় আর একটা বিয়ে করবে। প্রায়ই নাকি বড় চা-খানায় আনাগোনা করছে।"

"তাই নাকি!" ওয়াঙ সাড়া দেয়।

এ-সম্বন্ধে ওয়াঙের মনে আর কৌতূহল থাকে না! নববসন্তের হাওয়ায় তার শুকনো হাড়ে কাঁপুনি ধরে আর চায়ের পিপাসা জাগে।

আর একদিন কোকিলাকে প্রশ্ন করে,

"ছোটছেলেটা কবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল! ওর কোনো খবর আসে?"

এ বাড়ির সব খবর কোকিলার নখদর্পণে। সে জওয়াব দেয় :

"ও কোনো চিঠিপত্র লেখে না, তবে লোকমুখে শুনা যায় ও নাকি সৈন্যবাহিনীতে একজন জাঁদরেল চাকুরে হয়েছে। বিপ্লব নাকি হয়েছিল—বুঝিও না ছাই—সে সময় ও খুব নাম করেছে। বিপ্লব কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য হবে হয়তো।"

"তাই নাকি?" বলে ওয়াঙ আবার সাড়া দেয়।

ছোটর সম্বন্ধে সে হয়তো আরও কতকক্ষণ ভাবত; কিন্তু সান্ধ্য বাতাসে তার বুড়ো হাড় কেঁপে উঠে। তাই মন তার অস্থির হয়ে ওঠে, তার বুড়ো দেহ চাঙা করতে এখন আহার আর গরম চায়ের প্রয়োজন। রাতের বেলায় তার দেহ হিম হয়ে গেলে কলির তরুণদেহের উষ্ণতায় সে আরাম বোধ করে।

বসন্ত বারবার আসে যায়; প্রতিবার বসন্তের আগমন-নির্গমনের পদধ্বনি তার কানে অস্পষ্টতর হয়ে আসে। কিন্তু একটা অনুভূতি তার মনে অক্ষয় হয়ে থাকে; তা হল মাটির প্রতি তার আকর্ষণ। মাটি থেকে সে সরে এসেছে; শহরে ঘর বেঁধেছে; তার ঐশ্বর্যের অভাব নেই; কিন্তু তার মনের শিকড় মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। মাটির কথা সে বহুদিন ভুলে থাকে; কিন্তু বসন্তের আগমনে তার মন মাটির টানে চঞ্চল উন্মাদ হয়ে ওঠে; সে মাঠে যায়। আগের মতো সে আর লাঙল ধরতে পারে না, অন্যের লাঙল ধরা দেখে মাত্র। কিন্তু এ সময়ে তার মাঠে যাওয়া চাই। মাঝে মাঝে ভৃত্য তার সঙ্গে বিছানা নিয়ে যায়। সে রাতের বেলায় সেই পুরনো মেটে-ঘরে, সেই পুরনো খাটে ঘুমোয়—যেখানে তার সন্তানেরা পৃথিবীর আলো

দেখেছে, যেখানে ওলান শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। সকালবেলায় ঘুম ভাঙলে সে কম্পিত হাতে ভেঙে নেয় মুকুলিত উইলো গাছের একটা শাখা বা পিচপুষ্পের একটা গুচ্ছ। সারাদিন সেগুলো হাতের মুঠোয় রেখে দেয়।

বসন্ত-শেষের একদিন সে বেড়াতে বেড়াতে চলে যায় তার মাঠে; ছোট পাহাড়ের গায়ে পাঁচিল-ঘেরা জায়গাটায়, যেখানে তার প্রিয়জনেরা কবরস্থ রয়েছে। লাঠির উপর ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে কবরগুলোর পানে তাকায়। কবরবাসীদের প্রত্যেকের কথা তার মনে পড়ে। কলি আর হাবা মেয়েটা ছাড়া তার বাড়ির সবাই, এমনকি তার ছেলেদের চেয়েও এই মৃতরা তার কাছে সত্যতর স্পষ্ট হয়ে উঠে। স্মৃতির সাগর মন্থন করে তার সামনে দিয়ে অতীত ছবির শোভাযাত্রা চলে। এমনকি তার বহুদিনের ভুলে-যাওয়া ছোটমেয়েটার মুখের ছবিও কেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে—ফুটফুটে সুন্দর মুখ, একটুকরো রক্তিম রেশমি কাপড়ের মতো পাতলা ঠোঁট। সমাধিস্থ প্রিয়জনদের সঙ্গে এই মেয়েটাও মিশে গেছে অতীতের গহ্বরে। সহসা তার মনে হয়,

"এবার আমার পালা।"

সে এবার ঘেরা-জায়গায় ঢুকে ভালো করে দেখে নিজের শোবার জায়গাটা ঠিক করে নেয়—তার বাপ-চাচার পায়ের কাছে, চিঙের মাথার উপর আর ওলানের পাশে। তার কবরের মাটির পানে সে নিষ্পলক চোখে চায়। সে স্পষ্ট দেখতে পায়, এ মাটির নিচে সে শায়িত হয়ে আছে—আপন মাটির কোলে তার এই আশ্রয় চিরন্তন—শাশ্বত। সে অস্পষ্ট কণ্ঠে বলে :

"এবার আমার কফিনের ব্যবস্থা করতে হবে।"

এই কথাটা মনে হতেই ব্যথায় তার বুক মোচড় দিয়ে ওঠে, কিন্তু মন তার এই ভাবনাকে আঁকড়ে থাকে। শহরে গিয়ে বড়ছেলেকে ডেকে বলে :

"একটা কথা আছে।"

"কী কথা বলো।" ছেলে জওয়াব দেয়।

সহসা ওয়াঙ কথাটা ভুলে যায়। অসহায় বেদনায় তার চোখ ফেটে পানি আসে। এত কষ্টে আঁকড়ে রাখা কথাটা কিনা তাকে ফাঁকি দিল। কলিকে প্রশ্ন করে :

"আমি কী বলতে চাইছিলাম?"

"আজ কোথায় গেছলেন?"

কলির পানে চেয়ে সে জওয়াব দেয়, "আমার জমিতে।"

"কোন্ জমিটায়?"

সহসা পালিয়ে যাওয়া কথাটা তার মনে পড়ে যায়। অশ্রু-চকচক চোখে সে হেসে চেঁচিয়ে ওঠে, "মনে পড়েছে—পড়েছে। বাবা! আমি আমার কবরের জায়গা ঠিক করে এসেছি। মরার আগে আমার কফিনটা দেখতে চাই।"

কর্তব্যপরায়ণ পুত্রের মতো নাঙ এন বলে উঠে, "ও-কথা মুখে এনো না, বাবা! তবে তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না।"

নাঙ এন সুগন্ধিকাঠে কারুকার্য-করা একটা কফিন নিয়ে আসে। লোহা আর মানুষের অস্থির চেয়েও এ কাঠ টেকসই। এ কাঠ কেবল কফিনেই ব্যবহৃত হয়। ওয়াঙ নিশ্চিন্ত হয়।

কফিনটা আপন ঘরে আনিয়ে রাখে; রোজ দেখে তৃপ্তি পায়।

হঠাৎ একদিন আর এক খেয়াল হতেই সে বলে :

"কফিনটা আমি আমার গাঁয়ের মেটে-বাড়িতে নিয়ে যাব। সেখানেই জীবনের বাকি কয়টা দিন কাটিয়ে দেব।"

তার সঙ্কল্পের কাছে সবাই হার মানে। সে তারই প্রতিষ্ঠিত পরিবারের হাতে শহরের প্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে কলি, বোবা মেয়ে আর প্রয়োজনীয় দাস-দাসী নিয়ে গেঁয়ে মেটে-বাড়িতে ঠাঁই নেয়।

বসন্তের পর গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মের পর হেমন্তের ফসল-তোলার মওসুম আসে। তার বাবা দক্ষিণ দেয়ালের যেখানটা হেলান দিয়ে ঝিমোত, ওয়াঙও সেখানটায় তেমনি করে ঝিমোয়। পানাহার আর মাটির ভাবনায় সে সর্বক্ষণ বিভোর হয়ে থাকে। কোন্ মাঠে কী ফসল ফলাবে, কী বীজ বুনবে, সে-ভাবনা আর তার নেই। মাটি এখন তার জীবনে একমাত্র সত্য। তার সত্তার সাথে মাটি মিশে এক হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে বসে থাকে, নিষ্প্রাণ মাটি তার হাতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে; একমুঠো মাটির সম্পদে তার বুক তৃপ্তিতে ভরে যায়। মাটি আর কফিনের ধ্যানে সে এখন আত্মসমাহিত। শক্ত সুন্দর কফিন আর দাক্ষিণ্য-সম্পদ-দাত্রী ধরণীর ধূলি তাকে কোলে তুলে নেবে বলে অসীম ধৈর্যে প্রতীক্ষা করছে।

কর্তব্যপরায়ণ ছেলেরা তাকে দিনে দুদিনে একবার দেখতে আসে। তার জন্য ভালো খাবার আনে, কিন্তু এ-সব ভালো খাবার খেতে তার আর ভালো লাগে না। তার ভালো লাগে তার বাপের মতো ভুট্টার গরম মণ্ড।

কোনোদিন ছেলেরা তার খবর নিতে না এলে সে তার জীবনের সমাপিকা কলির কাছে অভিযোগ করে :

"ওদের কীই-বা এত কাজ যে আসতে পারে না?"

কলি সান্ত্বনা দেয় :

"জোয়ান ছেলে। কত কাজ ওদের। বড়ছেলে শহরের একজন গণ্যমান্য লোক; মহলের একজন প্রতিনিধি। ও নাকি আর-একটা বিয়েও করেছে। মেজোছেলে তো ওর ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত। নিজের নামে নাকি খুব বড় একটা শস্যের ব্যবসা ফেঁদেছে।"

ওয়াঙ কলির কথা শোনে; কিন্তু সব কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। সুদূরপ্রসারী মাটির পানে দৃষ্টি মেলে দিয়ে উদাস হয়ে পড়ে। সব কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করার মতো মনের প্রাখর্য তার আর নেই।

কিন্তু একদিন ক্ষণকালের জন্য তার মনের পূর্ণ প্রাখর্য ফিরে আসে। সেদিন তার দুই ছেলে তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা ক'রে বাড়ির ধারের ক্ষেতগুলো দেখতে বেরিয়ে

যায়। ওয়াঙও নীরবে তাদের অনুসরণ করে। তারা একজায়গায় দাঁড়াতেই সে তাদের অলক্ষে তাদের অতি নিকটে এসে পৌছে। তার কানে আসে, তার মেজোছেলে চাপাকণ্ঠে বলছে :

"এ জমিটা তাহলে বেচা যাক্। টাকা আধাআধি ভাগ হবে। তোমার টাকা আমাকে ধার দিয়ো, ভালো হারে সুদ দেব। রেলপথ হয়েছে; বিদেশে মাল চালান দেব। আর আমি—"

"জমিটা বেচা যাক।" কথা কয়টি মাত্র ওয়াঙের কানে আসে। সে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে। গর্জন করে ওঠে :

'হতচ্ছাড়া পাজি নিষ্কর্মারা। মাটি বেচবি?" বলেই তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে ওঠে; সারা দেহ থরথর করে কাঁপে। ছেলেরা না ধরলে সে পড়েই যেত। সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। তার বুকের অসহায় দুঃখ-ক্রোধ অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ে।

ছেলেরা তাকে সান্ত্বনা দেয়; বারবার শোনায়, "না—না; মিথ্যাকথা! জমি আমরা কোনোদিন বেচব না বাবা!"

বুড়োর কান্না থামে না। কান্না-ভাঙা গলায় কাকুতি করে :

"ওরে, জমি তোরা বেচিস্ না। একবার জমি বেচা শুরু করলেই সর্বনাশ হবে। সর্বস্বান্ত হয়ে যাবি তোরা। ওরে, মাটি আমাদের জীবনদায়িনী, মাটি আমাদের অন্তিম আশ্রয়। মাটি আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলেই বাঁচবি, মাটিই একমাত্র বাঁচার পথ—একমাত্র ভরসা। মাটি কেউ কেড়ে নিতে পারে না। ওরে কেউ কেড়ে নিতে পারে না। মাটি অক্ষয় অব্যয়।"

কয়েক ফোঁটা চোখের পানি বুড়োর গালে নোনা দাগ রেখে শুকিয়ে যায়। সে মাথা নুইয়ে একমুঠো মাটি খাবলা মেরে তুলে আপনমনে বিড়বিড় করে :

"মাটি বেচবি? সর্বনাশ হবে। মান-ইজ্জত সব যাবে। অধঃপাতে যাবি তোরা। ওরে মাটি তোরা বেচিস নে।"

দুই ছেলে বুড়োর দুই বাহু ধরে থাকে। বুড়ো উষ্ণ মাটির গুঁড়ো মুঠোতে শক্ত করে ধরে রাখে, এ মাটির মানিক কিছুতেই হাতছাড়া করবে না। কিছুতেই না। ছেলেরা তাকে বারবার সান্ত্বনা দেয় :

"না, বাবা! তুমি ভেবো না। মাটি আমরা কিছুতেই বেচব না! কোনোদিন বেচব না।"

কিন্তু কথা বলতে বলতে বুড়োর মাথার উপর দিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে নীরব হাসি আর চোখ ঠারাঠারি চলে।

চিরায়ত গ্রন্থমালা
এবং
চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা
শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়
বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ
ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে
পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
এই বইটি 'চিরায়ত গ্রন্থমালা'র
অন্তর্ভুক্ত।
বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র